যাঁহার নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভার তুলনা

বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে নাই,

যাঁহার স্নেহ লাভ করা

আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য,

সেই জগন্মান্য কবিবর

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের

শ্রীচরণকমলে

ভক্তি শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য

স্রোতের ফুল

উৎসর্গ করিলাম।

এই উপন্যাস রচনায়

পূজনীয় কবিগুরু

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহাশয়ের নিকট হইতে

অনেক সাহায্য পাইয়াছিলাম।

চারু।

মাঘ, ১৩২৬
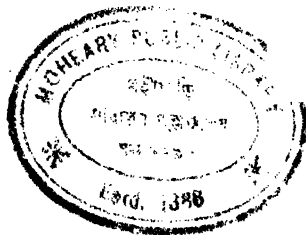
স্রোতের ফুল

১

মথুরাপুরের দশ-আনির জমিদার হরিবিহারী-বাবুর অন্দরমহলের দেউড়িতে একজন ভিখারী খঞ্জনী বাজাইয়া আগমনী গান গাহিতেছিল —

"পুরবাসী বলে রাণী তোর হারা তারা এল ঐ।
অমনি পাগলিনীপ্রায় এলোকেশে ধায়,
বলে, কৈ আমার উমা কৈ ?"

সেই সময়ে অন্দরের ছাদের উপর একজন বিধবা একাকী বড়ি [illegible] দিতে সেই গান শুনিতেছিলেন।

বিধবার বয়স পঁয়ত্রিশের বেশী নয়; একহারা ছিপছিপে সুন্দর চেহারা; তাঁর মুখশ্রীতে দুঃখ-অসন্তোষের একটি মলিন বিষণ্ণ কঠোরতার মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের একটি জ্যোতি কৃষ্ণপক্ষের জ্যোৎস্নার মতন ফুটিয়া রহিয়াছে।

শরতের প্রভাত। শারদাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্যই যেন এই গৌরবর্ণা বিধবা সদ্যস্নাত শুচি অবস্থায় শাদা ধবধবে থান কাপড় পরিয়া রৌদ্রকিরণে পিঠ দিয়া রূপার কাঁশিতে কলায়ের দাল-বাঁটা লইয়া শারদলক্ষ্মীর পূজার বড়ি দিতেছিলেন। চারিদিকে সমস্তই শুভ্র শুচি, [illegible]র সুগৌর হস্তের ক্ষিপ্র তাড়নায় শুভ্র দাল-বাঁটা শুভ্রতর হবে, [illegible]ফেনের ন্যায় ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল, এবং অমনি তিনি ডাক

পড়ে; সে এত্তেলা পাঠাইয়া গলা-খাঁকারি দিতে দিতে অন্দরে আসিয়া দ্বারান্তরালবর্ত্তিনী চিঠির-মালিককে চিঠির মর্ম্ম উদ্ধার করিয়া শুনাইয়া দিয়া যায়।

সুতরাং রোহিণী-দাসীর হাতে চিঠি দেখিয়াই পুরস্ত্রীরা সচঞ্চল হইয়া জানিতে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল—ও কার চিঠি।

রোহিণী গম্ভীর ভাবে বলিল—এ চিঠি খুড়িমার।

খুড়িমার বড়ি দিবার একাগ্রতা নষ্ট হইয়া গেল। তিনি উঠিয়া ছাদের আল্‌সের উপর ঝুঁকিয়া নীচে একবার উঁকি মারিয়া দেখিলেন; তারপর আবার ফিরিয়া আসিয়া নিবিষ্টমনে বড়ি দিতে বসিলেন, যেন তাঁর কিছুমাত্র চাঞ্চল্যের কারণ ঘটে নাই। কারণ, জমিদারের অন্তঃপুরে আশ্রয় যেদিন হইতে পাওয়া ঘটে সেইদিন হইতে বাহিরের সহিত সকল সম্পর্ক চুকাইয়া ফেলিতে হয়; বাহিরের সংবাদ পাইবার ব্যাকুলতা থাকে সকলেরই, কিন্তু অধিকার থাকে না কাহারও।

তাই নীচেকার পুরমহিলাদের আগ্রহ কলরবে বাড়িয়া উঠিল। কেউ জিজ্ঞাসা করিল—খুড়িমাকে আবার কে চিঠি দিলে? খুড়িমার তিনকুলে কেউ আছে নাকি?

রোহিণী ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল—কে আছে না আছে তা আমি কেমন কোরে জান্‌ব? আমি জানও নই, খুড়িমার একপ্রাণও নই।

রোহিণীর রকম দেখিয়া প্রশ্নকারিণী চুপ করিয়া গেল; আর কেহ কোনো প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না।

একজন কে গিন্নি-ধরণের মোটা গলায় বলিলেন—ও চিঠি আমার বিপন দিয়েছে হয়ত। নইলে ছোট বৌকে আর কে চিঠি দেবে?

তখন আবার কলরব উঠিল—দে রোহিণী চিঠি দে·····খুড়িমাকে দিয়ে আসি······

ছোট ছোট বালকবালিকারা পর্য্যন্ত রোহিণীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া চিঠি কাড়িবার জন্ত লাফাইতে লাফাইতে চেঁচাইতে ছিল—রোহিণী, রোহিণী, আমায় দে।······ও রোহিণী আমায় দে।······ওকে দিস্‌নে আমায় দে।······

রোহিণী বাঁ হাতে চিঠিখানি মাথার উপরে উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া ডাহিন হাতে ছেলের ভিড় সরাইতে সরাইতে ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল—নে নে সব থাম।······আমি যদি কাছাড়ী-বাড়ী থেকে বয়ে আন্‌তে পেরে থাকি ত আমিই খুড়িমাকে গিয়ে দিতে পার্‌ব।······ও খুড়িমা, তুমি কোথায় গো?······

রোহিণী কথা টানিয়া সুর করিয়া ডাকিল।

তখন খুড়িমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া ছাদের আল্‌সের ধারে দাঁড়াইয়া, বলিলেন—কি রোহিণী, ডাক্‌ছিস কেন? আমি এই ছাতে বড়ি দিচ্ছি।

রোহিণী একখানা খামের চিঠি উঁচু করিয়া ধরিয়া খুড়িমাকে দেখাইয়া একটু মিহি সুর টানিয়া বলিল—তোমার চিঠি এয়েচে!

খুড়িমা কিছুমাত্র ব্যগ্রতা না দেখাইয়া বলিলেন—কাগে বড়ি খেয়ে যাবে, তুই এখানে দিয়ে যা না রোহিণী।

হেলিতে দুলিতে রোহিণী ছাদে আসিল। সে জমিদার-বাড়ীর সেরা চাক্‌রাণী। স্বয়ং জমিদার-বাবুও নাকি এককালে তার নিতান্ত বশীভূত ছিলেন। তাঁর উপর এর প্রভাব এখনো একেবারে লোপ না পাওয়ার সন্দেহে চাকর দাসী আশ্রিত পরিজন সকলেই তাকে একটু খাতির করিয়া সম্‌ঝিয়া চলে। তার আঁটসাট চেহারা; মেটে রং, সুখে স্বচ্ছন্দে নির্ভাবনায় থাকার দরুণ পালিশকরা বাদামী

জুতার মতন চকচকে, দুটি গালে মেচেতার কৃষ্ণচক্র; দাঁতগুলি মিসির প্রসাদে একেবারে আতার বিচির মতন; তার উপর-হাতে সোনার মোটা অনন্ত; মণিবন্ধ শূন্য, যেহেতু সে বিধবা; গলায় সোনার দমা হার, কোমরে সোনার বিছে, পাতলা কাপড়ের ভিতর হইতে চিকচিক করিতেছে—এ ত আর সখের জন্য পরা নয়, সে বিধবা মানুষ তার বাহারের দর্কার কি?—চাবিকাঠিটা দিনে পঞ্চাশ বার হারায়, তাই কোমরে একগাছা সূতার ঘুন্সি না রাখিয়া একটু সোনা রাখিয়াছে, সময়ে অসময়ে কাজ দিবে, মানুষের গতরের কথা ত বলা যায় না; তার মুড়া চুলগুলি ঝুঁটি করিয়া বাঁধা, আর দুই হাত অনাবৃত রাখিয়া আঁচল কোমরে জড়ানো; ছোট ছোট চোখ দুটি দম্ভভরে কারো প্রতি দৃকপাত করিতে চাহে না; কিন্তু যার প্রতি একবার তার শুভদৃষ্টি পড়ে তার তখন শনির দৃষ্টিও শ্লাঘ্য বলিয়া মনে হয়।

রোহিণীর সঙ্গে সঙ্গে ছেলে মেয়ে বৌ ঝি দাসী চাকরাণী অনেকেই ছাদে আসিয়া সকৌতুকে খুড়িমার দিকে দেখিতে লাগিল; আজ এই অসাধারণ ঘটনায় খুড়িমা যেন রাজান্তঃপুরের ভিড়ের ভিতর হইতে নূতন করিয়া সকলের দৃষ্টিতে পড়িতেছেন।

বালক বিনোদ তার সঙ্গী পাঁচুকে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ ভাই পাঁচু, মেয়েমানুষেরও চিঠি আসে?

পাঁচু তার দশ বৎসরের দীর্ঘ জীবন এই অন্তঃপুরেই অতিবাহিত করিয়াছে। তার এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় এরূপ ব্যাপার আজ এই প্রথম। সুতরাং সে তার প্রশ্নকারী সঙ্গীকে সাহস করিয়া কোনোই সদুত্তর দিতে পারিল না। পাঁচু খুব গম্ভীরভাবে ভাবিতে লাগিল—হুঁ! আশ্চর্য্য বটে, মেয়েমানুষের চিঠি আসে তা হলে!

খুড়িমা বাঁ হাতে করিয়া চিঠিখানি লইয়া চকিতে একবার দেখিয়া লইলেন, এ কার হাতের লেখা। এ লেখা তাঁর পরিচিত নয়। তার পর যেন নিরুপায়ের স্বরে বলিলেন—আমায় আবার কে চিঠি লিখ্‌লে? কাকে দিয়েই বা পড়াই?……বাবা পাঁচু, তুই পড়্‌তে পার্‌বি?

খুড়িমা অল্পস্বল্প লেখাপড়া জানিতেন! তাঁর স্বামী একালের তন্ত্রের লোক ছিলেন, তিনি স্ত্রীকে লেখাপড়া শিখাইতেছিলেন। কিন্তু স্বামীর হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে সে পথ একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। খুড়িমা জমিদার হরিবিহারী-বাবুর সম্পর্কে ভ্রাতৃবধূ; তাঁকে অপুত্রক অসহায় দেখিয়া দয়াপরবশ হইয়া হরিবিহারী তাঁর অভিভাবক হন; কিছুদিন পরেই তাঁর সমস্ত জমিদারী, এমন কি স্বামী-শ্বশুরের ভিটাটুকু পর্য্যন্ত, কখন না জানি কেমন করিয়া হরিবিহারীর নিকট বিক্রয় হইয়া গেল, তখন খুড়িমাকে বাধ্য হইয়া হরিবিহারী-বাবুর সংসারেই আশ্রয় লইতে হইল। এই জমিদার-বাড়ীতে আসিয়া যখন তিনি দেখিলেন এখানে স্ত্রীলোকের লেখাপড়া জানাটা ভয়ানক নিন্দার কথা: এখানকার মেয়েপুরুষের ধারণা যে মেয়েমানুষ লেখাপড়া শিখিলে বিধবা, এমন কি অসতী হয়, গৃহলক্ষ্মীদের বাণীসেবা দেখিলে লক্ষ্মী চঞ্চলা হন; তখন হইতে খুড়িমা তাঁর স্বল্প বিদ্যাও ভুলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন এবং সযত্নে সকলের কাছে নিজের অক্ষরজ্ঞান পর্য্যন্ত গোপন রাখিতেন। এই চিঠিখানি পাইয়া যদিও তাঁর কৌতূহল হইতেছিল ফস করিয়া খামখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেখেন কে তাঁকে অকস্মাৎ চিঠি লিখিল, তথাপি, তিনি সে কৌতূহল দমন করিয়া নিতান্ত নিরুপায় ভাবে সেখানে উপস্থিত পুরুষদিগের মধ্যে বর্ষীয়ান্ ও জ্ঞানে গরীয়ান্ পাঁচুর শরণাপন্ন হইলেন।

দশ বছরের ছেলে পাঁচু। মরুঞ্চে পোয়াতির ছেলে সে। পাঁচুঠাকুরের দুয়ার ধরিয়া, হাতে কোলে লইয়া পূজা দিবার মানত করিয়া, কত কবচ মাদুলি পরাইয়া তুকতাক করাতে শত্রুমুখে ছাই দিয়া ষেটের কোলে পাঁচু এই দশ বছরে পা দিয়াছে। তার মাথাটি প্রকাণ্ড, শরীরটি কৃশ, পেটটি বাতাসভরা ফুটবলের মতন, গলায় একগাছি ময়লা ঘুন্সিতে অনেকগুলি মাদুলি—কোনোটার মৃদঙ্গের মতন আকার, কোনোটার ঢোলের মতন, কোনোটা হরিতকীর মতন শিরাতোলা, কোনোটা বা চৌপলা যশমের মতন; তাদের কোনোটা তামার, কোনোটা লোহার, কোনোটা রূপার, কোনোটা সোনার, কোনোটা অষ্টধাতুর এজমালি; মাদুলির সঙ্গে একটা সোনায়-বাঁধানো আম্ড়ার আঁঠি ও একটা ঘসা ফুটো পয়সা; মাদুলিগুলির অষ্টেপৃষ্ঠে পাঁচুর পোকাধরা ক্ষয়া দাঁতের অত্যাচার-চিহ্ন অঙ্কিত। পাঁচুর মাথায় মানতের বড় বড় চুল, তাতে স্থানে স্থানে ছড়া ছড়া জট বাঁধিয়া তেতুলগাছে তেঁতুলের মতন নড়নড় করিয়া ঝুলিতেছে; অবশিষ্ট চুল ঢিপি করিয়া খোঁপা বাঁধা। তার ডাহিন হাতে সূতার তাগা, পায়ে লোহার বেড়ি, ডাহিন নাকে সোনার মাকড়ি। এমনি করিয়া অষ্টেপৃষ্ঠে রশারশি কষিয়া, সর্ব্বাঙ্গে নোঙর বাঁধিয়া কোনোমতে বেচারাকে এই ভবসমুদ্রের তুফান হইতে বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছে। কিন্তু যমের দৃষ্টির প্রবল আকর্ষণ হইতে পাঁচুকে ইহলোকে টানিয়া রাখিবার জন্য এত রকম বন্ধনও তার স্নেহশঙ্কাতুর মাতার কাছে যথেষ্ট মনে হইত না।

এহেন পাঁচু, খুড়িমার চিঠি পড়িবার আমন্ত্রণ পাইয়া এত লোকের মধ্যে আপনার বিশেষ গৌরব অনুভব করিল। উৎসাহে সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল—হাঁ পার্ব খুড়িমা।

সকলে অবাক হইয়া পাঁচুর মুখের দিকে চাহিল। পাঁচুর এই অত্যাশ্চর্য্য সাহস দেখিয়া সকলে পাঁচুকে মনে মনে অভিনন্দন করিল—কোথায় কে কাগজের উপর যা-ইচ্ছা-তাই কালির কি হিজিবিজি আঁচড় কাটিয়াছে আর পাঁচু এখান হইতে তার মনের কথাটি হুবহু বলিয়া দিবে! এ আর হারাধন দৈবজ্ঞের চেয়ে কম কি হইল! আহা ছেলেটা বাঁচিয়া থাকিলে যে, একজন হাকিম হইয়া লোকের মনের কথা টানিয়া বাহির করিয়া সুবিচার করিবে, সে বিষয়ে কারো কোনো সন্দেহ রহিল না। সকলের সপ্রশংস ভাব দেখিয়া পাঁচুর মায়ের মন, পাঁচুর মনেরই মতন, আনন্দে অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল; সেও আপনার ছেলের দিকে স্নেহগর্ব্বমিশ্র সকৌতুক দৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিল।

পাঁচু পরম বিজ্ঞের মতন গম্ভীর ভাবে চিঠিখানা হাতে লইয়া ফাঁপরে পড়িল—খাম হইতে চিঠি বাহির করিবে কেমন করিয়া। সে কোন্ পথে ব্যূহভেদ করিয়া বন্দী চিঠিকে উদ্ধার করিবে তাই স্থির করিবার জন্ত খামখানি লইয়া দুচারবার উল্টাপাল্টা করিল।

তার মা সন্তানের বিপদ বুঝিয়া বলিল—দে, আমি খুলে দিচ্ছি।

মায়ের এই সাহায্যদানে পাঁচু আরামও অনুভব করিল এবং এত লোকের সাম্‌নে নিজের অক্ষমতা ধরা পড়াতে একটু লজ্জিত ও ক্ষুণ্নও হইল; মাতার উপর রাগও হইল, কেন সে তাড়াতাড়ি হাত হইতে চিঠি কাড়িয়া লইল—পাঁচু আর-একটু ভাবিবার সময় পাইলেই গোটা খামের পেট হইতে চিঠি বাহির করিবার উপায় আবিষ্কার করিতে পারিত। খামখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া চিঠি বাহির করিতে কে না পারে? পাঁচুকে বলিলেই হইত, খামখানা ছিঁড়িয়া ফেলিতে তার একটুও দেরী লাগিত না।

মা চিঠি বাহির করিয়া দিলে পাঁচু চিঠি প্রসারিত করিয়া দেখিল চিঠির অক্ষরগুলির ছাঁদ তার বর্ণপরিচয়ের অক্ষরের সহিত একটুও মেলে না; অক্ষরগুলা কোথা দিয়া যে কেমন করিয়া জড়াইয়া জড়াইয়া পরস্পরে পুঁটুলি পাকাইয়া গিয়াছে তার সূত্র সে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়াও কিছুতেই আবিষ্কার করিতে পারিল না। এর চেয়ে সে তালপাতে ঢের বড় বড় আর স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া থাকে। পাঁচু পাঠে পরাস্ত হইয়া নিতান্ত অবজ্ঞার ভাবে চিঠিখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল—"ছাই লেখা! ক্ষুদ্দি ক্ষুদ্দি, এমন এমন জড়ানো!"—এবং সঙ্গে সঙ্গে হাতের ভঙ্গী দ্বারা জড়ানো লেখার ইঙ্গিত করিয়া দেখাইল।

ইহা দেখিয়া সকলে হো হো করিয়া সমস্বরে হাসিয়া উঠিল। হাসির ধাক্কা পাইয়া পাঁচু সেখান হইতে দৌড় দিল।

তখন সকলে ভাবিল—নাঃ, ছেলেটা কোনো কর্ম্মেরই না! যেমন আকাট মুখ্খু বাপ শিবচরণ, তারই ত ছেলে!

পুত্রের পরাভবে পাঁচুর মা অপ্রতিভ হইয়া মাথা নত করিয়া পা দিয়া মাটিতে আঁক কাটিতে লাগিল, তার কালো মুখখানি তখন লজ্জায় বেগুনে হইয়া উঠিয়াছে।

খুড়িমা আবার মুস্কিলে পড়িলেন।

রোহিণী বলিল—খুড়িমা, ঠাকুরঘরে ভট্চাজ্জি-মশায় পূজো কর্‌ছেন, যাও না তাঁর ঠেঞে পড়িয়ে নেওগে না।

এই প্রস্তাব সকলেরই খুব সমীচীন বলিয়া বোধ হইল। সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভালো মনে করেছিস্ রোহিণী!

এত লোকের মধ্যে রোহিণী নিজের উপস্থিত-বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব-গৌরবে স্ফীত হইয়া বিনয়ের ভাবে স্মিত মুখ গম্ভীর করিয়া রহিল, যেন এ প্রশংসায়

তার কিছুই আসিয়া যায় না—এমন বুদ্ধির পরিচয় হামেশাই সে দিয়া থাকে এবং এমন প্রশংসাও সে নিত্যনিরন্তরই পায়। কিন্তু তার বিড়ালের মতন গোল গোল ছোট ছোট চোখ দুটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া সকলের মুখের উপর দিয়া প্রশংসার দৃষ্টি ভিক্ষা মাগিয়া ফিরিতেছিল।

রোহিণীর পরামর্শ শুনিয়া খুড়িমা সমাগতা পুরস্ত্রীদের মধ্যে একজনকে অনুরোধের স্বরে বলিলেন—ক্ষ্যামা, তুই বড়ি ক'টা দিয়ে দে না মা, ফেনা বোসে যাচ্ছে, আমি চিঠিখানা পড়িয়ে নিয়ে আসি।

সকলে চিঠি শুনিতে যাইবে আর তাকে একলাটি রোদে বসিয়া বড়ি দিতে হইবে ভাবিয়া ক্ষেমঙ্করী ক্ষুণ্ণ হইল। বলিল—খুড়িমা, যাক্‌গে ফেনা বোসে, আমি এসে আবার ফেনিয়ে দেবো।······ডাল-বাটাসুদ্ধ কাঁশিটা চটের তলে ঢেকে রাখ, নইলে কাগে-টাগে আবার মুখ দেবে।

খুড়িমা আর কিছু না বলিয়া কাঁশির কানায় হাতের ডাল যথাসম্ভব মুছিয়া কাঁশি ঢাকিয়া রাখিয়া বাঁ হাতে চিঠি লইয়া ভট্টাচার্য্যের সন্ধানে রওনা হইলেন।

জমিদারদের বাস্তুদেবতা লক্ষ্মীজনার্দ্দন শালগ্রাম শিলা। নন্দকিশোর স্মৃতিরত্ন জমিদার-বাবুদের কুলপুরোহিত। তিনিই নিত্য অন্দরে আসিয়া বাস্তুদেবতার পূজা করেন। স্মৃতিরত্ন-মহাশয় দীর্ঘায়ত সুন্দর সুগৌর পুরুষ; বয়স পঞ্চাশের ঊর্দ্ধে; মাথাভরা টাক, কেবল দুই কানের পাশ হইতে পশ্চাৎ পর্য্যন্ত ঘন চুল আছে, কিন্তু শিখা নাই।

ভট্টাচার্য্য পুরু গালিচার আসনে সরল উন্নত হইয়া বসিয়া পূজা করিতেছেন। পরণে গরদের কাপড় ও উত্তরীয়, গরদের রঙে ও দেহের রঙে মিশিয়া যেন একাকার হইয়া গেছে। উপবীতগুচ্ছ সুশুভ্র। পাশে মারবেল পাথরের স্বচ্ছ শুভ্র মেজের উপর অমল শুভ্র একখানি গামছা

ভাজ করা রহিয়াছে। পূজারীর ন্যায়, পূজার স্থান ও উপকরণ সমস্তই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পূজার ঘরটি ধূপ ধূনা চন্দনের গন্ধে আমোদিত।

খুড়িমা ঘরে ঢুকিয়া গলায় আঁচল দিয়া প্রথমে নারায়ণকে, পরে পুরোহিতকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া একপাশে দাঁড়াইলেন, অপর সকলে তাঁর পশ্চাতে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল।

স্মৃতিরত্ন-মহাশয় এতগুলি লোককে একসঙ্গে আসিয়া অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি মা?

খুড়িমা ডান হাতের উল্টা পিঠ দিয়া ঘোমটা একটু বাড়াইয়া দিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন—এই চিঠিখানা দেখুন ত কে দিয়েছে?

স্মৃতিরত্নের সহিত বাড়ীর সকল মেয়েই কথা বলিত। স্মৃতিরত্ন এ বাড়ীর আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই হিতৈষী বন্ধু। সকলে নিজের দুঃখবেদনা অকপটে এঁর নিকট স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় না, এবং ইনিও তাদের সান্ত্বনা দিয়া উপদেশ দিয়া পরামর্শ দিয়া উপকার করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। এই স্নিগ্ধচরিত্র সৌম্যমূর্ত্তি মিষ্টবাক্ ব্রাহ্মণ সেইজন্য সকলেরই পরমাত্মীয়।

খুড়িমা অগ্রসর হইয়া স্মৃতিরত্নের কাছে চিঠিখানা রাখিয়া দিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—আগে দেখুন ত চিঠিখানা লিখেছে কে?

চিঠিতে কি লেখা আছে তার চেয়ে কে দিয়াছে তাই জানিবার কৌতূহল খুড়িমার প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

ভট্টাচার্য্য চিঠির পাতা উল্টাইয়া পড়িলেন—অভাগিনী মালতী।

খুড়িমা বলিলেন—ও! মালতী! মালতী আমার বোনঝি। আহা, মেয়েটা জন্মদুঃখিনী; অভাগিনীই বটে! বিয়ে হতে-না-হতে বিধবা হল; শ্বশুরবাড়ীতে একদিনের তরে লক্ষ্যস্থল পেলে না; বাপের ভিটেয় পা

দিতে-না-দিতে বাপ মর্‌ল ; এখন ওরা মায়ে ঝিয়ে টিমটিম কর্‌চে। আমার বাপের সম্পর্কে আপনার বল্‌তে এখন কেবল ওরাই।

প্রভাতের আগমনী গানের কথায় ও সুরে খুড়িমার চিত্ত স্নেহার্দ্র ও শোকার্ত্ত হইয়াই ছিল ; এখন এই দূরগত ও অপরিচিত আপনার জনের দুঃখ স্মরণ করিয়া তাঁর মন স্নেহে মমতায় একেবারে অভিষিক্ত হইয়া উঠিল ; এই নিঃসম্পর্কীয় পরের বাড়ীর মধ্যে বন্দী অবস্থায় দূরের আপনার জনকে স্মরণ হওয়াতে তিনি যেন অমৃতের আস্বাদ পাইলেন, তাঁর অন্তরে নিষ্ফল মাতৃস্নেহ আজ অকস্মাৎ মালতীর নাগাল পাইয়া বুভুক্ষুর মতন দুই হাত বাড়াইয়া তাকে ধরিবার জন্য ছুটিয়া চলিল। খুড়িমা অঞ্চল তুলিয়া চক্ষু মার্জ্জনা করিলেন।

ভট্টাচার্য্য হস্ত প্রসারিত করিয়া আলোর দিকে চিঠি ধরিয়া চক্ষু একটু বিস্ফারিত করিয়া একটু চেষ্টার সহিত চিঠি পড়িতে লাগিলেন—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

মাসিমা, আমি অভাগিনী, আমার শেষ আশ্রয়ও হারিয়েছি ; আমার স্নেহময়ী মা……

ভট্টাচার্য্য চিঠিপড়া বন্ধ করিয়া করুণ নেত্রে খুড়িমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—মা, আমার চশমা নেই, ভালো দেখতে পাচ্ছিনে, বিকেলে এসে চিঠি পোড়ে দেবো, এখানা এখন আমার কাছেই থাক্…

খুড়িমা চোখে আঁচল চাপা দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—ভট্চাজ্জি-মশায়, আমি সব বুঝতে পেরেছি, আমার দিদি আর নেই।……আমি পাষাণী, আমার সব সইবে, আপনি চিঠি পড়ুন।

ভট্টাচার্য্য বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া পড়িতে লাগিলেন—

আমার স্নেহময়ী মা আমাকে অকূলে ভাসিয়ে গত ২রা আশ্বিন স্বর্গে গেছেন। মাসিমা, এখন তোমার কাছ ছাড়া আর কোথাও আমার

দাঁড়াবার স্থান নেই। তুমি আমাকে শীগ্‌গির তোমার কাছে নিয়ে যাবার উপায় কোরো। এখানে একলা থাকতে আমার বড় ভয় করছে। এক এক দিন যাচ্ছে, না এক যুগ যাচ্ছে। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, দেরি কোরো না। ইতি—অভাগিনি মালতি।

একদণ্ড কাঁদিয়া খুড়িমা ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন—আমি মেয়েমানুষ, পরাধীন; আমিই ত পরের দয়ার উপর আছি, আমি তাকে কোথায় ঠাঁই দেবো? রাক্ষসী সবাইকে খেয়ে এখন আমার ভরসা করছে!

রোহিণী সহানুভূতি দেখাইয়া বলিল—হ্যাঁ, তাই ত বটে! তোমার হয়েছে আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে।

দাসীর এই কথা বিষদগ্ধ-শেলের মত খুড়িমার মর্ম্মে গিয়া বিঁধিল। অথচ আশ্রয়দাতার আদরের চাকরাণীকে কিছু বলিবার সাহস তাঁর ছিল না। খুড়িমা তার কথার বিষটাকে একটু সহনীয় করিয়া লইবার জন্য নিজের অদৃষ্টকেই ধিক্কার দিয়া বলিলেন—সত্যিই ত। আমি নিজেই পরের গলগ্‌গেরো, আমি আবার কাকে আশ্রয় দেবো? যা থাকে তার কপালে তাই হবে, আমি তার কি করব? পোড়াকপালী আমায় চিঠি দিয়ে শুধু আমার যন্ত্রণা বাড়ালে বৈ ত নয়!

রোহিণী বলিল—সত্যি বাপু! মেয়েটার কি আক্কেল! তুই ত তবু নিজের ভিটেয় পোড়ে আছিস্; আর খুড়িমার বলে চাল না চুলো ঢেঁকি না কুলো পরের বাড়ী হব্বিষ্যি!

স্মৃতিরত্ন বিষণ্ণ দৃষ্টিতে মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন—মা রোহিণী, তুমি একটু চুপ কর······দেখ বৌমা, তুমি ছোট রাণীমাকে একবার বল্‌গে; তাঁর দয়ার শরীর—তিনি যেন মা বসুন্ধরা—এত লোকের ভার যখন অক্লেশে বহন করচেন, তখন আর-একটি নিরাশ্রয়াকেও ঠাঁই দিতে তিনি কাতর হবেন না।········ যাও মা। বিপদে অধৈর্য্য হতে

নেই; স্থিরবুদ্ধিতে কাজ কর্‌লে বিপদ অধিকক্ষণ টিক্‌তে পারে না। নারায়ণে ভক্তি রেখো মা! জেনো, যার কেউ নেই নারায়ণ তার সহায়। যাও একবার গিন্নিমাকে বুঝিয়ে বলগে, আমিও একবার হরিবিহারীকে বল্‌ব।

গিন্নির দয়ার সম্বন্ধে খুড়িমার যথেষ্ট সন্দেহ থাকিলেও এত লোকের সম্মুখে ভট্টাচার্য্যের কথায় সায় দেওয়া ছাড়া আর অন্য উপায় তাঁর ছিল না। তিনি চোখ মুছিয়া বলিলেন—অবিবশ্যি, দিদির দয়ার শরীর। তিনি যেন রাজি হবেন। কিন্তু সেই আবাগীকে কল্‌কেতা থেকে এখন আন্‌বে কে? সোমথ মেয়ে যার-তার সঙ্গে আসা ত ভালো দেখাবে না।

ভট্টাচার্য্য-মহাশয় বলিলেন—তার জন্তে ভেবো না মা! আমি-নবকিশোরকে লিখে দেবো, সেই-ই তোমার বোনঝিকে এখানে পৌঁছে দিয়ে যাবে।……এখন তুমি যাও, ছোটরাণীমাকে বোলে অনুমতি নাওগে।

খুড়িমা আশা আশঙ্কা লজ্জা সঙ্কোচ অন্তরে ভরিয়া লইয়া গিন্নি-রাণীর সন্ধানে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

গিন্নিরাণী অন্দরের পুকুর-ঘাটের মার্ব্বেলবাঁধানো চাতালে একখানি অতি-মিহি-কাঠির বিচিত্র-বুননের মছলন্দের মাদুর পাতিয়া বসিয়া তেল মাখিতেছিলেন। দুজন ঝি কাপড়ের উপর কোমরে গামছা জড়াইয়া রাণীর স্থূল দেহে ডলিয়া ডলিয়া তেল মাখাইতেছিল।

গিন্নির আকার দীর্ঘে প্রস্থে প্রায় সমান; গায়ের বর্ণ মেটে, অত্যধিক মার্জ্জন ও প্রসাধনের সাহায্যে জ্যোৎস্নারাতের মেঘের মতন; কষিয়া খোঁপা বাঁধিতে বাঁধিতে সীঁথি এক আঙুল চওড়া হইয়া

গিয়াছে, কপাল দরাজ হইয়া উঠিয়াছে; চুল উঠিয়া গিয়া কপাল প্রশস্ত হইয়া পড়াতে মনে হয় চোখ নাক যেন যথাস্থানের অনেক নীচে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, এবং উল্কির তিলক যেন বঁড়শীতে নাকটিকে গাঁথিয়া ললাটসমুদ্রে তলাইয়া যাওয়া হইতে কোনোমতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। গিন্নির গলায় খুব মোটা হেঁসোহার; মণিবন্ধে মোটা হাঙরমুখো স্ক্রু-পাকের বালা ও বেঁকি চুড়ি; বাহুতে হাঁসুলির মতন প্রকাণ্ড ফাঁদের অনন্ত; পায়ে একগাছা করিয়া মোটা বাঁকমল; নাকে সুদর্শন চক্রের মতন মস্ত নথ, মুক্তার ডোর দিয়া ছোট্ট খোপাটার সঙ্গে টানিয়া বাঁধা; কানে মাকড়ির সারি; কাঁকালে চার-আঙুল চওড়া চন্দ্রহার। গিন্নির বয়স তেমন বেশী নয়, চল্লিশের কাছাকাছি। তাঁর গর্ভজাত সন্তান তিনটি—দুটি পুত্র পুলিনবিহারী ও বিনোদবিহারী, এবং একটি কন্যা বিনোদিনী। পুলিন আজন্ম রুগ্ন ছিল; সে যে বারো বৎসর বাঁচিয়া ছিল একদিনের জন্যও রোগযন্ত্রণার হাত এড়াইতে পারে নাই; তাই তার মায়ের মনে একটি গভীর বেদনার ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। বিনোদের বয়স এখন বছর আট, আর বিনোদিনীর বয়স বছর তিন। কিন্তু নিজের গর্ভজ সন্তান ছোট থাকিলে কি হয়, মৃত বড়রাণীর পুত্র বিপিন এখন বড় হইয়া উঠিয়াছে; বিপিনকে আঁতুড়েই অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া যখন তার মা ইহলোক ত্যাগ করেন, তখন ছোটরাণীর বয়স অল্প, তখনও তিনি নিঃসন্তান; তবু তিনি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া মাতৃহীন সপত্নীপুত্রের লালনপালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। দুষ্ট লোকে যদিও তখন মনে করিয়াছিল যে ইহা সতীনের ছেলেকে বাঁচিতে না দিবার ফন্দি, ডাইনের মায়া, কিন্তু বাস্তবিক বিপিনই প্রথমে তাঁর প্রাণে মাতৃস্নেহের অমৃত-উৎসের সহস্র বিচিত্র ধারা উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল; বিপিন তাঁর প্রথম-লব্ধ

স্নেহের ধন, তাঁরই কোলে সে মানুষ হইয়া এখন অতবড়টি ডাগর হইয়াছে, এখন বরণ করিয়া বৌ ঘরে তুলিলেই হয়। তাঁর বড় সাধ ছিল যে বিপিনের অল্প বয়সেই বিবাহ দিয়া কিশোর-কিশোরীর প্রণয়-লীলা দেখিয়া জন্ম সার্থক করিবেন; কিন্তু বিপিন এক-রোখা ছেলে, সে পাঠ সমাপ্ত না করিয়া কিছুতেই বিবাহ করিবে না পণ করিয়া বসিয়া আছে। এই অগ্রহায়ণ মাসে বিপিন এম-এ এগ্‌জামিন দিবে; মাঘ মাসে, না হয় ত ফাল্গুন মাসে তার বিবাহ দিতেই হইবে। বৌ ঘরে আসিলে ত অধিক সাজসজ্জা করা ভাল দেখাইবে না, তাই গিন্নিরাণী বিবিধ প্রকারের গহনা ও কাপড় সদাসর্ব্বদা পরিয়া থাকিয়া জন্মের সাধ মিটাইয়া লইতেছিলেন।

বামা দাসী হাতে তেল ডলিতে ডলিতে বলিতেছিল—রাণীমা, তাগাটা হাতে বড় কষে গেছে, এটাকে ভেঙে একটু ফাঁদালো কোরে গড়্‌তে দিয়ো।

অপর দাসী হাবার-মা অমনি বলিয়া উঠিল—আ মর, তোর যেমন কথা! রাণীমার শরীর ত দিন্‌কের দিন কাহিল হয়ে যাচ্ছে। এর চেয়ে ফাঁদে বড় হলে যে হাতে ঢন্‌ঢন্ করবে! এই ত…এই এতখানি ঢল! …তা মা, তোমাদের গায়ে কি পুরোণো গয়না মানায়? নিত্যি নতুন নতুন গড়াবে বৈ কি? কিন্তু ভেঙে গড়াতে যাবে কোন্ দুঃখে? আমরা গরিবগুরবো মানুষ, একখানা গহনা কষ্টেস্বষ্টে গড়াই, রোগা হয়ে ঢন্‌ঢন্ করলেও পর্‌তে হয়, মোটা হয়ে এঁটে বস্‌লেও পর্‌তে হয়। তোমরা হলে রাজারাজ্‌ড়া, পুরোণো গয়না কাপড় পের্‌সাদী করে চাকরদাসীকে হাতে তুলে দিলে তারা বর্ত্তে যাবে আর তোমাদেরও নাম হবে।

গিন্নি ছোট বৌয়ের চিঠির সংবাদ জানিবার জন্য উৎসুক ও অন্যমনস্ক হইয়া ছিলেন। তিনি গিন্নি মানুষ, কৌতূহল তাঁর সাজে না, তাই

তিনি কোনো ব্যস্ততা প্রকাশ করিতে পারিতেছিলেন না; কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে করিতেছিলেন যে এইবার রোহিণী আসিয়া তাঁকে সমস্ত সংবাদ শুনাইবে। দাসীরা যখন তাঁর মোটা তাগা দুগাছার উপর নজর দিয়া তাঁকে দান করিয়া নাম কিনিতে পরামর্শ দিতেছিল, তখন তাঁর মন দাসীদের কথার দিকে ছিল না। গিন্নি অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন—এসব গয়না আমি আর কদিনই বা পর্‌ব? বিপিনের বৌ এলে তাকেই ভেঙে গড়িয়ে দেবো।

দাসীরা অমনি সেই সূত্র ধরিয়া উল্লাস করিয়া বলিল—হ্যাঁ রাণীমা, দাদাবাবুর কবে বিয়ে? আমরা কিন্তু খুব ভালো রকম বক্‌শিশ নেবো, তা বোলে রাখছি। গরদের কাপড়, সোনার কণ্ঠি আর তাগা দিতে হবে বাপু।

গিন্নি বলিলেন—আমরা ত মনে করেছি, এই মাঘ ফাল্গুনে বিপিনের বিয়ে দেবো! দেখি সে বাড়ী এসে কি বলে। যুগ্যি ছেলের মত না নিয়ে ত আর কিছু করা চলে না।

হাবার মা বলিল—তাই ত মা, দাদাবাবুর কেমন এক ধারা, বিয়ে কর্‌তে চায় না কেন বলো দেখি। কল্‌কেতায় থেকে স্বভাব চরিত্তির বিগ্‌ড়ে গেল নাকি?

রাণী বলিলেন—না না, বিপিন আমার সোনারচাঁদ ছেলে, ওর শরীরে এতটুকু দোষ নেই। লেখাপড়া নিয়েই মেতে আছে, তাই বিয়ের দিকে মন যায় না! এইবার পড়া শেষ হবে; এখন বিয়ে কর্‌বে বৈ কি।

অমনি রাণীর কথার সূত্র ধরিয়া বামা বলিয়া উঠিল—দাদাবাবুর সাধু চরিত্তির তা আর একবার কোরে বল্‌তে? কিন্তু বাপু রাতদিন শুধু পড়া আর পড়া, এ কি রকম বাই! তোমার কি বাপু চাক্‌রী কোরে খেতে হবে, না দাদাঠাকুরের মতন টোল খুল্‌তে হবে? ঐ ছোট তরফের

মেজবাবু ত আমাদের দাদাবাবুদেরই বয়সী ; এর মধ্যে তিন-তিনটে বিয়ে করেছে। তার ওপর আবার রঘুনাথ দেওয়ানের বিধবা ভাজ কালী, তারাকেও ত বাড়ীতে এনে রেখেছে। হ্যাঁ মা, শুন্‌ছি যে তাকেও নাকি বিয়ে কর্‌বে! ওমা বিধবার আবার নাকি বিয়ে হয়! তা বড়লোকে ইচ্ছে করলে কি না করতে পারে! একেই ত বলে জমিদারী চাল! আর আমাদের দাদাবাবুর কথা নেই বার্ত্তা নেই কারুর সঙ্গে, রাতদিন মুখে বইয়ে লেগে রয়েছে। রাত্তির দিন যদি কাগজই ঘাঁট্‌লে ত মুহুরী-গোমস্তায় আর জমিদারে তফাৎটা রইল কোথায়?

হাবার মা বলিল—আমাদের দাদাবাবুর চাল ত দাদাঠাকুর হতেই বেগ্‌ড়াল, সে উঠতে বল্‌লে ওঠে, বস্‌তে বল্‌লে বসে! আমি শুনেছি নিজের স্বকর্ণে, দাদাবাবুকে সলা দেওয়া হয়—ছেলে-মেয়ের অল্প বয়সে বিয়ে দিতে নেই, বিধবার বিয়ে দিতে হয়, আমোদ আহ্লাদ করা খারাপ!······শুনেছ একবার কথা! রাজার বেটাকে ফকিরীর পরামর্শ!··· মা, তুমি দাদাবাবুকে দাদাঠাকুরের সঙ্গে আর বেশী মিশ্‌তে দিয়ো না।

রাণী বলিলেন—বিপিন ত মানা শুন্‌বে না, ও যে নবকিশোরকে একেবারে ভাইয়ের মতন দেখে। জ্ঞানবুদ্ধি হলে আপনিই সাম্‌লে যাবে, বাঘের বাচ্চা বাঘই হবে।

বন্ধুবিচ্ছেদের চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়া হাবার মা ক্ষুণ্ণ মনে জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ রাণীমা, দাদাবাবুরা কবে আস্‌বে?

গিন্নিরাণী মাতৃগর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—এইবার বিপিনের শেষ এগ্‌জামিন; অঘ্রাণ মাসে এগ্‌জামিন দিয়ে বাড়ী আস্‌বে।

হাবার মা বলিল—ওমা! তবে কি এবার পূজোর সময় দাদাবাবু বাড়ী আস্‌বে না?······তবে দাদাঠাকুর এখন আস্‌বে কেমন করে?

তিনি " বলিলেন—না, নবকিশোর বিপিনের সঙ্গেই আস্‌বে; এখন আস্‌বে না।

হাবার মা বলিল—না, আস্‌বে ভট্‌চাযিয়-মশায় বল্‌ছিলেন। আমি তেল নিয়ে আস্‌তে আস্‌তে শুনে এলাম।

গিন্নি উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বল্‌ছিলেন ভট্‌চাযয়-মশাই?

হাবার মা বলিল—ছোট খুড়িমার বোনঝি এখানে আস্‌বে কিনা! ছোট খুড়িমা ভাবছিল যে কে তাকে নিয়ে আস্‌বে, তাই ভট্‌চাযিয়-মশায় বল্‌লেন যে তার আর ভাবনা কি, নবকিশোর নিয়ে আস্‌বে 'খন।

গিন্নি বিস্মিত হইয়া বলিলেন—ছোট বৌএর বোনঝি? সে এখানে আস্‌বে বুঝি?

হাবার মা এতবড় একটা নূতন খবর গিন্নিকে প্রথমে শুনাইবার সুযোগ পাইয়া আনন্দে ও গৌরবে স্ফীত হইয়া বলিল—ওমা! সবাই শুনেছে আর যারপর নাই তুমি কাণ্ডখানা শোননি বুঝি রাণীমা? খুড়িমার বোন যে মারা গেছে! বিধবা বোনঝি তাই এখানে আস্‌বে বোলে মাসিকে চিঠি দিয়েছে। এ খবর সবাইকে জানালে, আর যার বাড়ীতে থাক্‌বে তাকেই না জানিয়ে সব ঠিকঠাক কোরে ফেলা হল। ওমা, খুড়িমার ত ভ্যালা আক্কেল যা হোক।

দাসীর এই ইঙ্গিতে গিন্নির মন ভারী হইয়া উঠিল, তিনি মনে করিলেন ছোট বৌ তাঁর অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই, নিজের বোনঝিকে নিজের কাছে আনাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

গিন্নিকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া হাবার মা বলিতে লাগিল—রোহিণী যথার্থই বল্‌ছিল—আপনি শুতে ঠাঁই পান না, আবার শঙ্করাকে ডাকেন। রোহিণী আমার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া কোরে মরে, ওর ঐ যা এক

দোষ; নইলে যা বল তা বল বাপু, ওর বুদ্ধি শুদ্ধি আছে; এক একটা কথা বলে ভালো।

গিন্নি লোকটি বড় সরল; কেবল তিনি যে একজন মস্ত লোক, এই জমিদার-সংসারের গিন্নি, এই অহঙ্কার তাঁকে অতিমাত্র প্রভুত্বপ্রিয় ও তোষামোদলিপ্সু করিয়া তুলিয়াছে। তিনি রাণী বলিয়া বাড়ীর পরিজনদের সহিত মিশিতে পারিতেন না, বাহিরের পাড়াপ্রতিবাসিনীদের মধ্যেও তাঁর সমকক্ষ সঙ্গিনী হইবার মতন কেহ ছিল না; এতে তাঁকে সর্ব্বদাই দাসীদের লইয়াই দিন কাটাইতে হইত; ছোটলোকের সংসর্গে থাকিয়া থাকিয়া তাঁর মনটি ভালোয় মন্দে জড়াইয়া জটিল হইয়া গিয়াছিল। কোনো একটা বড় বিষয়ে তিনি যে কেন উদার এবং একএকটা সামান্য ছোট ব্যাপারে কেন যে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ তাহা বুঝা যাইত না। তাঁর সংসারে সম্পর্কীয়া ও নিঃসম্পর্কীয়া আশ্রিতার সংখ্যা কম ছিল না, কেউ আসিয়া আশ্রয় চাহিলেই সে পরিবারভুক্ত হইয়া রাজার হালে থাকিতে পাইত; কিন্তু খুড়িমার মুখে আবেদন শুনিবার পূর্ব্বেই দাসীর মুখে খুড়িমার নিরাশ্রয়া বোনঝির আগমন-সংবাদটা বিরূপ ভাবে শুনিয়া তাঁর মন বাঁকিয়া বসিল। অধিকন্তু খুড়িমা যে এককালে তাঁরই সমকক্ষ শরিক ছিলেন, এ কথা রাণী কিছুতেই ভুলিতে পারিতেন না; তিনি তাই পদে পদে খুড়িমার অহঙ্কারের পরিচয় পাইতেছেন মনে করিয়া তাঁর কোনো আচরণই সহজভাবে লইতে পারিতেন না; অপর আশ্রিতাদিগের যে ত্রুটি তিনি লক্ষ্যও করিতেন না, খুড়িমার পক্ষে সেই ত্রুটি কল্পনা করিয়াই তিনি মনকে বিরূপ করিয়া তুলিতেন।

সজলনেত্রা খুড়িমা যখন মালতীর চিঠি হাতে করিয়া সেই ...নতে ... ঝাঁঝের উপস্থিত হইলেন তখন দেখিলেন রাণীগিন্নি মুখ ভার ... ছোট বৌ। হইয়া বসিয়া আছেন, দাসীরা একমনে তেল মাখাই...

সঙ্গে-সঙ্গে গর্ব্বিতা রোহিণী ও রঙ্গদর্শিকা পুরাঙ্গনাগণ ঘাট পর্য্যন্ত আসিয়াছিল; ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলিও অবুঝ ঔৎসুক্যে খেলা ভুলিয়া এই জনতার সঙ্গে-সঙ্গে ভিড় বাড়াইয়া ফিরিতেছিল; তারা গিন্নির মুখের ভাব দেখিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইল; এবং ছোট বৌএর বোনঝির ব্যাপার লইয়া বাড়ীতে এমন একটা সোরগোল পড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া গিন্নির মুখ অধিকতর অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

ব্যাপার বুঝিতে খুড়িমার বিলম্ব হইল না। ভিক্ষুকের দৈন্য ও লজ্জা তাঁকে কষাঘাত করিতে লাগিল। তাঁর মুখ দিয়া একটিও কথা ফুটিল না,—কিন্তু চোক দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল বিস্তর। আজ তাঁর শোকের চেয়ে তাঁর ভিক্ষার কথাটাই যে লোকের কাছে বড় হইয়া দেখা দিয়াছে এই লজ্জায় তাঁর মর্ম্মবেদনা অতিশয় তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল; আর সেই সঙ্গে মনে হইতেছিল, এমন দিন তাঁর চিরকাল ছিল না; তিনি গিন্নিরই একজন সমকক্ষ ছিলেন, তাঁরও এমনই ঐশ্বর্য্য বিলাস দাসদাসী সব ছিল; তাঁর প্রসাদ ভিক্ষা করিয়া কত চাটুবাণী অহরহ তাঁরও কর্ণে ধ্বনিত হইত। তারপর সে কী দুর্দ্দিন যেদিন তিনি অকস্মাৎ বিধবা হইয়া অসহায় হইলেন এবং হরিবিহারী-বাবুর চক্রান্তে নিরাশ্রয় হইয়া তাঁরই সংসারে আশ্রয় ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। হরিবিহারী-বাবু ও তাঁর গিন্নি ত তাঁকে প্রত্যাখ্যান করিয়া একেবারে পথে বসাইতেই চাহিয়াছিলেন, কেবল বিপিনের জেদে তাহা হইতে পায় নাই। বিপিনের ভক্তিযত্নে তিনি পরাধীনতার সকল গ্লানি একরূপ ভুলিয়া ছিলেন; কিন্তু
৫..
আবার, যে রাক্ষসী মেয়েটার জন্য তাঁকে দ্বিতীয়বার ভিক্ষার গ্লানি
গি
রিতে হইতেছে, তার দিক হইতে খুড়িমার মন কাজেকাজেই
রোহিণী যৎ
পড়িতেছিল। তিনি দীনতার লজ্জায় দ্বিধায় পড়িয়া ঠিক
ডাকেন। রে
লেন না তখন তাঁর কর্ত্তব্য কি? ভিক্ষা চাহিতেও মাথা

কাটা যাইতে ছিল, ভিক্ষা চাহিতে আসিয়া ফিরিয়া যাওয়াও অশোভন অহঙ্কার বলিয়া মনে হইতেছিল।

খুড়িমাকে নির্ব্বাক থাকিতে দেখিয়া রোহিণী আর থাকিতে পারিল না, বলিয়া উঠিল—কি হল গো খুড়িমা, রাণীমাকে বলো না গো, চুপটি কোরে কাঁদ্‌লে রাণীমা জান্‌বে কেমন করে?···রাণীমা, খুড়িমা বল্‌তে এসেছে···

খুড়িমার অপেক্ষা না করিয়া রোহিণী নিজেই খুড়িমার আবেদন গিন্নিকে জানাইতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া খুড়িমা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না; রোহিণী কথাটাকে কেমনভাবে উপস্থিত করিবে তার ঠিক নাই, তার চেয়ে নিজের কথা নিজেই বলা ভালো মনে করিয়া খুড়িমা তাড়াতাড়ি রোহিণীর কথার উপসংহার করিয়া বলিলেন—দিদি, আমার দিদি মারা গেছে।

গিন্নি অপ্রসন্ন মুখে বসিয়া রহিলেন, সান্ত্বনার একটি কথাও উচ্চারণ করিলেন না।

হাবার মা বলিয়া উঠিল—তা রাণীমা সব কথা আগেই শুনেছে; তোমার বোনঝির আস্‌বার কথাও শুনতে বাকি নেই। না।

খুড়িমা বুঝিলেন তাঁর ভিক্ষার খবর তাঁর বলিবার আগেই গিন্নি আশ্রয় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এবং সেইজন্যই গিন্নি অমন বজ্রগম্ভীর বসিয়া আছেন। গিন্নির এই নিষ্ঠুর নীরবতা ও দাসীদের বে তাকাইয়া বোনঝির আশ্রয়-প্রার্থনার কথা আর তাঁর মুখ হইতে বাহির ষ্টি সঙ্ক না। খুড়িমা তীব্র দৃষ্টিতে গিন্নির মুখের দিকে তাকাইয়া তাঁতে প্রতীক্ষায় আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। জানিতে

খুড়িমাকে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া গিন্নি একটু ঝাঁঝের সহিত বলিয়া উঠিলেন—ওসব কিছু পিত্যেশ কোরো না ছোট বৌ। তোমার বোনঝির এখানে আসা সুবিধে হবে না।

খুড়িমা বলিলেন—আমায় ঠাঁই দিয়েছ দিদি; আমার নিতান্ত আপনার জন সে, তাকেও একটু ঠাঁই দাও।

গিন্নি মুখ বক্র করিয়া বলিলেন—তোমায় ঠাঁই দিয়েছি বোলে কি চোর-দায়ে ধরা পড়েছি নাকি? আমার বাড়ী—সরাই, না হোটেল, যে, যে আস্‌বে তাকেই ঠাঁই দিতে হবে?

খুড়িমা মিনতির স্বরে বলিলেন—কত লোক ত তোমার আশ্রয়ে রয়েচে, আর-একটি নিরাশ্রয় মেয়েকে আশ্রয় দেওয়া তোমার পক্ষে এমনই কি ভার দিদি?

গিন্নি মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—লোকের হিংসেতেই তুমি গেলে। কেন লোকের কর্‌ব না, তাদের কর্‌লে দেশ বিদেশে আমার নাম হবে। আর তোমাদের কিছু করা সে ত ভস্মে ঘি ঢালা।

খুড়িমাকে কিছু সাহায্য করা যে দয়া করা নয়, খুড়িমার ন্যায্য পাওনা পরিশোধ করা, এই বোধ গিন্নির মনে স্পষ্ট হইয়া থাকিয়া তাঁকে পীড়া দিত, তাঁর প্রভুত্বকে সঙ্কুচিত করিত। এইজন্য তিনি খুড়িমাকে দেখিতে ধ্বনিতেন না, তাঁকে কোনোপ্রকারে সাহায্য করিতে তিনি আনন্দ অনুভব হইয়া অ না। খুড়িমার স্বভাব সহজে হীনতা স্বীকার করিতে পারিত তাঁরই সংসাথাসামোদের কথা সব সময় তাঁর মুখে জোগাইত না। গিন্নির ও তাঁর গি খুড়িমার বাক্যস্রোত আবার বন্ধ হইয়া গেল, তিনি চুপ করিয়া চাহিয়াছিলেন,লেন।
ভক্তিস্বরে তি বলিয়া উঠিল—তা খুড়িমা, তোমার বোনঝি ত কম মেয়ে আব নিজের ঘরবাড়ী থাক্‌তে পরের বাড়ীতে আস্‌বার এত সাধ কেন?

খুড়িমার উত্তর শুনিবার জন্য গিন্নি তাঁর মুখের দিকে চাহিলেন।

খুড়িমা লজ্জায় ব্যথিত হইয়া গিন্নির দিকে চাহিয়া বলিলেন—

সোমত্থ মেয়ে, একলা কেমন কোরে থাক্‌বে, তাই আমার কাছে আস্‌তে চেয়েছে।

রোহিণী বলিল—তা তুমিই বোন্‌ঝির কাছে থাক গে না।

দাসীর স্পর্দ্ধা দেখিয়া খুড়িমার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল, চোখ মুখ দিয়া আগুন ছুটিতে লাগিল। খুড়িমা রোহিণীর দিকে তীব্র দৃষ্টি হানিয়া কঠোর স্বরে বলিলেন—দেখ্‌ রোহিণী, দাসী তুই, দাসীর মতন থাক্‌। আমি তোর কাছে ভিক্ষে কর্‌তে আসিনি।

খুড়িমার ভৎ'সনায় রোহিণী অপ্রস্তুত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। কিন্তু গিন্নি তার সাহস বাড়াইয়া বিরক্তির স্বরে বলিলেন—তা রোহিণী এমন মন্দ কথা কি বলেছে? তুমি সেখানে গিয়ে বোনঝিকে আগলাওগে না।

খুড়িমা দৃপ্তভাবে বলিলেন—বিধবার সর্ব্বনাশ যারা করে তাদের মুখেই এমন বিদ্রূপ শোভা পায়। বড়ঠাকুর যদি আমার একবেলার হবিষ্যির একমুঠো ভাতেরও সংস্থান রাখ্‌তেন তবে এ বাড়ীতে আমার বাস যে একদণ্ডও উচিত নয় তা আর-কাউকে বোলে দিতে হত না। দিদি, শেষ কথা আমায় বোলে দাও, আমার বোন্‌ঝিকে একটু আশ্রয় দেবে কি না।

খুড়িমা উত্তরের প্রত্যাশায় গিন্নির মুখের দিকে দৃপ্ত ভাবে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁর সেই তীব্র জ্বালাময় দৃষ্টির সম্মুখে গিন্নির দৃষ্টি সঙ্কু হইয়া অবনত হইয়া পড়িল। তিনি নীরবে হাতের বালা খুঁটিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—বিপিন যদি ঘুণাক্ষরেও এই সংবাদ জানিতে পারে তাহা হইলে সে তাঁর উপর রাগ ত করিবেই, হয়ত বা কারো মতের অপেক্ষা না করিয়া মালতীকে আনিয়া উপস্থিত করিবে। অতএব মালতীকে আশ্রয় দিতে স্বীকার করাই ভালো। কিন্তু এত আপত্তির পর

কেমন করিয়া হঠাৎ স্বীকার করা যায়, তারই উপায় তখন ভাবিতে লাগিলেন।

উত্তর পাইতে বিলম্ব দেখিয়া খুড়িমা মনে করিলেন গিন্নির মত নাই। খুড়িমা ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইতেছেন দেখিয়া গিন্নি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—ছোট বৌ, তোমার দেখ্‌ছি একটুতেই রাগ হয়ে যায়। ওঁয়াকে একবার বলে দেখি, উনি কি বলেন······

খুড়িমা গিন্নির ধাত বুঝিতেন। তাঁকে একটু নরম হইতে দেখিয়া তিনিও নরম সুরে বলিলেন—দিদি, তুমিই ত কর্ত্তা। তুমি যা হুকুম করবে তাতে বড়ঠাকুর কখনো না বল্‌বেন না। তোমার দয়া হলেই সব হবে······

গিন্নি এই কথায় প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—তবু ওঁকে একবার বলা ত উচিত, হাজার হোক একজন কর্ত্তা যখন মাথার ওপরে বসে আছে······ বিকেলে যা হয় হবে!

—যা হয় না দিদি। মেয়েটাকে তোমার পায়ে আশ্রয় দিতেই হবে। পোড়াকপালী মেয়েটা একে সোমত্থ, তায় রূপের ডালি, তুমি আশ্রয় না দিলে তার জাত ধর্ম্ম থাকবে না। দিদি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি।—বলিয়া খুড়িমা গিন্নির পায়ে ধরিলেন।

গিন্নি একেবারে গলিয়া গিয়া বলিলেন—আঃ ও কি করিস্ ছোট বৌ, তোর বোনঝি আর আমার বোন্‌ঝি কি পৃথক। তোর কিছু ভাবতে হবে না, যা।

খুড়িমা অন্দরের দিকে ফিরিলেন। কারো মুখের দিকে চাহিতেও তাঁর অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইতেছিল, তাঁর মনে হইতেছিল সকলের দৃষ্টি যেন তাঁর উদ্‌ঘাটিত হীন দীনতাকে উপহাস করিতেছে। নিজের দৈন্যের লজ্জা তাঁর কাছে যত তীব্র হইতেছিল, তাঁর মন মালতীর প্রতি

ততই অপ্রসন্ন হইয়া উঠিতেছিল। সেই সর্ব্বনাশীর জন্যই যে তাঁকে এত লাঞ্ছনা, এত অপমান সহ্য করিতে হইল, এই ধারণা প্রবল হইয়া স্নেহকেও অতিক্রম করিয়া তাঁর মন অধিকার করিতে লাগিল।

৩

সন্ধ্যার সময় স্মৃতিরত্ন-মহাশয় লক্ষ্মীজনার্দ্দনের আরতি করিতে ও শীতল দিতে আসিয়াছেন। ঠাকুরঘরে ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া খুড়িমা ঠাকুরদর্শন করিতে আসিলেন। তাঁকে দেখিয়া ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন—রাণীমাকে বলেছিলে মা?

খুড়িমা বলিলেন—হাঁ বলেছি। তিনি ত রাজি হচ্ছিলেন না; অনেক কোরে বলাতে শেষে বল্‌লেন বড়ঠাকুরকে বোলে যা হয় কর্‌বেন।

—আমি হরিবিহারীকে বলেছি। সে খুব সহজেই রাজি হয়েছে। এতে কিন্তু আমার মনটা দমে গেছে—কোনো ভালো কাজে তার উৎসাহ ত কথনো দেখা যায় না। তোমার বোনঝি এ বাড়ীতে টিক্‌তে পার্‌বে কি না তাই ভাবছি।

খুড়িমা কাতর স্বরে বলিলেন—এ বাড়ীতে আমারও আর বেশী দিন টিক্‌তে হবে না ভট্‌চাযি্য-মশায়, তার পরিচয় আমিও যথেষ্ট পাচ্ছি।

ভট্টাচার্য্য আশ্বাস দিয়া বলিলেন—তা ভয় কি মা। আর দুমাস পরেই বিপিন বাড়ী ফির্‌বে, তখন তার ভয়ে তোমাদের আর কেউ কোনো অত্যাচার কর্‌তে পার্‌বে না।

খুড়িমা বলিলেন—তা বটে, কিন্তু গিন্নির মেজাজ ত বোঝবার জো নেই, কখন কিসে বিগড়ে যায়। একবার বেঁকে বস্‌লে তখন তাঁকে বোঝানো কারো সাধ্যে কুলোয় না।

এমন সময় বাহির হইতে গিন্নি ক্রোধকর্কশ স্বরে ডাকিলেন—ছোট বৌ!

খুড়িমার মুখ শুকাইয়া গেল, বুক কাঁপিতে লাগিল, গিন্নি যদি আড়ি পাতিয়া তাঁর কথা শুনিয়া থাকেন তবেই ত সর্ব্বনাশ! গৃহিণীর আহ্বান শুনিয়া খুড়িমা হরিরলুট মানসিক করিতে করিতে ঠাকুরঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন—কেন দিদি?

খুড়িমা দেখিলেন যে গিন্নি ঠাকুরঘরের দিকেই আসিতেছেন, সুতরাং তিনি তাঁর কথা শুনেন নাই; এতে খুড়িমা একদিকে আশ্বস্ত হইয়া নূতন অজ্ঞাত আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

গিন্নি ঠাকুরঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—বোনঝির কথা বাবুর কাছে যখন নিজেই বলানো হয়েছে, তখন ঢং কোরে আবার আমার কাছে বল্‌তে যাওয়া হয়েছিল কেন?…… …শুনেছ ত ছোটগিন্নি, বাবুর হুকুম হয়েছে! নিয়ে এস এইবার সুন্দরী বোনঝিকে, তোমার আর কোনো কষ্ট থাক্‌বে না।

এই কথার প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপটি খুড়িমার মর্ম্মে গিয়া বিঁধিল। তিনি ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—দিদি!

গিন্নি খুড়িমার তেজস্বী স্বভাব খুব ভালো করিয়াই চিনিতেন! খুড়িমার একটি কথায় সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদের উগ্রতা অনুভব করিয়া গিন্নি তাড়াতাড়ি সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

তখন খুড়িমা উচ্চকণ্ঠে গিন্নিকে শুনাইয়া বলিলেন—আমি এই ঠাকুর-ঘরে দাঁড়িয়ে বল্‌ছি, আমি যদি মালতিকে এবাড়ীতে আনি তবে……

ভট্টাচার্য্য তাড়াতাড়ি দরজার কাছে আসিয়া বলিলেন—ছি বৌমা, শপথ করতে নেই, থামো থামো, অনর্থক ক্রোধ কোরে একজন নিরাশ্রয়ার সর্ব্বনাশ কোরো না মা!

করুণা ও স্নেহের স্পর্শে খুড়িমার ক্রোধ চোখের জলে গলিয়া আমাদের তিনি সরোদনে বলিলেন—আমি তার ছন্দাংশে আর থাক্‌ব না ভট্‌চা। মশায়; পোড়াকপালীর অদৃষ্টে যা থাকে হবে। নারায়ণ! কতকাল আর আমায় এমন যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হবে।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—ছি মা, মৃত্যুকামনা করা ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধ আচরণ করা, মহা পাপ। নারায়ণে ভক্তি রেখো মা, সকল দিকেই কল্যাণ হবে। তুমি গিন্নির মন ত জানো, তিনি মাটির মানুষ, তাঁকে আর-একবার তুমি বল্‌লেই তাঁর রাগ জল হয়ে যাবে।

খুড়িমা চোখ মুছিয়া দৃপ্তকণ্ঠে বলিলেন—আমি মালতীকে আন্‌বার মধ্যে নেই ভট্‌চায্যি-মশায়। মুখে উচ্চারণ না করি, মনে-মনেও ত দিব্যি করেছি। তার কপালে যা আছে তাই হবে।

ভট্টাচার্য্য চক্ষু মুদ্রিত করিয় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—নারায়ণ!

খুড়িমা গলবস্ত্র হইয়া নারায়ণকে প্রণাম করিলেন। তারপর হৃদয়ের রুদ্ধ বেদনার উচ্ছ্বসিত অশ্রুজল মুক্ত করিয়া দিবার জন্য আপনার নিভৃত কক্ষটির উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটা অতিরঞ্জিত হইয়া গিন্নির নিকট নিবেদিত হইয়া গেল।

কলিকাতার দর্জিপাড়ায় হরিবিহারী-বাবুর একখানি বাড়ী আছে। সেই বাড়ীতে থাকিয়া তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিপিনবিহারী ও তাঁদের কুলপুরোহিত নন্দকিশোর স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের একমাত্র সন্তান নবকিশোর কলেজে পড়িত।

ভট্টাচার্য্য-মহাশয় নবকিশোরকে যখন নিজের টোলে সংস্কৃত না পড়াইয়া

এসে পড়িতে দিলেন, তখন তাঁর যজমান-মহলে বিষম আপত্তি ছোঁয়াছিল। কিন্তু বলিষ্ঠ-প্রকৃতির ভট্টাচার্য্য-মহাশয় যাহা উচিত মনে করিতেন তাই করিতেন, কারো ভয়ে বা খাতিরে আপনার মতের বিপরীত কার্য্য করিতেন না।

হরিবিহারী যখন তাঁকে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে ভট্টাচার্য্য-মহাশয় জমিদার-বাড়ীর ভাবী পুরোহিতকে ইংরেজী পড়াইতেছেন কেন, তখন ভট্টাচার্য্য হাসিয়া উত্তর করিয়াছিলেন—আজকালকার শাস্ত্রও অনেকটা ইংরেজী হইয়া উঠিতেছে, সুতরাং শিষ্য-যজমানের নিকট সম্মান পাইবার যোগ্য হইতে হইলে গুরু-পুরোহিতের সংস্কৃত ও ইংরেজী উভয় ভাষারই সকল শাস্ত্রে জ্ঞান থাকা দরকার।

হরিবিহারী কুণো প্রকৃতির লোক। তিনি ভট্টাচার্য্যের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত না হইয়া ঐখানেই নিবৃত্ত হইয়া গেলেন।

কিন্তু সেই গ্রামের মোড়ল নিবারণ মুখুয্যে ভট্টাচার্য্যের মতিচ্ছন্ন হইয়াছে দেখিয়া তাঁর সহিত তর্কযুদ্ধ জুড়িয়া দিল—নন্দকিশোর স্মৃতিরত্নের ছেলে—মুদি-মালার ছেলেরা যা শিখছে তাই শিখবে?

ভট্টাচার্য্য হাসিয়া বলিলেন—শিখ্‌বে নাই বা কেন? জ্ঞানেরও কি জাতিভেদ আছে নাকি?

নিবারণ সোজা হইয়া জোর দিয়া বলিল—তা আবার নেই? তুমি মোছলমানকে বেদ পড়াতে পারো?

ভট্টাচার্য্য তেমনি হাসিমুখে বলিলেন—কেন পারব না? খুব পারি। তেমন নিষ্ঠাবান্ ছাত্র যদি পাই আমার যত বিদ্যা আছে সব আমি পরম আনন্দে তাকে শেখাতে পারি।

নিবারণ একেবারে বজ্রাহত। সে আর কোনো যুক্তি খুঁজিয়া না পাইয়া ভট্টাচার্য্যকে ভয় দেখাইবার ভাবে বলিল—না না না, ও-সব

অনাচার ছেলেকে করিও না বল্‌ছি। মেলেচ্ছ পুরুত নিয়ে আমাদের চল্‌বে না! শেষে কি কুলপুরোহিত ত্যাগ কর্‌তে হবে নাকি?

ভট্টাচার্য্য তেমনি হাসিমুখেই বলিলেন—কিচ্ছু কর্‌তে হবে না দাদা! সব ঠিক মানিয়ে যাবে। ম্লেচ্ছের উচ্ছিষ্ট-ভোজী যজমান নিয়ে পুরোহিতের যখন চল্‌ছে, তখন কেবল মাত্র ম্লেচ্ছের ভাষা মুখে উচ্চারণ করার জন্তে পুরোহিতকে ত্যাগ কর্‌তে হবে না। সেটা তেমন অনাচার নয়।

ভট্টাচার্য্যের এই কথার মধ্যে একটু শ্লেষ-ইঙ্গিত ছিল। নিবারণ মুখুয্যে আবাল্য নানাবিধ অনাচার করিয়া যৌবনে কমিসেরিয়েট বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করে। লোকে বলে গোরাসৈনিকদিগের উচ্ছিষ্ট খানা নিবারণের রসনা পরিতৃপ্ত করিত। সেই অপবাদটা ঢাকিবার জন্য নিবারণ এখন গ্রামের হিন্দুয়ানি রক্ষার ভার নিজের হাতে গ্রহণ করিয়াছে। ভট্টাচার্য্য তার প্রকাশ্য হিন্দুয়ানির আড়ম্বরের আবরণ সত্ত্বেও নষ্ট লোকের রচা কথাটাকেই যখন ইঙ্গিতের খোঁচা দিয়া খুঁড়িয়া তুলিলেন, তখন নিবারণের মনের মধ্যে দ্বিতীয় রিপুটা খোঁচাখাওয়া ভিমরুলের মতন ভনভন করিয়া উঠিল। কিন্তু নিবারণ হুলটা যথাসাধ্য গোপন রাখিয়া হতাশানম্র করুণস্বরে বলিল—যা খুসী কর ভায়া! তোমরা হলে একে পণ্ডিত, তায় রাজপুরোহিত! তোমরা আমাদের মতন গরিব মুখ্‌খু-সুখ্‌খুর কথা শুন্‌বে কেন? কিন্তু দেখো ভায়া, গরিবের কথা বাসি হলে মিষ্টি লাগবে, তখন পস্তাতে হবে!······হরিহে মধুসূদন, তোমারই ইচ্ছা!

নিবারণ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল—কী! এত বড় আস্পর্দ্ধা! নিবারণ মুখুয্যের কথা অগ্রাহ্যি! এর শোধ আমি তুল্‌ব, তুল্‌ব, তুল্‌ব! না তুলি ত······

ইহার পর নবকিশোর নির্ব্বিবাদে গ্রামের স্কুল হইতে মাইনর পাশ করিয়া বৃত্তি পাইল। এখন সে কলিকাতায় পড়িতে যাইবে ঠিক হইয়াছে।

গ্রামে আবার একটা সোরগোল পড়িয়া গেল। মনুর পর এ পর্য্যন্ত কেহ কখনো কেবলমাত্র লেখাপড়া করিবার জন্য এ গ্রাম ছাড়িয়া বাহিরে পা দিয়াছে বলিয়া কিম্বদন্তী নাই, ইতিহাস ত এ বিষয়ে একেবারে নীরব। নবকিশোর এই সনাতন নিয়ম ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইয়া সকলকেই বিষম চিন্তিত করিয়া তুলিল। সকলেই ভাবিল কিশোর ছোঁড়াটা এইবার একেবারে ম্লেচ্ছ হইয়া ঘরে ফিরিবে। নবকিশোরের এমন যে নিষ্ঠা, বাছবিচার, ছোঁয়াছুঁয়ির এত পিটপিট, এসব বুঝি আর টিকিবে না! কেবল কিশোরের কিশোরবয়স্ক বন্ধুরা তাকে ভাগ্যবান্ মনে করিয়া ঈর্ষার চক্ষে দেখিতে লাগিল। সব চেয়ে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল বিপিন। সে জমিদারের ছেলে বলিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে তাকে বাহিরের সংশ্রব হইতে বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছিল; নবকিশোরই এই খাঁচার পাখীটিকে বাহিরের উদার বিপুল বিস্তারের মোহন সংবাদ মাঝে মাঝে আনিয়া দিত। সেই একমাত্র বন্ধুটির বিচ্ছেদ বিপিনের মনে বড় বাজিয়াছিল।

নবকিশোরও কলিকাতায় আসিয়া প্রথমটা একটু মুস্কিলে পড়িয়াছিল। সে দেখিল গ্রামে থাকিতে যে-সমস্ত আচার সে পালন করিত, কলিকাতায় তাহা রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন। মনুর আমলের নিয়মগুলি এই কলির শহরে পালন করা এককরম অসম্ভব; কলিকাতাটা যেন মনুর ব্যবস্থা পণ্ড করিবার জন্যই কোমর কষিয়া বসিয়া আছে। পদে পদে বাধা পাইয়া পাইয়া নবকিশোরের মন নিজের আচার-অনুষ্ঠানের দিকে সচেতন হইয়া উঠিতে লাগিল; সে ঠেকিয়া ঠেকিয়া বুঝিতে লাগিল যে, এমন না করিয়া অমন করিলেও জীবনযাত্রা বেশ স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে, এবং জগতের লক্ষ কোটি নরনারীর মধ্যে দুজনের আচার ব্যবহার ঠিক এক রকম হইতে দেখা যায় না। তার সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকেরা সকলেই অতি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু; কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় অধ্যাপকের আচারের সহিত হিন্দুস্থানী অধ্যাপকের

আচারের মিল নাই, আবার বাঙালী অধ্যাপকের আচার উঁহাদের দুইজনের আচার অনুষ্ঠান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। বিশেষ করিয়া তার একজন অধ্যাপক একেবারে দেবচরিত্রের লোক; কিন্তু তিনি একেবারে বিষম অনাচারী। এই সাধু চরিত্রের অধ্যাপকটির সস্নেহ মিষ্ট ব্যবহারে নবকিশোর তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ অনুগত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁর দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দেখিয়া শুনিয়া আচার পালন সম্বন্ধে তার একান্ত আগ্রহ ধীরে ধীরে শিথিল হইয়া পড়িতে লাগিল। কলিকাতায় থাকিয়া পড়া-শুনা করিতে করিতে ভিতরে ভিতরে তার যতই পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল ততই সে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে লাগিল যে আচারটা নিতান্তই বাহিরের জিনিস, প্রয়োজন অনুসারে তাহা কখনও পালন করিতে হয়, কখনও পরিবর্ত্তন করিতে হয়, কখনও বা একেবারে বর্জ্জন করা দর্‌কার হয়; যে লোক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন করিতে না পারে সেই ব্যক্তি আচারের ও সংস্কারের নাগপাশে জড়াইয়া গিয়া জড় বা পঙ্গু হইয়া পড়ে; গোঁড়ামি ও মূর্খতা প্রায় সমার্থক!

নবকিশোরের চরিত্রের মধ্যে একটা সতেজ বলিষ্ঠতা ছিল; তাহা তার প্রকাণ্ড সুগৌর শরীর, দীর্ঘোন্নত নাসিকা ও বড় বড় চোখ দুটি দেখিলেই বুঝা যাইত। তার মধ্যে জ্ঞানের স্বচ্ছতা, মনের তেজ, চরিত্রের দৃঢ়তা, নিষ্ঠার একাগ্রতা ও হৃদয়ের সরলতা সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছিল। তাহা তার বাক্যে ব্যবহারে সর্ব্বদাই প্রকাশ পাইত। ক্ষণে ক্ষণে উচ্ছ্বসিত উচ্চ খোলা হাসিতে তার নির্ম্মল মুক্ত প্রাণখানি সহজেই প্রকাশ হইয়া পড়িত। সে যাহা বলিত ও করিত তাহা সবিধানে বিচার করিয়া, এবং মধ্যপথে থামিতে সে জানিত না, সে মনের প্রবল বেগে ব্যাপারটার শেষে গিয়া তবে থামিতে পারিত। এজন্য তাকে হঠাৎ দেখিলে নিতান্ত একগুঁয়ে মনে হইত; সে মনের মধ্যে যুক্তিতর্ক

এমন জোরে বহাইয়া শীঘ্র উপসংহারের দিকে উপনীত হইতে পারিত যে লোকে মনে করিত সে কেবলমাত্র খামখেয়ালির উত্তেজনার বশেই কাজ করিয়া চলে। সুতরাং তার মতন বলিষ্ঠ চরিত্রের লোক যখন যাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করে তখন তার সম্বন্ধে কোনোই দ্বিধা রাখে না।

এরকম প্রকৃতির লোককে সকলে সম্ভ্রম দেখায়, খাতির করে, এমন কি মনে মনে একটু ভয়ও করে, কিন্তু তার সঙ্গ লোভনীয় মনে করে না। সুতরাং কলিকাতায় তার কেহ বন্ধু বা সঙ্গী ছিল না। সে মোটা থান পরে, মোটা থানের চাদর গায়ে দেয়, চটি পরে; সুতরাং সে কলিকাতার বাবুর দলে মিশ খাইত না। আবার বাহিরের সাদৃশ্যে যাদের সহিত মিলিতে পারিত সেই সব সংস্কৃত কলেজের ভট্টাচার্য্য-ধরণের ছাত্ররা তার মতের সৃষ্টিনাশা উগ্রতা দেখিয়া তার কাছে ভিড়িত না।

নবকিশোর যখন ত্রিশঙ্কুর মতন মধ্যপথে স্থগিত নিরবলম্ব, তখন তাকে বাবু ও ভট্টাচার্য্য দলের মধ্যবর্ত্তী একজন আসিয়া গেরেপ্তার করিল। সে তারক, নবকিশোরেরই সহপাঠী। তার চেহারাটি ভয়ানক শীর্ণ, কঙ্কালের উপর শুধু যেন একখানি পাত্‌লা নরম চাম্‌ড়া জড়ানো আছে; তার কোটরপ্রবিষ্ট বড় বড় গোল গোল চোখদুটি অর্থহীন হাসিতে উজ্জ্বল; বড় বড় দাঁতগুলি সদাবিকশিত; তার গাল-দুটি তোব্‌ড়ানো বলিয়া হনু ও চোয়ালের হাড় অত্যন্ত উঁচু ও চওড়া দেখায়; তার পরণে থান, গায়ে চায়না কোট—গ্রীষ্মে লংক্লথের, শীতে আল্‌পাকার—তার উপর কোঁচান চাদর দড়ির মতন পাকাইয়া গলায় মালার মতন করিয়া বাঁধা থাকে, পায়ে পেনেলার জুতো, মাথার সাম্‌নে টেড়ি, পিছনে টিকি, গলায় তুলসী-কাঠের মালা জামার তলে প্রায়

ঢাকা, তার গ্রন্থিল তর্জ্জনীতে অষ্টধাতুর তারের পুঁঠে-দেওয়া একটি আংটি ঢল্‌ঢল্‌ করিতেছে। তারক বাহু আকারে যেমন দুই প্রাচীন ও নব্য দলের সমন্বয় করিয়াছিল, ভিতরেও সে তেমনি—বচনে ভয়ানক সনাতন-ভক্ত, শাস্ত্র ও ঋষি ছাড়া মুখে অন্য কথা নাই, কিন্তু সুবিধা-মত প্রাচীন ও নবীন বিধি নির্ব্বিচারে পালন করিত। সে নবকিশোরকে বেশে একেবারে প্রাচীন ও মতে অতীব নবীন পথ অবলম্বন করিয়া চলিতে দেখিয়া ভাবিল নবকিশোরও হয় ত তারই সমান দুই দিক বজায় রাখিয়া চলিবার মতন বুদ্ধিমান্‌! কিন্তু সে নবকিশোরকে নিজের দলে টানিতে আসিয়া দেখিল যে নবকিশোর একটি আস্ত গোঁয়ার, তার মধ্যে মানাইয়া রফা করিয়া চলিবার ভাব এতটুকু নাই। তারকের কাছে নবকিশোর যতই দুর্ব্বোধ হেঁয়ালি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, সে ততই নবকিশোরের সঙ্গ চাপিয়া ধরিতে লাগিল, নবকিশোরকে তার বুঝিতেই হইবে। সে এলোমেলো তর্ক করিয়া নবকিশোরকে রাগাইয়া তুলিত এবং নবকিশোর তার মুখের উপর তাকে মূর্খ বলিয়া গালি দিলে মুখে সে খুব ঘটা করিয়া আপনার বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ দিবার চেষ্টা করিত বটে, কিন্তু নবকিশোরের স্বচ্ছ তর্কযুক্তির নিকটে পদে পদে পরাস্ত হইয়া মনে মনে তাকে শ্রদ্ধা ও প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিত না।

তারককে অপদার্থ জানিয়াও সঙ্গীহীন নবকিশোর তার এই অনুরক্ত অধ্যবসায়শীল উপদ্রবটিকে প্রশ্রয় দিত এবং সহ্যও করিত। তার বুদ্ধিবিচারহীন তুমুল তর্কের জন্য নবকিশোর তার নাম রাখিল তাড়কা রাক্ষসী! এবং তারকের এই নাম তার দুর্ভাগ্যক্রমে তার পরিচিত-মহলে এমন রটিয়া গেল যে তার পিতৃমাতৃদত্ত নামের বদলে নবকিশোরের দেওয়া নামটিই বাহাল হইয়া গেল।

নবকিশোর যখন সংস্কৃত কলেজ হইতে এম-এ ও বেদান্তের উপাধি লইয়া বাহির হইল তখন সে শুদ্ধিতত্ত্ব ও সংহিতার অনুশাসন নির্ব্বিচারে স্বীকার করিবার অবস্থা একেবারে কাটাইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তখনো তারক তাকে হিন্দুশাস্ত্রে ও ঋষিবাক্যে আস্থাবান্ করিবার আশা একেবারে ত্যাগ করে নাই। সে ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের সন্তানকে ম্লেচ্ছ-ভাবাপন্ন দেখিয়া মর্ম্মাহত হইত; কিন্তু মনে করিত যে-ফলটা পচে তার খোসাতেই আগে পচন ধরে, নবকিশোর পোষাকে পরিচ্ছদে যখন এমন সনাতনী ধারা ধরিয়া রাখিয়াছে, তখন তার অন্তরটা এখনও একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই। এইজন্য ব্যথিত ও আশান্বিত হইয়া তারক এক-একদিন তর্কের মধ্যে তার কপালের শিরা ও কোটরগত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া নবকিশোরকে খৃষ্টান ব্রাহ্ম বলিয়া গালি দিত। নবকিশোর তাতে একটুও রাগ না করিয়া হাসিয়া বলিত—ও ত ঠিক গাল হল না! দেশে দেশে কালে কালে যে-সব মহাপুরুষেরা আবির্ভূত হয়ে সমাজে তাঁদের মত প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, তাঁরা ত শুধু সেই সেই দেশের বা কালের মধ্যেই আবদ্ধ নন; তাঁদের বাণীর যতটুকু সেই দেশের ও সেই কালের সঙ্গে জড়িত ততটুকু ছাড়া তাঁদের সত্য বাণী শাশ্বত, তা বিশ্বমানবের সম্পত্তি, তাঁরা সব জগৎগুরু। এই হিসেবে ঈশা মহম্মদ যেমন আমাদের পূজনীয়, বুদ্ধ নানক কবীর চৈতন্য তেমনি আবার খৃষ্টান মুসলমানেরাও পূজার্হ। এঁরা প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় যে মহাসত্য প্রচার করেছেন, তার মূল প্রস্রবণ এক; উপনিষদ ও বাইবেল, কোরান ও ভাগবত একই উৎসের বিভিন্ন ধারা। বিশেষ বিশেষ দেশে আবির্ভূত বোলে- সেগুলি বিভিন্ন ধরণের ক্রিয়াকাণ্ডের আড়ম্বর ও সংস্কারগত সঙ্কীর্ণ আচারের বাহ্যিক আবরণে আচ্ছন্ন; এইজন্য বুদ্ধিমান সচেতন মনের যে ধর্ম্ম তা সকল সামাজিক ধর্ম্ম হতে স্বতন্ত্র, সে সকল

ধর্ম্মের অন্তরের জিনিস, তাকে কোনো নামের গণ্ডি টেনে সঙ্কীর্ণ করা চলে না। আমার ধর্ম্মমতকে যদি কোনো নাম দিতে চাও ত হিন্দু নামই দিও, যেহেতু আমি হিন্দুস্থানের বিশেষ অবস্থার মধ্যে জন্ম ও শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেছি।

নবকিশোরের এই কথায় তারক একেবারে ক্ষেপিয়া গিয়া বিষম তর্ক জুড়িয়া দিত। বেগতিক দেখিলে বিপিন মধ্যস্থ হইয়া উভয়কে নিরস্ত করিত।

বিপিন বড় শান্তপ্রকৃতির চুপচাপ ধরণের লোক। সে অপরিচিত লোকের সহিত কথা বলিতে লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়, একলা কোথাও যাইতে পারে না, নিজের চেষ্টায় সে একটা কাজ করিতে পারে না। এইজন্ত নবকিশোর নহিলে তার একদণ্ড চলে না। নবকিশোর তার বন্ধু ও অভিভাবক দুই-ই।

বিপিন এরূপ পরনির্ভর মুখচোরা হইয়াছিল অবস্থার ফেরে। সে জমিদারের ছেলে; ছেলেবেলা হইতেই সে নিষেধের জালে জড়িত হইয়া কেবল শুনিয়াছিল সকলের সহিত তার মিশিতে নাই, কথা কহিতে নাই, যথায় তথায় যাওয়া তার উচিত নয়; কেমন করিয়া পদে পদে জমিদারী কায়দা বজায় রাখিয়া মর্য্যাদা বাঁচাইয়া চলিতে হইবে তার জন্ত তাকে তার অপেক্ষা সতর্ক ও বুদ্ধিমান্ লোকদের মতের ও ইঙ্গিতের উপর সর্ব্বদাই নির্ভর করিয়া থাকিতে হইত, তার নিজের ইচ্ছা পদে পদে পরাভূত হইতে থাকিত। রাজপুরোহিতবংশের অকার্য্য হইলেও নবকিশোর স্কুলে পড়িতে পাইয়াছিল, কিন্তু বিপিনের সে সৌভাগ্যও হয় নাই। চৌধুরীগোষ্ঠীর আবহমান ইতিহাসের বিশ্বাস যে কালির আঁচড় কাটিলে ধার কর্জ্জ হায়। লেখাপড়া শেখার শ্রম স্বীকার করুক তারা যাদের খাটিয়া খাইতে হইবে। পায়ের উপর পা দিয়া মা-লক্ষ্মীর পেঁচার ডানার তলে যারা আরামে

থাকিবার দিব্য সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে তাদের লেখাপড়া শেখা শুধু পণ্ডশ্রম। প্রচুর আহার-নিদ্রার পরও যদি সময় না কাটে তবে বড়মানুষের ছেলের আমোদ-আহ্লাদের উপকরণের অভাব ত হইবার কথা নয়।

কিন্তু বিপিনের একমাত্র বন্ধু নবকিশোর যখন স্কুলে ভর্ত্তি হইল তখন বিপিনও মায়ের কাছে স্কুল যাইবার বাহানা ধরিল। বিপিনের এ অন্যায় আবদার কিন্তু রক্ষিত হইল না; সে তারই প্রজাদের সঙ্গে একসঙ্গে বসিয়া সকলের সমানি হইয়া পড়িবে? এ হইতেই পারে না; তাহা হইলে প্রজারা পরে তাকে মানিবে না যে! বিপিনের আবদারের রফা হইল—তাকে গৃহেই পড়াইবার ব্যবস্থা করা হইবে। চৌধুরীবংশের মর্য্যাদা বড়, না, ছেলের আবদার বড়।

বিপিনের চতুর্দ্দিকে নিষেধের প্রাচীর তুলিয়া তার দৃষ্টি একেবারে রোধ করিবার আয়োজনে তার অভিভাবকদের কিছুমাত্র শৈথিল্য ছিল না। বাহিরের খবর দিয়া মধ্যে মধ্যে যা গোল ঘটাইত নবকিশোর। এইজন্য এই খাঁচার পাখী ও বনের পাখীর মধ্যে একটি বড় ঘনিষ্ঠ যোগ জন্মিয়াছিল। নিরেট নিষেধের প্রাচীরের ছোট ছোট ঘুলঘুলি দিয়া বিপিনের মনের উপর যেটুকু বাহিরের আলো আসিয়া পড়িতেছিল তারই সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সে আপনার সমস্ত বুদ্ধিটিকে মেলিয়া ধরিতেছিল; এতে তার মন সচেতন হইয়া তার আশেপাশের তুচ্ছতম ঘটনাও ত্যাগ করিত না। তাতে তামসিক পরিবারের মধ্যে থাকিয়া সে এমন সব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে লাগিল যাহা তার বয়সে তার জানা উচিত ছিল না। অথচ তার শান্ত প্রকৃতি ও নবকিশোরের স্বচ্ছ দৃপ্ত চরিত্র তাকে এজন্য সঙ্কুচিত করিয়াই তুলিত।

এইরূপ বিরুদ্ধ ভাবের মধ্যে বড়মানুষের আদুরে ছেলে বিপিন বর্দ্ধিত হইয়া বড়ই ভাবপ্রবণ ও আবেগময় হইয়াছিল। প্রতি পদে পরের খেয়াল-মত চলিতে চলিতে এবং কথায় কথায় রফা মানিতে মানিতে তার মন পরের উপর এমন নির্ভরশীল হইয়া উঠিয়াছিল যে সে নিজের চেষ্টায় কোনো কাজই করিতে পারিত না ; কিন্তু কোনো গতিকে তার ইচ্ছাশক্তি একবার উত্তেজিত হইয়া উঠিলে তাকে রোধ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। নবকিশোর ছিল তার ইচ্ছাশক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া দিবার পাণ্ডা।

বিপিন প্রাইভেটে এণ্ট্রান্স পাশ করিতেই নবকিশোর বিপিনকে কলিকাতায় যাইয়া পড়িবার পরামর্শ দিতে লাগিল। বিপিনের পিতার অনেক আপত্তি ও তার মাতার অজস্র অশ্রু অগ্রাহ্য করিয়া বিপিন গোঁ ধরিয়া রহিল সে কলিকাতায় পড়িতে যাইবেই।

বিপিনের পিতা হরিবিহারী হাল্কা ছিপ্ছিপে ছোটখাটো গৌরবর্ণ লোকটি ; আপনার খেয়াল-মত নেশা ভাঙ করিয়া চোখ বুজিয়া ঝিমাইতে ভালোবাসিতেন, কোনো ঝঞ্চাটে থাকিতে চাহিতেন না। জমিদারী দেখিত দেওয়ানজী, সংসার দেখিতেন গিন্নি, আর তাঁকে দেখিত তাঁর খানসামা রামধন, আর তিনি ছিলেন নিশ্চিন্ত নিঝঞ্চাট। সুতরাং বিপিনকে দু-চার-বার বারণ করিয়া শেষে "তোমাদের যা খুসী কর" বলিয়া তিনি একেবারে সরিয়া গেলেন।

কিন্তু গিন্নির অশ্রু কিছুতেই বারণ মানিতেছিল না। বিপিনের মা যেদিন মারা যান সেদিন যে তিনি বিপিনকে তাঁরই হাতে হাতে সঁপিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। বিপিনকে কোলে পাইয়াই প্রথম তিনি মা হইয়াছিলেন। আজ এই আঠারো বৎসর যাকে কোল-ছাড়া করেন নাই আজ তাকে একাকী বিদেশে পাঠাইতে তাঁর মন

ভাঙিয়া পড়িতেছিল। বিপিনেরও মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইতেছিল, কিন্তু বন্দীদশা হইতে মুক্তি পাইবার আনন্দ সেই বেদনাকে প্রবল হইয়া উঠিতে দিতেছিল না।

বিপিন কলিকাতায় আসিয়া বাহিরের সহিত প্রথম পরিচয়ে বাহিরকে লজ্জিতা নববধূর মতন ভালোবাসিল; কিন্তু সঙ্কোচে সে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে বাহিরকে দান করিতে পারিল না। ইহা তার পক্ষে কল্যাণের কারণই হইল!

বিপিনকে কলিকাতায় পাইয়া নবকিশোরও বাঁচিয়া গেল। সে তারকের সঙ্গে অবিশ্রাম তর্ক করিতে করিতে যখন হাঁপাইয়া উঠিত, তখন সে বিপিনের শান্ত স্নিগ্ধ আলাপে তৃপ্তি খুঁজিত। বিপিন নবকিশোরের ন্যায় তার্কিক নয়। সে চিরকাল পরের মতেই মত দিয়া অভ্যস্ত; তার একমাত্র বন্ধু নবকিশোরের মত মানিয়া লওয়া সুতরাং তার পক্ষে বিশেষ কঠিন বোধ হইত না। তবু যে সে মধ্যে মধ্যে এক-আধবার প্রতিবাদ করিত তাহা তার আবাল্যের সংস্কার হইতে নবকিশোরের মত এখন একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া; কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার মত ও সংস্কার তার আবাল্যের পরিবেশ ছাড়াইয়া একেবারে নূতন পথে ছুটিয়াই চলিতেছিল। দুই বন্ধুতে নূতন মতের তর্কের চকমকি ঠুকিয়া মাঝে মাঝে আপনাদের চারিদিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিয়া খেলা করিত; তাতে যে নিজেরই ঘরে আগুন লাগিতে পারে এমন আশঙ্কা কখনো কখনো তাদের মনে হইলেও ঘরের আগুনে পথ আলো করিবার মোহ তাদের খেপাইয়া তুলিত; তাদের ভাবপ্রবণ তরুণ হৃদয় আগুনের ফুল্‌কির মতনই স্বাধীন আনন্দের উজ্জ্বলতায় ক্ষণে ক্ষণে আপনাদিগকে চারিদিকে বিকীর্ণ করিতে থাকিত।

মথুরাপুরের চৌধুরী-পরিবারে যখন বিপিনের খুড়িমার বোনঝি মালতীকে আশ্রয় দিবার ব্যাপার লইয়া গণ্ডগোল বাধিয়াছিল তখন নবকিশোর ও বিপিন দুই বন্ধু কলিকাতার বাসায় পরম নিশ্চিন্ত মনে রাস্তার ধূলা ও বাতাসের ধোঁয়া হইতে আরম্ভ করিয়া পুনর্জন্ম ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লইয়া পরম উৎসাহে আলোচনা করিতেছিল। এবং তাদের পরম অবজ্ঞাভাজন চিরসহিষ্ণু নিত্যসহচর তারক তার মত কেহ গ্রাহ্য করুক আর না করুক সে বিষয়ে একেবারে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া উভয় বন্ধুর তর্কের মাঝখানে পড়িয়া বাধা দিতে কিছুমাত্র অবহেলা করিতেছিল না।

প্রাতঃকাল। শরতের সোনালি রৌদ্র খোলা জান্‌লা দিয়া ঘরের ফরাশে আসিয়া পড়িয়াছে; ঘরের যেখানে-যেখানে দেয়াল, ফরাশের উপর সেখানে-সেখানে ছায়া; আর জান্‌লার ফাঁকে-ফাঁকে সোনালি রৌদ্র, রৌদ্রের বুকে আবার গরাদের ছায়ার ডোরাকাটা; যেন একখানি রৌদ্রছায়ার ডোরাকাটা শতরঞ্চ বিছানো রহিয়াছে। জান্‌লার নীচেই একটি শিউলি-গাছের তলায় ঝরাফুলে শারদলক্ষ্মীর শয্যা পাতা হইয়াছে; শিউলি-ফুলের মধু-পরিমল স্নিগ্ধ বাতাসে স্পর্শ বুলাইতেছে। ভিখারী করতাল বাজাইয়া মোটা ভাঙা গলায় গৃহস্থের দ্বারে-দ্বারে আগমনী গান শুনাইয়া বেড়াইতেছে, এবং ভিক্ষা পাইলেই সমের অপেক্ষা না করিয়াই যেখানে-সেখানে হঠাত গান থামাইয়া অন্যত্র ভিক্ষার অন্বেষণে চলিয়া যাইতেছে। রাস্তায় ফেরিওয়ালারা বিচিত্র স্বরভঙ্গী করিয়া নিজ নিজ পণ্য হাঁকিয়া ফিরিতেছে।

বিপিন একখানি ইজি চেয়ারে হেলান দিয়া প্রসারিত পা চটিজুতার উপর গোড়ালির ভরে খাড়া রাখিয়া শেক্সপীয়রের মার্চাণ্ট অফ ভিনিস

পড়িতেছিল; অগ্রহায়ণ মাসে তার এম-এ পরীক্ষা। নবকিশোর পাশের ফরাশের উপর তাকিয়ায় ঠেস দিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিল। অনেকক্ষণ পাঠ্য পুস্তকের টীকা-ভাষ্যে খুঁটিনাটি পড়িতে পড়িতে বিপিনের বিরক্তি বোধ হইতেছিল। সে বলিল—ওহে কিশোর, কাগজখানা দাও ত, একবার দুনিয়ার খবরটায় চোখ বুলিয়ে নি।

নবকিশোর তার দিকে বক্রদৃষ্টি হানিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল—না না, এখন পোর্শিয়ার খবরদারী কর; খেয়ে-দেয়ে দুনিয়ার খবরদারী কোরো 'খন।

বিপিন বন্ধুকে চিনিত। তার বন্ধু ত শুধু নর্ম্মসহচর নয়, সে যে আবার অভিভাবকের মতন গম্ভীর হইয়া চোখও রাঙায়। নবকিশোরকে গম্ভীর হইয়া কথা কহিতে দেখিয়া বিপিন আর কাগজ চাহিতে পারিল না; অথচ পাঠ্য পুস্তক পড়িতে আর কিছুতেই ভালো লাগিতেছিল না; তাই সে হাসিয়া নবকিশোরের কথার উত্তরে বলিল—পোর্শিয়ার খবরদারী কাউকে করতে হয় না, সে-ই কত লোকের খবরদারী করে বেড়াচ্ছে! এইজন্যে ত পোর্শিয়া-চরিত্র আমার তত ভালো লাগে না।

আর যায় কোথায়! তর্কের গন্ধ পাইয়া নবকিশোর সোজা হইয়া বসিয়া বলিল—কেন?

—ওকে আমার কেমন মদ্দা-মদ্দা ঠেকে। নারীত্ব যেন ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

—কি হলে ভালো হত? নোলক-পরা, প্যানপেনে ঘ্যানঘেনে বাঙালীর ঘরের খুকী বৌটির মতন? স্বামীর বন্ধুর বিপদে উদাসীন, বড় জোর কেঁদে-কেটে হাট বাধানোতে তার ক্ষমতা আর সহৃদয়তার চূড়ান্ত পরিচয়! কেমন?

বিপিন হাসিয়া বলিল—তা বোলে কি গৃহলক্ষ্মী কোমর বেঁধে মকদ্দমা করতে যাবে ?

নবকিশোর জোর দিয়া বলিল—দর্‌কার হলে যেতে হবে বৈ কি। ঝান্সীর রাণী, রাণী দুর্গাবতী, জোয়ান অফ আর্ক প্রভৃতি রমণীরা যুদ্ধ করেছিলেন বোলে কি আমরা তাঁদের বেশীরকম শ্রদ্ধা করি না ? কেন ? না, এঁরা নিজের হাতে নিজেদের দুঃখের প্রতিকারের চেষ্টা করেছিলেন। আর তার উল্টো দিকে আমাদের খুড়িমার ব্যাপারটা দেখ দেখি,—ফাঁকি দিয়ে সর্ব্বস্বান্ত যারা কর্‌লে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কিছু প্রতিকার কর্‌তে পারা দূরে থাকুক, একটু আশ্রয় আর এক মুঠো অন্নের জন্য উল্‌টে তাদেরই কাছে ভিক্ষার অপমান স্বীকার কর্‌তে হল! এর চেয়ে অক্ষমতার লজ্জা আর কি হ্‌তে পারে ? সমস্ত দেশটা ক্লীব হয়ে উঠেছে, তাই অপমান সহ্য করাকে মনে করে ক্ষমা ; নারীদের দুর্গতিকে মনে করে গৃহলক্ষ্মীর আদর্শ! ধিক্ থাক এমন নির্জীব মনের পুঁথিপড়া বড় বড় অর্থহীন কথায় !

নবকিশোরের বজ্রকণ্ঠের নির্ঘোষে ঘর গমগম করিতে লাগিল। বিপিন পিতার অন্যায় আচরণের প্রসঙ্গে লজ্জিত হইয়া নিরুত্তর হইয়া গিয়াছিল। নবকিশোর উত্তেজনার ঝোঁকে একাকীই অনর্গল বক্তৃতা চালাইতে পারিত, কিন্তু দরোয়ান দুইখানি চিঠি আনিয়া বাধা জন্মাইল। বিপিন মুক্তির আনন্দ অনুভব করিল।

একখানি চিঠি বিপিনের, অপরখানি নবকিশোরের ; উভয়ের পিতা লিখিয়াছেন।

পত্র পড়া শেষ করিয়া নবকিশোর বিপিনের গায়ে পত্রখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল—এই দেখ আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের দুর্দ্দশা ?

বিপিন সেই পত্র পড়িয়া দেখিল স্মৃতিরত্ন মহাশয় নবকিশোরকে মালতীর অবস্থা ও আশ্রয় প্রার্থনার ব্যাপার আগাগোড়া খুলিয়া লিখিয়াছেন। বিপিন এক দিকে মাতার আচরণে যেমন অত্যন্ত লজ্জিত ও ক্ষুণ্ণ হইল, অন্য দিকে তেমনি নির্যাতিতা খুড়িমা ও তাঁর নিরাশ্রয়া বোনঝি মালতীর প্রতি সহানুভূতিতে তার মন ভরিয়া উঠিল। বিপিন পিতা ও মাতার সমস্ত অন্যায় আচরণের কৈফিয়ৎস্বরূপ কুণ্ঠিত স্বরে বলিল—খুড়িমার বোনঝিকে তোমার সঙ্গে মথুরাপুরে পাঠিয়ে দেবার জন্যে বাবা আমায় এই চিঠি লিখেছেন।

নবকিশোর এ কথায় কান না দিয়া অনর্গল বকিয়া যাইতেছিল—দেখেছ, দেখেছ, আমাদের কাণ্ডখানা দেখেছ! আমরা আর্য্য বোলে বড়াই করি, কিন্তু কার্য্য করি কশাইয়ের! এই যে মালতী আজ পরের বাড়ী দাসী হতে চলেছে, এর চেয়ে কি তার বিয়ে হওয়া ভালো নয়? তুমি আবার বলো কিনা বিধবা-বিবাহ গর্হিত।

নবকিশোরের চক্ষুদুটি আবেগে বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিপিন তার উত্তেজনার সম্মুখে সঙ্কুচিত হইয়া মৃদুস্বরে বলিল—গর্হিত ঠিক বলিনে; আমি বলি, বিধবার স্বামীস্মৃতিকে সাম্‌নে রেখে ব্রহ্মচর্য্য পালনই শ্রেষ্ঠ আদর্শ।

—মানি বিধবার সেই শ্রেষ্ঠ আদর্শ, বিপত্নীকেরও আদর্শ সেই রকমই! কিন্তু যে কাজে অন্তর থেকে কোনো প্রেরণা আসে না, শুধু বাইরের চাপে কর্‌তে হয়, তেমন ধর্ম্মসাধনও যে ব্যর্থ! আমরা সচেতন ভাবে কি কিছু কর্‌তে জানি? ধর্ম্মবিধি, সমাজবিধি, সবই অন্ধের মতন অভ্যাসের বশে শুধু পালন কোরে চলেছি, কারণ বাপ-পিতামহের আমল থেকে এমনি ধরা চলে আস্‌ছে। আরে, একবার ছাই ভেবেই দেখ, কেন তাঁরা অমন না কোরে এমন কর্‌তেন? ভগবান আমাদের মাথার মধ্যে মগজ বোলে

এতখানি পদার্থ যে পূরে দিয়েছেন, তা কি শুধু গাধার বোঝা বইতে, কাজে খাটাবার জন্যে একটুও নয়?

বিপিন বলিল—তুমি কি মনে করো সমাজের সকল লোকই চিন্তা কোরে কাজ করতে পারে? যার বুদ্ধি শিক্ষার দ্বারা মার্জ্জিত হয়নি, তার যে নিজের বুদ্ধিতে চল্‌তে গেলে পদে-পদে ভুল হবে।

—আরে ভুলই করুক! ভুল না কর্‌লে সত্যের পরিচয় পাবে কেমন কোরে। অতিবিজ্ঞ সাবধানী জাত আমরা ভুলও করিনে, সত্যেরও সন্ধান পাইনে!

বিপিন জিজ্ঞাসা করিল—এসব সংশোধন কর্‌বে এমন শক্তিশালী কে?

—তুমি, আমি, আর যাদের মধ্যে এই অভাব-বোধ জেগেছে তারা! এইজন্যেই ত জ্ঞানের আলোক বিস্তার করা প্রয়োজন, সকলকে শিক্ষা দেওয়া দর্‌কার।

—কিন্তু স্ত্রী-পুরুষের শিক্ষা কি এক হওয়া উচিত?

—খানিকটা এক হওয়া উচিত বৈ কি! নইলে হয় কি জানো? বৃদ্ধ বিপত্নীক হলেই তাড়াতাড়ি আর-একটি বিয়ে করেন, কারণ তিনি রেঁধে খেতে বা ঘরকন্নার কাজ কর্‌তে জানে না; আবার বালিকা বিধবা হলে তাকে পরের বাড়ীতে দাসীবৃত্তি অবলম্বন কর্‌তে হয়, সে যে স্বতন্ত্র হয়ে নিজেকে সাম্‌লাতে কখনো শেখেনি। ধরো যেমন মালতী। তার বহিঃসংসার দেখ্‌বার মতন কোনো পুরুষ অভিবাবক নেই, সে অন্তঃপুরের শিক্ষা নিয়ে করবে কি? তার বর্ত্তমান অবস্থায় তাকে হয় বাইরের সংঘাতের সঙ্গে লড়াই কর্‌বার উপযুক্ত শিক্ষা পেতে হবে, নয় অপরের অন্তঃপুরে আশ্রয় নিতে হবে। অন্তঃপুরে আশ্রয় মিল্‌তে পারে দু-রকমে—এক বাড়ীর বৌ হয়ে, নয় অপর বাড়ীর দাসী হয়ে। দাসী হওয়ার চেয়ে বৌ হওয়া ঢের সম্মানের, নিশ্চয় স্বীকার কর্‌তে

হবে ! এককালে ছিল যখন বিধবা পিসি বোন, ভাই ভাইপোর বাড়ীতে থাক্‌তেন সকলকার ওপর কর্ত্রী হয়ে; কিন্তু এখন আর সেদিন নেই, সমাজের অবস্থা বদ্‌লে গেছে; তাই এখন বিধবাদের হয় স্বতন্ত্র হয়ে আপন মর্য্যাদা বজায় রাখ্‌তে হবে, নয় পরের গলগ্রহ হয়ে দাসীপনা কর্‌তে হবে। তা হলে দেখা যাচ্ছে, হয় বিধবার বিয়ে হওয়া উচিত, নয় মেয়েদেরও শিক্ষায় সাহসে পুরুষের সমকক্ষ হওয়া উচিত। বিশেষ ত যাদের মালতীর মতন পরাধীনের অধীন হতে হয়।

বিপিন জোর দিয়া বলিয়া উঠিল—তুমি ত জানো কিশোর, খুড়িমার মন থেকে সমস্ত গ্লানি মুছে দেবার জন্যে আমি তাঁকে কত ভক্তি করি, যত্ন করি। মালতীও যাতে নিজেকে পরের গলগ্রহ বোলে না মনে করে তা আমি কর্‌ব। মালতীর কাছে তুমি কখন্‌ যাবে ?

নবকিশোর বলিল—বিকেল বেলা যাওয়া যাবে এখন।

—খুড়িমা মালতীকে কিছু লেখেন নি, হঠাৎ তুমি তাকে আন্‌তে গেলে সে অবিশ্বাস কর্‌তে পারে। চিঠি দুখানাই সঙ্গে নিয়ে যেয়ো, যদি দর্‌কার বোঝো পড়্‌তে দিয়ো ; দুখানা চিঠি পড়্‌লে আর কিছু সন্দেহ থাক্‌বে না !

—তাই হবে। এখন নেয়ে খেয়ে নেবে চল। সকাল বেলাটা ত তর্কে কাট্‌ল। দুপুর বেলাটা পড়্‌তে হবে তোমায়। মালতীর বাড়ী থেকে ফির্‌তে ত আমাদের রাত হবে।

বিপিন ব্যস্ত হইয়া বলিল—না না, আমি সেখানে যেতে পার্‌ব না, তুমিই একলা যেয়ো। অচেনা মেয়ে-লোকের সাম্‌নে……

নবকিশোর হা হা করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল—চিরকালই কি তুমি এম্‌নি মুখচোরা থাক্‌বে ? যে অচেনা মেয়েটি তোমার বৌ হয়ে আস্‌বে তার কাছেও মুখ দেখাতে লজ্জা কর্‌বে নাকি ?

বিপিন লজ্জিত হইয়া বলিল—না না, আমি যেতে পার্‌ব না, তুমি একলাই যেয়ো।

৬

মালতীর বাপের বাড়ী ছিল কলিকাতার সন্নিকট বেহালা গ্রামে। বিবাহের একমাস পরেই মালতী যখন বিধবা হইল, তখন তার শ্বশুর শাশুড়ী এই বিষকন্যা সর্ব্বনাশী চক্ষুশূল বৌকে বাড়ী হইতে দূর না করিয়া জলগ্রহণ করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল। মাস না ফিরিতে যে রাক্ষসী তাদের অসুরের মতন বলবান সুস্থ ছেলেকে খাইয়া ফেলিল, সেই অপয়া মেয়েকে বাড়ীতে ঠাঁই দিয়া কি শেষে নূতন আর-কিছু বিপদ ঘটিবে! মালতীর বয়স তখন সবে পনেরো বৎসর। সে শাশুড়ীর পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল—"মা, আমি তোমার দাসী হয়ে থাক্‌ব, আমায় পায়ে ঠেলো না!" কিন্তু শাশুড়ীর মন কিছুতেই নরম হইল না, তাঁর শোকার্ত্ত চিত্ত হতভাগিনী বধূর মিনতি ডাইনীর মায়াকান্না বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দিল। তখন অগত্যা বাপের বাড়ীতেই আশ্রয় লওয়া ছাড়া মালতীর আর কোন উপায় রহিল না। নবীন যৌবন যখন তার ভাব-শতদলের পাপ্‌ড়িগুলি একটির পর একটি খুলিয়া খুলিয়া আপনার চারিদিকে অশেষ উন্মাদনা সঞ্চারিত করিতেছিল, যখন এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের অভিনব আনন্দ তার চারিদিকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল, ঠিক সেই সময়টিতে মালতী তার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার দেনাপাওনা চুকাইয়া ম্লান মুখে পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিল।

মালতী পিতামাতার একমাত্র সন্তান। সুতরাং তাকে তাঁরা গভীর দুঃখে পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন। মালতীর পিতা ছিলেন নব্যতন্ত্রের লোক। তিনি কন্যার পুনরায় বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং তাকে লেখাপড়া শিখাইতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু বছর না ফিরিতে মালতীর পিতার মৃত্যু হইল; এবং তার বিবাহের কথাও চাপা পড়িয়া গেল।

এখন সংসারে শুধু সে ও তার মা। দুটি বিধবার সামান্য গৃহকর্ম্মের পর উদ্বৃত্ত সময় যখন তাদের শোকার্ত্ত মনকে অত্যন্ত নিপীড়িত করিত, তখন মালতী পুস্তকের মধ্যে আপনার সমস্ত ভয় ডুবাইয়া দিতে চেষ্টা করিত। এইরূপে লেখাপড়া করা তার নেশা হইয়া উঠিল।

বছর দুই পরে যখন মাতারও মৃত্যু হইল, তখন সে বুঝিল যে শুধু বই লইয়া থাকা যায় না, মানুষের জীবনে মানুষের সঙ্গ ও স্নেহ-মমতারও আবশ্যক আছে। তার পরে গ্রামের নিষ্কর্ম্মা পুরুষেরা যখন অনাথা বিধবার দুঃখে অতিমাত্রায় কাতর হইয়া তত্ত্বাবধান করিতে উৎসাহিত হইয়া উঠিল তখন মালতী অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বুড়ী দাসী হরির-মায়ের পরামর্শে তার মাসিমার কাছে আশ্রয় লওয়াই শ্রেয় বলিয়া স্থির করিল। মালতী তার মাসিকে কখনো দেখে নাই। এই অচেনা অদেখা মাসির কাছে আশ্রয় লইতেও মালতীর মনে নানাপ্রকার ভয় ভাবনা দেখা দিতেছিল। কিন্তু হরির মা তাকে সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিতেছিল—মায়ের বোন মাসি, তার কাছে যেতে আর ভয় কি?

মালতী সাতদিন হইল মাসিমাকে চিঠি লিখিয়াছে। কিন্তু কৈ আজও ত তাঁর জবাব আসিল না! মালতী উদ্বিগ্ন হইয়া যেন দিশা খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

বিকাল বেলা। মালতী মেঝেতে আঁচল পাতিয়া শুইয়া আছে;

হরির মা তার চুলের রাশির মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে নীরবে তাকে সান্ত্বনা দিতেছে। ঘরের দেয়ালে কুলুঙ্গিতে একটা টাইম্‌পিস ঘড়ী ঘরের নিস্তব্ধতাকে টিট্‌কারী দিতেছে।

মালতী শুইয়া শুইয়া ভাবিতেছিল তার মাসিমারই কথা। মায়ের আকৃতি-প্রকৃতির অনুরূপ করিয়া মাসিমাকে সে মনে মনে গড়িতেছিল। দুঃখিনী মালতী প্রাণপণে মাসিমার সেবা যত্ন করিয়া নিঃসন্তান তাঁর সমস্ত বাৎসল্য পাইয়া মায়ের শোক ভুলিতে পারিবে—এ আশা তার হইতেছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে তার মনে হইতেছিল—মাসিমা জমিদারের ঘরণী, তবু তিনি কখনো নিজের বোন-বোনঝির খোঁজ-খবর ত করেন নাই। সে শুনিয়াছিল বটে যে তার মাসিমা বিধবা হইয়া সর্ব্বস্ব হারাইয়া এখন তাঁর ভাসুরের আশ্রয়ে আছেন, কিন্তু পরাধীন বলিয়া কি এতটাই পরাধীন যে আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর পর্য্যন্ত লইতে পারেন না! আর যদি তিনি তেমনি পরাধীনই হন, তবে তাঁর কাছে গিয়া তাকে না জানি কেমন ভাবে থাকিতে হইবে! আর যদি তেমন পরাধীন না হন তবে সে মাসির স্নেহের ভরসা না রাখাই ভালো!

মালতীর মন যখন এমনি চিন্তামগ্ন তখন সদর রাস্তায় কে একজন গুরুগম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করিল—হ্যাঁ হে, অক্ষয়বাবুর বাড়ী কোনটা?

এই প্রশ্ন শুনিবামাত্র মালতী তাড়াতাড়ি উঠিয়া জান্‌লা ভেজাইয়া উঁকি মারিয়া দেখিল একজন সুগৌর দীর্ঘ বলিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য-ধরণের যুবাপুরুষ তাদের পাড়ার নবদ্বীপ কামারকে তারই পিতার বাড়ীর সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতেছে। মালতীর বুকের মধ্যে আনন্দ দুরুদুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, নিশ্চয় মাসিমা এঁকে পাঠাইয়াছেন।

নবদ্বীপ কামার অবাক হইয়া নবকিশোরের আপাদমস্তক দেখিয়া

লইয়া বলিল—এই বাড়ী চৌধুরী মশায়ের। মশায়ের কোত্থেকে আসা হচ্ছে?

নবকিশোর বলিল—আমি অক্ষয়বাবুর মেয়ের মাসির দেশের লোক।

মালতী ইহা শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া চাপা গলায় হরির মাকে ডাকিয়া বলিল—হরির মা, যা যা ঝপ করে গিয়ে ওঁকে ডেকে নিয়ে আয়। ওঠ্ ওঠ্।

মালতীর বাড়ীটি সদর রাস্তার ধারে হইলেও, তার প্রবেশদ্বার একটি গলির ভিতর। খেজুর-কাঠের শাঁকো দিয়া নয়ানজুলি পার হইয়া নবকিশোর বহিঃপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। প্রাঙ্গণের প্রাচীরের ধারে একটা সজিনার ও জবাফুলের গাছ, এবং এখানে সেখানে গোটাকতক ক্রোটন, অতীত উদ্যানের স্মৃতির মতো দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; এক পাশে একটা চুনের জালা ভাঙিয়া পড়িয়া আছে। বাহির-বাড়ীতে কোনো ঘর নাই; ভিতর-বাড়ীর একটি ঘরের বাহির দিকে রক ও দরজা আছে; সেই ঘরটিই দরকার-মত সদর অন্দর দু দিককারই কাজ চালাইয়া ছায়। হরির মা সেই ঘরের দরজা খুলিয়া নবকিশোরকে বলিল—আপনি এই ঘরে এসে বস বাবা, আমি মালতী দিদিমণিকে ডেকে দিচ্ছি।

সেই ঘরে একটা বিড়াল কুণ্ডলী পাকাইয়া দিব্য আরামে ঘুমাইতেছিল। তার সুষুপ্তির ব্যাঘাত ঘটাইয়া আলোক ও লোকের সমাগম হওয়াতে সে বড় বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল; প্রথমে সে গুণ-টানা ধনুকের ন্যায় উটের মতন পিঠ ফুলাইয়া আলস্য ত্যাগ করিল; তারপর পালোয়ানের ডন ফেলার মতন হাত পা ছড়াইয়া নিজেকে যথাসম্ভব দীর্ঘ করিয়া কোমর টানিয়া হাই তুলিয়া সে ঘর হইতে প্রস্থান করিল। একটু

আগেই বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল, উঠানের মাঝখানে ঘাসের বনে জল থিতাইয়াছিল; বিড়ালটি প্রতিপদক্ষেপের পর ভিজা পা তুলিয়া ঝাড়িয়া ঝাড়িয়া নূতন-জুতা-পরা সৌখীন বাবুর মতন অতি সন্তর্পণে জল পার হইয়া বাহিরে প্রস্থান করিল।

নবকিশোর একখানি চেয়ারে বসিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ঘরটিতে আস্‌বাবের বাহুল্য নাই; যাহা আছে তাহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, নিপুণা গৃহলক্ষ্মীর কল্যাণ-হস্তের সেবার সাক্ষী; ঘরের জান্‌লাগুলিতে ও দরজায় নানান রঙের ছিটের, ছেঁড়া ঢাকাই কাপড়ের ঝালর-দেওয়া পর্দ্দা টানা রহিয়াছে, ঘরের মাঝখানে একটি টেবিল ঘিরিয়া চারিখানি চেয়ার; একপাশে একখানি তক্তপোষ, সবগুলি সূচের কাজকরা সুন্দর সুজ্‌নি দিয়া ঢাকা। দেয়ালের ধারে একটি কাঠের আন্‌লা; দেয়ালে দেয়ালে ছবি ও খানকয়েক ফটোগ্রাফ সুসজ্জিত।

হরির মা দ্বারের কাছে আসিয়া বলিল্—মালতী দিদিমণি এসেছে।

নবকিশোর দ্বারান্তরালবর্ত্তিনী মালতীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল—আমি তোমাকে মথুরাপুরে নিয়ে যেতে এসেছি।…… …আমি অসঙ্কোচে প্রথমেই তোমায় তুমি বল্‌ছি, তাতে কিছু মনে কোরো না। তোমার যিনি মাসিমা, তিনি আমার খুড়িমা। দাদা ছোট-বোনকে আপনি বল্‌লে কেমন শোনায়?

মালতী এই নবাগত আগন্তুকের অসঙ্কোচ সরল অমায়িকতা দেখিয়া প্রীত হইল। সে স্পষ্ট অথচ মৃদুস্বরে বলিল—এ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন কেন। আমাকে আপনি বল্‌লেই অন্যায় হত।…আপনি মথুরাপুর থেকে কবে এলেন? মাসিমার কোনো চিঠি না পেয়ে বড় ভাবছিলুম।

মালতী আজন্ম বড় বয়স পর্য্যন্ত বাপের বাড়ীতেই পল্লীগ্রামে

প্রতিপালিত বলিয়া ঘোমটা-টানা সঙ্কুচিত লজ্জার সহিত তার কখনো পরিচয় হয় নাই ; বিবাহের পরও তার মাথার উপর শ্বশুরবাড়ীর কোনো রকম চাপ না পড়াতে সে অসঙ্কোচ স্বাধীনভাবে বাড়িয়া উঠিবার অবসর পাইয়াছিল—শাশুড়ীর শাসন, ননদের খোঁটা, তাকে কৃত্রিম ভব্যতায় আড়ষ্ট করিয়া তুলিতে পারে নাই। অধিকন্তু তার পিতা আপিসে বা বিদেশে গেলে আগন্তুক অতিথি-অভ্যাগতদিগের অভ্যর্থনা সমাদর করিতে হইত তাকেই। ইহাতে তার প্রকৃতিগত নারীত্বের মাধুর্য্য অভ্যাসগত স্বাধীন অসঙ্কোচ ভাবের সহিত মিশিয়া তাকে অপূর্ব্ব রকমে কোমল অথচ শক্তিমতী করিয়া তুলিয়াছিল।

নবকিশোর এই তরুণী রমণীর অসঙ্কোচ ব্যবহারে আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—আমি কল্‌কাতাতেই থাকি, মথুরাপুর থেকে চিঠি পেয়ে তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি।

এমন অসম্পূর্ণ কথায় সন্তুষ্ট হইবার পাত্রী মালতী নহে। সেইজন্য সে পুনরায় প্রশ্ন করিল—আপনাকে মাসিমা নিয়ে যেতে লিখেছেন, কিন্তু আমায় ত কোনো খবরই লেখেন নি ?

নবকিশোর এই প্রশ্নে একটু বিব্রত হইয়া বলিল—খুড়িমাই ঠিক চিঠি লেখেন নি। তিনি পরাধীনা, সব সময় ইচ্ছামত কাজ কোরে উঠতে পারেন না। খুড়িমার ভাসুর হরিবিহারী-বাবু তাঁর ছেলে বিপিনকে চিঠি লিখেছেন ; বিপিন আমায় তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

—আপনি বিপিন-বাবু নন ? আমরা তাঁর নাম শুনেছি। মাসিমা বিধবা হলে তিনিই তাঁকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রেখেছেন। আমি মনে করেছিলাম আপনিই বিপিন-বাবু। আপনি তবে বিপিনবাবুদের কে হন ?

—তাঁদের সঙ্গে আমার কোনো রক্তসম্বন্ধ নেই। আমার বাবা তাঁদের পুরোহিত। তোমার মাসিমা সেই সূত্রে আমাদের সকলেরই খুড়িমা—চাকর দাসী গোমস্তা পাইক সকলেই তাঁকে খুড়িমা বোলেই

মালতী ঈষৎ হাসিয়া বলিল—আপনি কি চিঠি পেয়েছেন একবার দেখ্‌তে পারি কি ?

নবকিশোর মালতীর অতিরিক্ত সাবধানতা দেখিয়া ও সপ্রতিভ জেরা শুনিয়া মনে মনে প্রীত হইতেছিল। সে হাসিয়া বলিল—অপরিচিতকে সনাক্ত করা দর্‌কার হবে বুঝে চিঠি সঙ্গেই এনেছি।··· এই নাও—বলিয়া নবকিশোর পকেট হইতে দুখানি চিঠি বাহির করিল এবং পাছে ভুল হয় এজন্য সতর্ক হইয়া নিজের নামের চিঠিখানি আগে পকেটে রাখিয়া দিয়া বিপিনের নামের চিঠিখানি হরির মায়ের হাতে দিল।

কিন্তু যে-ভুল করিবে না বলিয়া সতর্ক হইতে চাহিয়াছিল, সেই ভুলই ঘটিয়া গেল। সকালে তর্কের ঝোঁকে বিপিনের নাম-লেখা খামে ভট্টাচার্য্য-মহাশয়ের চিঠি এবং নবকিশোরের নাম-লেখা খামে হরিবিহারী-বাবুর চিঠি স্থান পাইয়াছিল। মালতী স্মৃতিরত্ন-মহাশয়ের চিঠিতে তার চিঠি পাওয়া হইতে তাকে আশ্রয় দেওয়ার সমস্ত বিবরণ অবাক্ হইয়া পড়িতে লাগিল।

মালতীকে স্বামীবিয়োগের দুঃখের পর কয়েকদিন মাত্র শ্বশুরবাড়ীর অনাদর উপেক্ষা সহ্য করিতে হইয়াছিল; তখন সে বালিকা মাত্র। তারপর তার পিতামাতার স্নেহপ্রলেপ তার সকল বেদনা শীঘ্রই উপশম করিয়া দিতে পারিয়াছিল। কিন্তু পিতামাতার মৃত্যুর পর তার যে দারুণ বেদনা মাসির কাছে সান্ত্বনা পাইবার আশা করিতেছিল, সেই মাসির

উদাসীন উপেক্ষা মালতীর বুকে ব্যথার উপর বড় বেশী করিয়া বাজিল। সে মনে মনে মাসির যে স্নেহকল্যাণী মূর্ত্তি গড়িয়াছিল তাহা এই আঘাতে একেবারে ভাঙিয়া চুরিয়া এক নিমেষে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। তার মাসির কাছে তাঁর আহত গর্ব্বই যে তার বিপদের চেয়ে বড় হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে, এই অপমানের আঘাতে তার মনের কানায় কানায় পূর্ণ দুঃখ অভিমানের অশ্রুতে উপ্‌চিয়া পড়িতে লাগিল।

নবকিশোর মালতীকে কাঁদিতে শুনিয়া মনে করিল তাহা পিতামাতার মৃত্যুশোকে। তাই সান্ত্বনা দিয়া বলিল—দুঃখ কোরো না। আমাদের খুড়িমা বড় স্নেহময়ী, তাঁর কাছে গেলে তুমি মাসির যত্নে মায়ের অভাব বুঝতে পারবে না······

মালতী ক্রন্দনবিজড়িত দৃঢ়স্বরে বলিল—হ্যাঁ চিঠিতে যে রকম স্নেহের পরিচয় পাচ্ছি তাতে তাঁর স্নেহ পেতে আর প্রবৃত্তি নেই! তাঁর কাছে আমি আর যাব না।

মালতীর কথা শুনিয়া নবকিশোর আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিল, এ কি বলিতেছে? তারপর হঠাৎ তার মনে হইল চিঠি দিতে সে বোধ হয় গোলমাল করিয়া বসিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি পকেট হইতে অপর চিঠিখানি বাহির করিয়াই বুঝিল যে-কথা সে ঢাকিতে চাহিয়াছিল অসাবধানে তাহা ফাঁস হইয়া গিয়াছে। ইহাতে সে লজ্জিত হইল। মালতীর তেজদৃপ্ত বাক্য শুনিয়া তার আনন্দও হইল। একটি নিরাশ্রয়া যুবতীর মুখে অমন তেজের কথা শুনিয়া নবকিশোর সলজ্জ স্মিতমুখে বলিল—তুমি যদি যাবে না, তবে এখানে তোমার চল্‌বে কি কোরে?

—কোনো মেয়ে-স্কুলে চাকুরী নেব। আমি একলা মানুষ বৈ ত নয়, কোনো রকমে চোলে যাবেই।

বাঙালী হিন্দুঘরের মেয়ের এমন স্বাবলম্বনের সাহস আছে, নবকিশোরের সে জ্ঞান ছিল না। তার মন মালতীর প্রতি শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে ভরিয়া উঠিতেছিল। মালতীকে ভালো করিয়া বুঝিয়া লইবার জন্য নবকিশোর বলিল—এখানে তোমাকে দেখ্‌বে শুন্‌বে কে?

—ভগবান, আর আমি নিজে।

নবকিশোর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তবে তুমি অমন ভয়ে ব্যস্ত হয়ে খুড়িমাকে চিঠি লিখেছিলে কেন?

মালতী লজ্জিত হইয়া গলার স্বর নামাইয়া থামিয়া থামিয়া বলিতে লাগিল—সংসারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় অল্প বোলে ভয় হয়।

—এখনো ত সে ভয়ের কারণ দূর হয়নি?

—ভগবান যখন আমাকে সংসারে একলা ছেড়ে না দিয়ে ছাড়বেন না, তখন বাধ্য হয়েই সংসারকে চিনে নিতে হবে। যতক্ষণ অপরিচয় ততক্ষণই ত ভয়···

নবকিশোর আর মালতীর কথা ভালো করিয়া শুনিতেছিল না। সে মনে মনে মালতীর সহিত তার চেনাশোনা মেয়েদের তুলনা করিতেছিল; মালতীর পাশে তাদের ছবি হাস্যোদ্দীপক মনে হইতেছিল। নবকিশোর সঙ্কল্প করিল যেমন করিয়া হোক মালতীকে মথুরাপুরের জমিদারের অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া ফেলিতে হইবে; মালতীর আদর্শ সংসর্গ ও চেষ্টার দ্বারা সেখানকার মূর্খ পরকুৎসাপ্রিয় স্ত্রীসমাজকে ভাঙিয়া গড়িতে হইবে।

নবকিশোর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—তোমার মাসির ব্যবহারে তোমার মনে কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তোমার একবার তাঁর মানসিক অবস্থাটাও বিচার কোরে দেখা উচিত। এককালে তিনি যাদের সমকক্ষ শরিক ছিলেন, তাদের দুষ্ট চক্রান্তে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে এখন

তিনি তাদেরই দ্বারস্থ। তাদের কাছে ভিক্ষা চাইবার সময় তাঁর অভিমান একটু যদি তীক্ষ্ণ হয়েই থাকে তবে সে কি একেবারে অমার্জ্জনীয়? ……তুমি তোমার মাসিকে চেন না, আমরা কিন্তু আমাদের খুড়িমাকে খুব ভালো কোরেই চিনি।

মালতী একটু ভাবিয়া বলিল—তা হতে পারে। কিন্তু যেখানে একদিকে ভিক্ষা আর অন্যদিকে উপেক্ষা, সেখানে ভিক্ষার মাত্রা বৃদ্ধি কোরে মাসিমাকে কুণ্ঠিত অপমানিত করাও ত আমার উচিত হবে না। তাঁকে যে এমনতর ভিক্ষার ওপর নির্ভর কোরে থাকৃতে হয় জান্‌লে কখনো তাঁকে চিঠি লিখ্‌তাম না।

—এখানেও তোমার চেয়ে আমাদের জান্‌বার সুবিধা বেশী। বিপিনের মা জমিদারের অশিক্ষিতা গৃহিণী, তাই তিনি খাম্‌খেয়ালি, গর্ব্বিতা, অসহিষ্ণু; কিন্তু আসল মানুষটি বড় সাদা, বড় স্নেহশীলা, অল্পেই তাঁকে তুষ্ট করা যায়, রাগ তাঁর বেশীক্ষণ থাকে না। যদি তাঁর খেয়াল বুঝে চলা যায় তবে তাঁকে দিয়ে যা ইচ্ছা তাই করিয়ে নেওয়া কিছুমাত্র শক্ত কাজ নয়। খুড়িমা সেইটি পারেন না বোলেই যত গণ্ডগোল বাধে। বিপিন মধ্যস্থ হয়ে দুদিক সাম্‌লায়। বিপিন বাড়ী থাক্‌লে এত গণ্ডগোল হত না। বিপিন শিগ্‌গিরই বাড়ী যাবে, তখন আর কোনো গণ্ডগোল হবার সম্ভাবনা থাকবে না।……তোমার আর কোনো ওজর-টোজর শুন্‌ব না। এই দেখ হরিবিহারী-বাবু তোমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন, আমি বিপিনের হয়ে নিমন্ত্রণ কর্‌তে এসেছি; তোমাকে যেতেই হবে। সে বাড়ীতে তোমার যাওয়ার দর্‌কার আছে; তোমাকে দিয়ে আমরা ঢের কাজ করিয়ে নেব। আমরা দুই বন্ধুতে অনেক কাজ কর্‌বার মৎলব ঠাওরে রেখেছি, তোমায় গিয়ে তাতে সাহায্য কর্‌তে হবে।……স্পষ্ট কথা বল্‌তে কি, তোমাকে প্রথমটা একটু বিরাগ তাচ্ছিল্য হয়ত সহ্য

কর্‌তে হবে। প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠ্‌লে আর কোনো গণ্ডগোল থাক্‌বে না।

মালতী নবকিশোরের সরল সবল চরিত্রের আভাস পাইয়া মুগ্ধ হইতেছিল; সে চুপ করিয়া রহিল। নবকিশোর ইহাতে প্রীত হইয়া বলিল—কালকেই আমরা রওনা হব তবে, কেমন? যাত্রার দিনের জন্যে পাঁজি খুঁজ্‌তে হবে না ত?

মালতী হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিল—না, পাঁজির ধার ধারি নে।

নবকিশোর দরাজ গলায় জোরে হাসিয়া বলিল—তবে ত তোমাকে মথুরাপুরে আমরা না নিয়ে গিয়ে ছাড়্‌বই না। আমাদের দুই বন্ধুর অখ্যাতি আছে যে আমরা পাঁজি পুঁথি মানি নে: তুমি গেলে আমাদের দলে আর-একজন বাড়্‌বে।······তুমি তা হলে সমস্ত গুছিয়ে ঠিক হয়ে থেকো, আমি কাল এসে নিয়ে যাব। এখন তবে আমি যাই।

নবকিশোর ছাতা চাদর লইয়া যাইতে উদ্যত হইল।

মালতী মৃদুস্বরে বলিল—একটু মিষ্টিমুখ না কোরে যাওয়া হবে না।

নবকিশোর সমস্ত ঘর ভরিয়া হাসিয়া বলিল—সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের মতন আমারও যে মিষ্টান্নের প্রতি বিষম পক্ষপাত এ কথা আমার এই প্রকাণ্ড শরীরটা কিছুতেই গোপন রাখ্‌তে দেয় না। তা দাও, আমার আপত্তি নেই।

হরির মা আসন পাতিয়া জলখাবারের ঠাঁই করিয়া দিলে নবকিশোর আসনে গিয়া বসিল। ক্ষণকাল পরেই সলজ্জ স্মিত মুখে মালতী জলখাবারের রেকাবি হাতে করিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল। নবকিশোর এতক্ষণ মালতীকে দেখিতে পায় নাই, মালতী অন্তরালে বসিয়াই কথা বলিতেছিল। এখন তাকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া নবকিশোর মুখ তুলিয়াই দেখিল তার কি অপরূপ রূপ! একখানি

ধোয়া নরুন-পেড়ে শাড়ীতেই এই নিরাভরণা তরুণীকে রাণীর মতো মহিমাময়ী দেখাইতেছিল। নবকিশোর সসম্ভ্রমে আসনের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। মালতী তার সাম্‌নে জলখাবারের রেকাবি রাখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

৭

জেদের বশে খুড়িমা মালতীকে নিজের কাছে আনাইবার চেষ্টায় বিরত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু মন তাঁর নিশ্চিন্ত ছিল না। তিনি ভাবিতেছিলেন—কোন্ সেই দূর দেশে তাঁর বোনঝি রহিয়াছে; সে এই নিষ্ঠুর সংসারে একেবারে একা। শুধু আছে তার পরিপূর্ণ যৌবন আর অপরূপ রূপ! কে তাকে এই শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিবে? তিলমাত্র অশুচিতা যদি তাকে কলঙ্কিত করে তবে তার লজ্জা ও প্রত্যবায়ের ভাগী তিনিও। ধিক্ ধিক্ তাঁর ক্রোধকে, কেন তিনি এমন দারুণ শপথ করিয়া বসিলেন, এ প্রবৃত্তি তাঁর কেন হইল? হতভাগা মেয়েটার জন্য শত্রুর কাছে মাথা হেঁট ত সেই করিতেই হইল, অথচ কোনো কাজ হইল না! মেয়েটা কি এমনি অপয়া—যেখানে পা দিয়াছে সেখানেই আগুন জ্বালিয়াছে! কি কুক্ষণেই তার জন্ম! পরের গলগ্রহ হওয়ার যে দৈন্য এতদিনের অভ্যাসের তলে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল মালতীর জন্যই ত তাহা আজি তাঁর নিজের ও পরের কাছে নূতন হইয়া উঠিয়াছে! কি লজ্জা! কি লজ্জা! মালতীর এখানে আসিয়া কাজ নাই, তার না আসাই ভালো! কিন্তু সে যে অনাথা! আহা সে যে ছেলেমানুষ! তার মুখের দিকে তাকাইতে দ্বিতীয় লোক যে আর কেহ নাই!

খুড়িমার মন এমনি ভাবে একবার মালতীর দুঃখে কাতর হইতেছিল,

আবার নিজের আহত অভিমান তাঁকে কঠিন করিয়া তুলিতেছিল। বিরাগ ও মমতার মধ্যে তাঁর চিত্ত দোল খাইয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না যে মালতীর সম্বন্ধে তিনি উদাসীনই থাকিবেন অথবা তার জন্য কিছু চেষ্টাই করিবেন।

এমনি অমীমাংসার মধ্যে কয়দিন অবিশ্রাম কাঁদিয়া কাঁদিয়া তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। মালতীকে আনিবার জন্য হরিবিহারী বিপিনকে ও ভট্টাচার্য্য-মহাশয় নবকিশোরকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা খুড়িমা জানিতেন না। হরিবিহারী একান্তবাসী মিতবাক্ মানুষ, তিনি এ কথা কাহাকেও বলা আবশ্যক মনে করেন নাই; মালতী আসিয়া-পড়ার আগে তার আসার সংবাদ প্রকাশ পাইলে পাছে কোনোরূপ বিঘ্ন ঘটে এই ভয়ে ভট্টাচার্য্যও সে কথা গোপন রাখিয়াছিলেন। তিনি কেবল খুড়িমাকে সান্ত্বনা দিতেন—মা, ভেবো না, যেমনটি হলে ভালো হবে নারাণ ঠিক তেমনি কোরে দেবেন। আমরা কতটুকু ভাব্‌তে পারি মা, আমাদের ভাব্‌না তিনিই ভাবছেন।

বাস্তবিক খুড়িমা ভাবিয়া চিন্তিয়া কুলকিনারা পাইতেছিলেন না। তিনি বেদনাকাতর দেহমন ঠাকুরের পায়ের কাছে লুটাইয়া দিয়া চোখের জলে নিবেদন করিতেন—হে ঠাকুর, আর পারিনে, আর পারিনে। রক্ষা করো ঠাকুর, রক্ষা করো!

একদিন প্রভাতে খুড়িমা ঠাকুরঘরে বসিয়া অশ্রুজলে ঠাকুরের পূজা করিতেছেন, এমন সময় অন্দরের দেউড়িতে পাল্কীবেহারার ক্লান্ত কলরব শোনা গেল।

অন্দরে একটা কৌতুহলের সাড়া পড়িয়া গেল। এমন অসময়ে বিনা সংবাদে আসিল কে? গিন্নি পর্য্যন্ত যখন জানেন না, তখন এর মধ্যে কিছু রহস্য আছে। ছেলে মেয়ে আর দাসীরা ছুটিয়া দেখিতে গেল।

বৌঝিরা উঠানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া উৎসুক দৃষ্টিতে ঘন ঘন দরজায় উঁকি মারিতে মারিতে সম্ভব অসম্ভব নানান রকম আন্দাজ করিতে লাগিল।

খুড়িমার কারো সহিত সম্পর্ক নাই। তিনি ঠাকুরঘরেই চুপ করিয়া ঠাকুরের দিকে চাহিয়া আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন। যে আসিল সে যদি মালতী হয়! এই সম্ভাবনার আনন্দ ও ভয়, আশা ও দুঃখ তাঁর মন বিমথিত করিতে লাগিল, তাঁর বুকের ভিতর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

সকলকে ঠেলিয়া রোহিণীই আগে দেউড়িতে দৌড়িয়াছিল। সে গিয়া দেখিল নবকিশোরের পশ্চাতে একটি জীবন্ত প্রতিমা অন্দরের দিকে আসিতেছে। রোহিণী সম্ভ্রমে বিস্ময়ে অবাক হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। এত রূপ যার সে কি মানুষ!

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—অবাক হয়ে কি দেখ্‌ছ রোহিণী? এ আমাদের খুড়িমার বোনঝি।

রোহিণী হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। ও যে ঠাক্‌রুণ নয়, পরী নয়, এমন কি মেমও নয়, ও খুড়িমার বোনঝি মালতী মাত্র, একজন অতি সাধারণ মেয়ে—যাকে লইয়া এই সেদিন এতবড় তুমুল কাণ্ড হইয়া গেল এ সেই—ইহা মনে করিয়া রোহিণী আশ্বস্ত হইল! সে একমুখ হাসিয়া বলিল—ওমা! এই খুড়িমার বোনঝি বুঝি! আমি বলি দাদাঠাকুর বুঝি শেষকালে ঘাগ্‌রাপরা মেম বিয়ে কোরে আন্‌লে।

মালতীর মুখ লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল। সে চকিত দৃষ্টিতে একবার রোহিণীকে দেখিয়া লইয়া মাথা নত করিল। রোহিণীর ভাবভঙ্গী তার মোটেই ভালো লাগিল না।

নবকিশোর রোহিণীর দিকে এমন তীব্র ভাবে চোখ রাঙাইয়া

তাকাইল যে রোহিণী দ্বিতীয় রসিকতার জন্য উদ্যত রসনা সংযত করিয়া অন্দরের দিকে ছুটিয়া পলাইল। সে নবকিশোরকে ভালো রকমই চিনিত!

রোহিণীকে ফিরিতে দেখিয়া সকলে একসঙ্গে প্রশ্ন বর্ষণ করিতে লাগিল—কে রোহিণী? কে রে? কে এসেছে?

রোহিণী তখন খুড়িমাকে খবর দিয়া জ্বালাইবার জন্য ব্যস্ত। সে ছুটিতে ছুটিতে বলিয়া গেল—ওগো, আমাদের খুড়িমার ঘাগ্‌রাপরা মেম বোনঝি এসেছে গো!

নবকিশোরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মালতী উঠানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ছেলে-মেয়েরা চারিদিক হইতে নবকিশোরকে জড়াইয়া ধরিয়া কলরব করিতেছিল। বিনোদ বলিল—দাদাঠাকুর, তুমি এলে, বড়দা এল না?…… এইবার তোমায় রোজ একটা কোরে গল্প বল্‌তে হবে কিন্তু!

পাঁচু বলিল—হ্যাঁ, সেই সাত ভাই চম্পার গল্প!

বিনোদ বাধা দিয়া বলিল—না না, ও ত পুরোণো গল্প। সেই সোনার কাঠি রূপোর কাঠির গল্প, সেই রাজপুত্তুরের তালপত্র খাঁড়া আর কাঠের পক্ষীরাজ ঘোড়ার গল্প বল্‌তে হবে দাদাঠাকুর……

নবকিশোর হাসিতে হাসিতে দুই হাতে দুইটা মাথা ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া বলিল—হাঁ রে হাঁ, বল্‌ব, সব বল্‌ব। এখন বাঁদররা একটু থাম্ দেখি, দেখ্‌ছিস্ নে তোদের একজন নতুন দিদি এসেছে? ও ঢের গল্প জানে। যা, ওর সঙ্গে সব ভাব কর্‌গে যা।

ছেলেরা সবিস্ময় কৌতূহলে অপরিচিতা আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বৌয়েরা নবকিশোরকে দেখিয়া একগলা ঘোমটা টানিয়া সরিয়া

দাঁড়াইয়া দুই আঙুলে ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া মালতীকে দেখিতেছিল। ঝিউড়িরাও নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। কেহই অগ্রসর হইয়া মালতীকে অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিল না।

রোহিণীর বিদ্রূপে মালতীর মনের মধ্যে কান্না জমিয়া উঠিয়াছিল; এখন সকলের বিরাগভরা ব্যবহারে তার অশ্রু রোধ করা কঠিন হইয়া উঠিল। তার মনে হইতে লাগিল—এ কি এ কোথায় আসিলাম? সকলের এত তাচ্ছিল্য সহিয়া এখানে টিকিয়া থাকিব কেমন করিয়া? এমন ভাবে সকলের দৃষ্টির লক্ষ্য হইয়া আর কতক্ষণ লজ্জা পাইতে হইবে? কেউ কি তাকে একবার ডাকিয়া তাদের নিজেদের মধ্যেকার একজন করিয়া লইবেন না? মাসিমা, তিনিই বা কোথায়?

নবকিশোর মালতীর অবস্থা বুঝিতে পারিয়া করুণ সান্ত্বনার দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিতেই তার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। তাহা লুকাইবার জন্য মালতী মাথা নত করিল। এই অপরিচিত বিরূপ নারীমণ্ডলীর মধ্যে একা নবকিশোরকে বন্ধু দেখিয়া যতই সে তার প্রত্যাশা করিতেছিল ততই তার ভয় বাড়িতেছিল যে পরের ঘরে নবকিশোর কতক্ষণ তাকে আগলাইয়া থাকিবে? এই-সমস্ত বিরূপ লোকদের বিরাগ সহ্য করিয়াই তাকে থাকিতে হইবে। মালতী এই সম্ভাবনার চিন্তাতেই ব্যাকুল হইয়া নিরাশ্রয়ের হতাশ দুর্ব্বলতায় একেবারে ভাঙিয়া পড়িবার মতন হইতেছিল। আর সে নিজেকে যেন সম্বরণ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না।

এমন সময় বিনি তাকে বাঁচাইল। সে এতক্ষণ মালতীর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে দেখিতে সাহস করিয়া অগ্রসর হইল, এবং মালতীর হাত ধরিয়া গম্ভীরভাবে বলিল—তুমি আমাল্ দিদি? তুমি গপ্প বল্‌বে?

মালতী সমুদ্রে যেন কূল পাইল। সে তাড়াতাড়ি বিনিকে কোলে তুলিয়া লইয়া তার মুখে চুম্বন করিতেই তার সকল চেষ্টা ভাসিয়া গেল—প্রভাতবায়ুর স্নিগ্ধ স্পর্শে শুভ্র সুন্দর শিউলিফুলের মতো অশ্রু-বিন্দুগুলি ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। এ বাড়ীর কেউ একজনও ত তাকে আদর করিয়া আত্মীয় বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছে! তার সমস্ত লজ্জার গ্লানি এই ছোট্ট মেয়েটুকু আদর দিয়া মুছিয়া দিয়াছে!

মালতী তাড়াতাড়ি চোখের জল আঁচলে মুছিয়া নবকিশোরের দিকে সকরুণ প্রসন্ন দৃষ্টি ফিরাইল। নবকিশোরও এতক্ষণে কিছু বলিবার অবকাশ পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল; সে বলিল—এ আমাদের বিনি, আর ইনিই আমাদের মা······

বিনি পাছে মালতীকে ছুঁইয়া ফেলে এই ভয়ে গিন্নি তাড়াতাড়ি বিনিকে ধরিতে আসিয়াছিলেন; তিনি ধরিবার আগেই মালতী তাকে কোলে তুলিয়া লইয়াছিল; গিন্নি তাহা দেখিয়া কাঠের মতো আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। মালতী তাঁকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা লইবার জন্য হাত বাড়াইতেই, পায়ের কাছে সাপ দেখিলে মানুষ যেমন করিয়া চম্‌কাইয়া পিছু হটে তেমনি করিয়া, তিনি সরিয়া গিয়া বলিলেন —থাক্ থাক্, আমায় ছুঁয়ো না।······বিনি, কোল থেকে নেমে আয় বল্‌ছি! নাচ্‌তে নাচ্‌তে গিয়ে কোলে ওঠা হল! যা রোহিণীর কাছে, ঘাগরা খুলে কাচতে দিগে যা!······গেলি?

নবকিশোর মালতীর আগমনটা কিছুতেই সহজ করিয়া তুলিতে পারিতেছিল না বলিয়া সে বিব্রত হইয়া উঠিয়াছিল। সে এখন মালতীকে খুড়িমার জিম্মায় সঁপিয়া দিতে পারিলে নিষ্কৃতি পায়। সে গিন্নিকে জিজ্ঞাসা করিল—মা, খুড়িমাকে দেখ্‌ছিনে, খুড়িমা কোথায়?

তাঁকে না জানাইয়া মালতীকে একেবারে আনাইয়া লওয়াটা যে ছোট-বৌয়েরই কারসাজি সে বিষয়ে গিন্নির কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তিনি রুদ্ধ রোষে দগ্ধ হইতেছিলেন। নবকিশোরের প্রশ্ন শুনিয়াই তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিলেন—কে জানে তোমাদের খুড়িমা কোথায় আছেন না-আছেন! তাঁরা হলেন রাণী লোক! আমাদের মতন দাসী বাঁদীদের তাঁরা কিছু বলেন, না পোঁছেন।

নবকিশোর নিরাশ্রয় ভাবে একবার চারিদিকে চাহিল। ক্ষমা বলিল—খুড়িমা ঠাকুরঘরে।

নবকিশোর মিনতির স্বরে বলিল—নিয়ে যা-না ভাই ক্ষমা, মালতীকে খুড়িমার কাছে। আমি ততক্ষণ মার সঙ্গে একটু গল্প করি······বিপিন মাকে অনেক কথা বল্‌তে বলেছে······

নবকিশোর পুত্রের নামে মাতার হৃদয় জয় করিবার আশা করিতেছিল।

ক্ষমা মালতীর দিকে অবাক হইয়া একবার চাহিল। সে বুঝিতে পারিতেছিল না মেমকে কি বলিয়া সম্ভাষণ করিবে, এবং মেমই বা তার কথা কেমন করিয়া বুঝিবে? ইতস্তত করিয়া ক্ষমা মাথার ইঙ্গিতে মালতীকে আহ্বান করিল।

গিন্নি চোখ্‌ রাঙাইয়া ক্ষমাকে বলিলেন—আ মর আজুলি ছুঁড়ি! ও ঠাকুরঘরে যাবে কি লা?

ক্ষমা ফ্যালফ্যাল করিয়া একবার গিন্নির দিকে, একবার মালতীর দিকে, একবার নবকিশোরের দিকে চাহিতে লাগিল।

নবকিশোর চেষ্টা করিয়া হাসিয়া গিন্নিকে বলিল—কেন মা, ও ঠাকুর-ঘরে গেলই বা?

গিন্নি বিস্ময়ের স্বরে বলিলেন—গেলই বা! অজাত কুজাত সকলে অমনি ঠাকুরঘরে গেলেই হল!

—অজাত কুজাত কিসে হল ? ও ত তোমারই জায়ের বোনঝি !

—হলই বা জায়ের বোনঝি ! ঘাগ্‌রা পরেছে যখন তখন ত ও খিষ্টান
য়ে জাত দিয়েছে !

নবকিশোর মালতীর দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিল। মালতীর মুখ
খন লজ্জায় অপমানে লাল হইয়া উঠিয়াছে।

নবকিশোর গিন্নিকে বলিল—ও ত ঘাগ্‌রা নয়, ওকে বলে শেমিজ !
াবরুর জন্যে আজকাল সহরে ও-রকম জামা সবাই পর্‌ছে। তোমরা
া কাপড় পরো, সেই কাপড় কেটে একটা জামা তৈরি কোরে পর্‌লেই
ম্‌নি জাত গেল ? জাত এম্‌নি ঠুনকো ! আর, ঘাগ্‌রা পর্‌লেই যদি
াত যায় তবে তোমার বিনিরও ত জাত গেছে !

গিন্নি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—ছেলেমানুষে আর বুড়ো মাগীতে
মান হল !

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—তোমরা জাত মানো জানি, তোমাদের
াকুররাও জাতের বিচার করেন দেখ্‌ছি ! তোমাদের মতন গুটিকয়েক
িচিবেয়ে লোকেরই শুধু দেবতা ! তাঁরা আর কারো কেউ নন ! অথচ
থায় কথায় তোমরাই বল যে দেবতা পতিত-পাবন !

গিন্নি নবকিশোরের যুক্তির কাছে পরাজিত হওয়াতে উষ্ণ হইয়া হাত
নথ নাড়িয়া বলিলেন—পতিতপাবন বোলে কি মেলেচ্ছ এসে ঠাকুর
াবে ! চাঁদপানা মুখ দেখে তোরা মাথায় করে নাচ্‌বি বোলে কি
মরাও জাত খোয়াব, না, ঠাকুরকে অপবিত্তির কর্‌ব ? তুই লেখা পড়া
িখে কি হলি বল দেখি কিশোর ? শাস্তরে আছে, সেলাই-করা কাপড়
ারে দেবকার্য্য হয় না, তা জানিস্‌ ? নইলে দর্‌জিরা মোছলমান হল
কন তা বল্‌ !

—না মা, ওসব শাস্তর আমার জানা নেই। কিন্তু পশ্চিমের পাণ্ডাদের

দেখেছ ত? তারা দিব্যি তূলো-ভরা জামা পোরে পূজো করায়। তার বেলা?

—দেবতার পাণ্ডা আর আমরা এক হলাম! তোর জ্ঞান বুদ্ধি কবে হবে কিশোর? তো হতেই এতবড় ভট্‌চায্যি-গুষ্টিটার নাম ডুব্‌বে দেখ্‌ছি।

নবকিশোর দেখিল এ তর্ক মীমাংসা হইবার নয়। ওদিকে মালতী শিথিলবৃন্ত ফুলটির মতো নিরাশ্রয় দাঁড়াইয়া আছে। তাই নবকিশোর হাসিয়া বলিল—এর চেয়ে বেশী জ্ঞান বুদ্ধি তোমার কিশোরের হবে না মা! আমার আশা ছেড়ে দাও। মালতী ছেলেমানুষ আছে, ওকে গোবর-টোবর খাইয়ে যদি শুদ্ধ করে নিতে পার ত তাতে তোমার নাম-যশ আর পুণ্য দুইই হবে। ওর সমস্ত ভার ত তোমাকেই নিতে হবে। খুড়িমা ত ওকে আনাতে চাননি, ও তোমার যশ শুনেই ত তোমার আশ্রয়ে এসে পড়েছে······

এই কথায় গিন্নির মন খুসী হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—তা এসেছে যখন, তখন কি আর আমি তাড়িয়ে দেবো? কিন্তু তোমায় বলে রাখ্‌ছি বাছা, ওসব মেলেচ্ছপনা তোমায় ছাড়্‌তে হবে। এ নয়, সে নয়, বিধবা মানুষের এই ধারা, ছি!······ছোট বৌয়ের আক্কেলকে বলিহারি যাই! মেয়েটা এক পহর এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তা একবার উঁকি মেরে দেখার নামটি নেই। ছোট বৌ, ও ছোট বৌ!······

খুড়িমা ঠাকুরঘরে থাকিয়াই টের পাইয়াছিলেন মালতী আসিয়াছে। তিনি বিগলিত অশ্রুধারা রোধ করিয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময়ে রোহিণী গিয়া কর্কশ ব্যঙ্গস্বরে বলিল—ওগো খুড়িমা, তোমার ঘাগ্‌রা-পরা মেম বোনঝি এসেছে যে, দেখসে!

খুড়িমা মুদ্রিত নেত্রে নিশ্চল বসিয়াই রহিলেন, রোহিণীর কথায় কোনো সাড়াই দিলেন না।

রোহিণী বিরক্ত হইয়া ফিরিতেছিল, পথে গিন্নির সহিত দেখা হইল। গিন্নি জিজ্ঞাসা করিলেন—ছোট বৌ কোথায় রে রোহিণী।

রোহিণী খুড়িমাকে ভেঙ্‌চাইয়া বলিল—ঠাকুরঘরে চোখ বুজে ধ্যান হচ্ছে। বল্‌লাম বোনঝি এসেছে, কানে কথা তোলা হল না।

গিন্নি ঠাকুরঘরে গিয়া ডাকিলেন—ছোট বৌ!

খুড়িমা গলায় কাপড় দিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া অশ্রুপ্লাবিত করুণ দৃষ্টিতে গিন্নির মুখের দিকে চাহিলেন।

তাহা দেখিয়া গিন্নির মন ভিজিল। তিনি নরম সুরে বলিলেন—শুধু-শুধু কাঁদ্‌ছিস কেন ছোট বৌ? মা-মরা মেয়েটা এসেছে, তাকে দেখ্‌ শোন্‌। আয় আয় বেরিয়ে আয়......

অনেক কষ্টে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন রোধ করিয়া খুড়িমা বলিলেন—দিদি, আমি এই ঠাকুরঘরে দাঁড়িয়ে বল্‌ছি আমি ওকে আনাই নি, ঘুণাক্ষরে জানিও না যে ও আস্‌বে। ও তোমারই আশ্রয়ে এসেছে; তুমিই ওর মা মাসি; তুমিই ওকে দেখ্‌বে।

গিন্নি পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন—হাঁ তা ত দেখ্‌বই। তবু তুই একবার এসে দেখ্‌।......কিন্তু বোলে রাখ্‌ছি ছোট বৌ, এ বাড়ীতে ওসব মেলেচ্ছ চাল চল্‌বে না।

খুড়িমা এ কথার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। তিনি গিন্নির পশ্চাতে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেই দেখিলেন নবকিশোরের পশ্চাতে একটি পরমা সুন্দরী তরুণী দাঁড়াইয়া আছে! এই অপূর্ব্ব রূপসী তাঁর বোনঝি! এ কী রূপ! ডাগর চোখ দুটি লজ্জায় নত হইয়া যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে; নিটোল গাল দুটিতে লজ্জার অরুণরাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে। পরণে একটি শেমিজ বেড়িয়া একখানি চুল-পেড়ে ধুতি। ঘোমটায় মাথার অর্দ্ধেক ঢাকা; কালো রেশমের মতন চুলগুলি শুভ্র

সুন্দর কপালখানির উপর ফুরফুর করিয়া উড়িতেছে। একগাছি করিয়া সরু সোনার চুড়ি সর্ব্বাঙ্গে দিয়া সুগোল মণিবন্ধটি আলিঙ্গন করিয়া আছে।

এ-সব দেখিয়া শুনিয়া খুড়িমার মন মালতীর প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। গরিবের মেয়ের এত রূপই বা কেন, আর এত সাজসজ্জাই বা কিসের জন্য? কিন্তু তিনি একবার ভাবিয়া দেখিলেন না যে ইহার জন্য মালতী একটুও দায়ী নহে—গরিব বাঙালী বিধবা বলিয়া বিধাতা তাকে রূপ যৌবন স্বাস্থ্য দিবার বেলা একটুও কৃপণতা করেন নাই, এবং মালতীর পিতামাতা তাঁদের একমাত্র সন্তানকে একেবারে বিধবার সর্ব্বশূন্য রিক্ত বেশ পরাইতে পারেন নাই! মালতী অভ্যাসের বশেই রূপ ও বেশ লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহা যে কারো বিরাগ ও কৌতূহলের কারণ হইতে পারে তাহা সে মনেও করে নাই।

নবকিশোর প্রণাম করিয়া সরিয়া গেলে মালতী অগ্রসর হইয়া তার মাসিমাকে প্রণাম করিল, কিন্তু এবার সে পায়ের ধূলা লইবার চেষ্টা করিল না। মেয়েটার এই ভব্যতার অভাব ও অহঙ্কার দেখিয়া খুড়িমার মন অধিকতর বিরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি শুষ্ক কঠোর স্বরে শুধু বলিলেন—এস।

৮

মালতী খুড়িমার ঘরে গিয়াই বলিল—মাসিমা, আমায় একখানা কাপড় দাও ত।

—এখন কাপড় কি করবি? নাইবি নে?

—নাইব ত। নাইবার ঘর কোন্ দিকে?

—এ কি তোর কল্‌কেতা যে ঘরের মধ্যে জলের কল আছে? পুকুর ধর্‌বার মতো ঘর ত হয় না।

মালতী এ বাড়ীতে আসিয়া এতক্ষণে হাসিল। সে হাসি চাপিয়া বলিল—পুকুর নাইবা ধর্‌ল; পুকুরজলের ঘড়া ধর্‌বার মতন ঘর ত আছে।

—তোলাজলে নাইবি কি? চ পুকুর দেখিয়ে দিয়ে আসি?

—না মাসিমা, আমি চাকর-বাকরদের সাম্‌নে পুকুরে নাইতে পার্‌ব না।

—পুকুরে নাইবি নে ত তোকে জল তুলে দেবে কে? তোর মাসির চোদ্দটা চাকরদাসী আছে কি না?

—আমাকে পুকুর দেখিয়ে দেবে চল, আমি জল তুলে আন্‌ছি।

খুড়িমা বিস্মিত হইয়া বলিলেন—তুই জল তুল্‌বি, কি বলিস্?

—তুল্‌লামই বা। আমাদের যখন চাকরদাসী নেই, তখন নিজের কাজ নিজে কর্‌লামই বা?

খুড়িমা জোরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন—না না, ওসব ছোটলোকপনা এখানে খাট্‌বে না। এ জমিদারের বাড়ী, এখানকার আদবকায়দা মেনে তোকে চল্‌তে হবে। এম্‌নিই ত তোর জন্যে যতদূর মাথা হেঁট হবার তা হয়েছে……

মালতী হাসিয়া বলিল—এ ত ভারি চমৎকার জমিদারী আদবকায়দা দেখ্‌ছি। পুরুষের সাম্‌নে নাইতে লজ্জা নেই, আবরুর জন্যে জল তুল্‌লেই মর্য্যাদা নষ্ট!

মালতীর হাসি ও পণ্ডিতপনা দেখিয়া খুড়িমার পিত্ত জ্বলিয়া গেল। রুক্ষ স্বরে বলিলেন—এক দণ্ডেই তুই যে জ্বালাতন কোরে তুল্‌লি দেখ্‌ছি। বারো মাস ত্রিশ দিন তোকে নিয়ে আমার কেমন কোরে চল্‌বে!

আবার সেই হাড়জ্বালানো হাসি হাসিয়া মালতী বলিল—তা কিছু ভেবো না মাসিমা। দুদিন একত্তরে থাক্‌লেই আমার চালচলন

তোমাদের সয়ে যাবে, আর তোমাদের আদবকায়দাও আমার অভ্যাস হয়ে আস্‌বে।

এই কথায় খুড়িমা অত্যন্ত জ্বলিয়া উঠিয়া গনগন করিতে লাগিলেন, মালতীকে কি যে বলিবেন তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না। মালতী বুঝিল যে তিনি রাগিয়াছেন। তখন সে বলিল—তবে মাসিমা, একখানা আমায় কাপড় দাও; ঘাট থেকে ভিজে কাপড়ে আমি কিছুতেই আস্‌তে পার্‌ব না।

এই রফায় কথঞ্চিৎ নরম হইয়া খুড়িমা বলিলেন—বাক্সের চাবি দে, কাপড় বার কোরে দি।

—আমার বাক্সয় সব পেড়ে কাপড়। পেড়ে কাপড় আর পর্‌ব না। তোমার একখানা থান কাপড় দাও মাসিমা।

খুড়িমা খুসী হইয়া কাপড় আনিতে গেলেন। মালতী হাতের চুড়ি খুলিয়া বাক্সে রাখিল।

বিধবার বেশে মালতীর নূতনতর শ্রী উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

স্নানাহারা নিষ্পন্ন হইয়া গেলে খুড়িমা মালতীকে বলিলেন—যা রাণী-দিদির কাছে গিয়ে বস্ গে। সদাসর্ব্বদা তাঁরই কাছে থাক্‌বি, মন জুগিয়ে সেবা যত্ন কর্‌বি, বুঝলি?

গিন্নির প্রসাদ অর্জ্জনের আশায় মালতী যাত্রা করিল।

গিন্নি আহারান্তে শয়ন করিয়া আছেন। রোহিণী ও হাবার-মা পদসেবা করিতেছে। বিছানার একপাশে বসিয়া বিনোদ ও বিনি ইক্‌ড়িমিক্‌ড়ি খেলিতেছে। গিন্নি স্মিতমুখে পুত্রকন্যার অর্থহীন খেলা দেখিতেছিলেন। সহসা দৃষ্টির সম্মুখে আবির্ভূত হইল মালতী। গিন্নির মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল। তিনি গম্ভীর হইয়া চক্ষু নত করিয়া রহিলেন।

মালতী এই উপেক্ষা সহ্য করিয়াও গিন্নির পদসেবার ভাগ লইবার জন্য রোহিণীর পাশে বিছানায় বসিতে যাইতেছিল। গিন্নি একেবারে—হাঁ হাঁ হাঁ, কর কি—বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন। মালতী থতমত খাইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল।

গিন্নি বলিলেন—ও কাপড়ে বিছানা ছুঁয়ো না বাছা।

মালতী অপ্রতিভ হইয়া বলিল—এ কাপড় ত ভালো মাসিমা; আমি নেয়ে মাসিমার কাচা কাপড় পরেছি।

—কাচা কাপড় হলে কি হয়, ঘাগরা ত পরেছ। ঘাগরা পোরে তুমি আমাদের কোনো জিনিষপত্তর ছুঁয়ো না বাছা, বলে রাখছি!

মালতীর যেন মাথা কাটা যাইতেছিল। থাকা ও যাওয়া দুইই তখন তার দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। মালতী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া-থাকিয়া আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। গিন্নি আর-একটি কথাও তাকে বলিলেন না। রোহিণী মজার গন্ধ পাইয়া মালতীর অনুসরণ করিল।

এক ঘরে ক্ষমা, মোক্ষদা, পাঁচুর মা, জয়া প্রভৃতি কয়েকটি পুরস্ত্রী একখানি গালিচা বিছাইয়া দশপঁচিশ খেলিতেছিল। এরা জমিদারের পরিবারভুক্ত আশ্রিত; কারো সহিত সামান্য সম্পর্ক আছে, কেউ কেউ বা একেবারে নিঃসম্পর্ক। সকলেই সধবা; বিধবা কেবল জয়া। অনাথা বিধবা দেখিয়া হরিবিহারী যখন তাকে নিজের অন্তঃপুরে আশ্রয় দেন তখন গিন্নি অনেক আপত্তি ও অশ্রুজল বৃথা ব্যয় করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে এখন তাঁর সহিয়া গিয়াছে; কিন্তু বিপিন তাকে এখনো দেখিতে পারে না। অপর রমণীরা কেউ গিন্নির বাপের বাড়ীর গ্রামসম্পর্কে আত্মীয়, কেউ বা শ্বশুরবাড়ীর সুবাদে আত্মীয়; তাদের স্বামীরা জমিদার-দর্‌কারে গোমস্তাগিরি ও নেশাভাঙ করে, এবং এরা সমস্ত দিন অকাজে গুল্‌তান করিয়া কাটায়!

মালতী সেই ঘরের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া ক্ষমা বলিল—জয়া-পিসি, ঐ মালতী-ছুঁড়ি যাচ্ছে, ওকে ডাকো ডাকো।

জয়া ডাকিল—ওগো ও মালতী, এই দিকে একবার পায়ের ধূলো না হয় পড়লই।

মালতী শান্তশীতল চন্দ্রকিরণের মতন আপনার চারিদিকে সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া নিঃশব্দ ললিত গতিতে ধীরে ধীরে সেই ঘরে প্রবেশ করিল। বধূরা তাড়াতাড়ি একগলা ঘোমটা টানিয়া হাতের দানের কড়ি ফেলিয়া আড়ষ্ট হইয়া বসিল; ঝিউড়িরা অবাক হইয়া মালতীর মুখের দিকে চাহিয়া নিজেদের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল।

তাকে ডাকিয়া আনিয়া সকলে মাছের চোখের মতন ভাবহীন দৃষ্টিতে তাকে দেখিতেছে দেখিয়া মালতীর অত্যন্ত হাসি আসিল। কেউই কিছু বলে না দেখিয়া সে বলিল—তোমারা খেলনা ভাই। আমায় দেখে অত লজ্জা কর্‌লে চল্‌বে কেন? অমি ত এখন তোমাদেরই একজন।

কারো কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। কেবল জয়া বলিল—বসো।

মালতী মাটিতে বসিল। জয়া বলিল—ওখানে কেন, ওখানে কেন? গাল্‌চের ওপর উঠে বসো না ভাই।

মালতী হাসিয়া বলিল—না, আমি বেশ আছি। আমি ম্লেচ্ছ মানুষ, তোমাদের আবার ছুত-টুত হবে।

লোককে ম্লেচ্ছ বলিয়া নাক সিঁট্‌কানো যায়, কিন্তু সে যখন সেই নিন্দা গায়ে পাতিয়া লয় তখন অপ্রতিভ হইয়া পড়িতে হয়। মনুষ্যধর্ম্ম তখন সমাজধর্ম্মের চেয়ে বড় হইয়া দেখা দেয়ই। জয়া মালতীর কথায় লজ্জিত হইয়া বলিল—না না, গাল্‌চের আসনে দোষ নেই—শাস্তরেই আছে বৃহৎকাষ্ঠে গজপৃষ্ঠে দোষ নাস্তি।

মালতী হাসিয়া বলিল—শাস্তরের কি মতিগতি ঠিক আছে? বিধানও দেয়, বারণও করে। কোন্‌টা মানা যাবে? কাজ কি ভাই গণ্ডগোলে, আমি তফাতেই থাকি। তোমরা খেল, আমি দেখি।

ক্ষমা বলিল—তুমিও খেল্‌বে এস না।

—আমি খেল্‌তে জানি নে।

—কেবল পড়্‌তেই জান?

হ্যাঁ ঐটেই যে শুধু একটু শিখেছি। তোমরা শেখালে খেল্‌তেও পারব।

পাঁচুর মা তুই আঙুলে ঘোম্‌টা ফাঁক করিয়া মোক্ষদার কানের কাছে মালতী শুনিতে পায় এমনতর স্পষ্ট অথচ চাপা গলায় বলিল—ওমা! কি ঘেন্না! কি লজ্জা! মেয়েমানুষ পড়্‌তে পারে তা আবার বড় গলা কোরে বলা হচ্ছে! এই জন্যেই ত বিধবা হয়েছে, লক্ষ্মী ছায়া মাড়াচ্ছেন না, পরের দুয়ারে মাঙ্‌তে আসতে হয়েছে! মেয়েমানুষের কি এত অনাচার সয় গা?······আচ্ছা জিজ্ঞাসা কর্ না ভাই, ও গান গাইতে পারে?

মালতী হাসিয়া বলিল—তুমিই জিজ্ঞাসা করো না কেন। আমি তোমাদের সমবয়সী, আমার সঙ্গে কথা বল্‌তে এত লজ্জা।

পাঁচুর মা মুখ ঘুরাইয়া জনান্তিকে বলিল—আ মরণ! ওঁর মতন ত আমি বেহায়া নই!

মোক্ষদা এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিল—তুমি গান করতে পারো ভাই?

মালতীর মুখের হাসি মিলাইয়া গিয়াছিল। বলিল একটু একটু পারি।

ক্ষমা গালে হাত দিয়া চোখ পাকাইয়া বলিল—ওমা! তুমি দেখ্‌ছি একেবারে খৃষ্টান!

—কেন খৃষ্টান কিসে হলাম? তোমরা কি বাসরঘরে গিয়ে গাও না?

ক্ষমা গাল ফুলাইয়া বলিল—সে বাসরঘর এক, আর সাধে সুখে গান গাওয়া আর। দুটো কি সমান হল?……আচ্ছা, তোমরা পুরুষের গলা ধোরে নাচো?

মালতীর মুখ লাল হইয়া উঠিল। মালতী ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

মালতী ঘরের চৌকাঠ পার হইতে না হইতে সকলে সমস্বরে হাসিয়া উঠিল, যেন এমন কৌতুককর জীব জন্মে তারা দেখে নাই।

পাঁচুর মা ঘোম্‌টা খুলিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিল—বাবাঃ আচ্ছা মেয়ে যা হোক! কি দেমাক্!

ক্ষমা বলিল—রূপের দেমাক্ রে রূপের দেমাক্! পাছে রূপ ঢাকা পড়ে তাই মুখের ওপর একরত্তিও ঘোম্‌টা টানা হয় না! রূপ যেন আর কারো হয় না!

জয়া বিজ্ঞভাবে বলিল—রূপ দেখিয়েই ত ওসব লোকের পশার!

মোক্ষদা এতক্ষণ চুপ করিয়া সকলের মন্তব্য শুনিতেছিল। সুন্দর মুখ সোনার কাঠির মতন নিজের চারিদিকের সুপ্ত সৌন্দর্য্যকে জাগাইয়া তোলে। মালতীর অপরূপ রূপ এই-সব রূপহীনাদের মনের মধ্যে বড় বেশী রকম জাঁকাইয়া বসিয়াছিল, নিজেদের পরাভব অত্যন্ত তীব্রভাবে লজ্জা দিতেছিল বলিয়াই, সেই অপরাজিত রূপকে মুখে অস্বীকার করিবার জন্য এদের এত আগ্রহ! মোক্ষদা উহারি মধ্যে দেখিতে নেহাৎ মন্দ নয়। তাই সে মালতীর রূপ একেবারে অস্বীকার করিতে পারিল না। বলিল—তা যা বলিস্ ভাই, দেখ্‌বার মতন রূপ বটে! মেয়ে ত নয়,

যেন একখানি ছাঁচ? এমন দুধে-আল্‌তার মতন রং কখনো দেখিনি! গালে টুস্‌কি মার্‌লে বোধহয় রক্ত ফেটে পড়ে!

পাঁচুর মা অবজ্ঞাভরে বলিল—দূর! তুই যেমন ন্যাকা! গালে রং মেখেছে······সেই দেখিস্‌ নি সেবার বিনির ভাতের সময় ব্যাঙ্গল থেটার এসেছিল, যে মাগী রাধিকে সেজেছিল তাকে কত সুন্দর দেখাচ্ছিল। দিনের বেলা যখন অন্দরে বেড়াতে এল দেখি ওমা সে কী কালো, কী কুচ্ছিত, পঞ্চাশ বছরের বুড়ি! সে যে সে, তা মনেই হয় না······

পাঁচুর মার কথায় বাধা দিয়া মোক্ষদা বলিল—তা যা বল বৌ, রঙে কৃত্রিম করতে পারে, গড়নে ত আর কৃত্রিম চলে না। কী নিখুঁত গড়ন!

পাঁচুর মা ফোঁস করিয়া বলিয়া উঠিল—ছাই গড়ন! অমন সেজেগুজে থাক্‌লে আমাদেরও সুন্দর দেখায়।

জয়া বলিল—হাঁ লা মোক্ষদা, ছিরিটা দেখ্‌লি তুই কোনখানে। চোখ দুটো তো গরুর চোখের মতন ড্যাবড্যাব কর্‌ছে, যেন ঠিক্‌রে বেরিয়ে আস্‌চে······

ক্ষমা বলিল—নাকটা তো স্থর্পনখার মতন আধ হাত লম্বা······

পাঁচুর মা হাসিয়া মোক্ষদার দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিল—সর্ব্ব দোষ হরেৎ গোরা!

মালতী যে অতি কুৎসিত, ঠকাইয়া সে আপনাকে সুন্দর বলিয়া চালাইতেছে, তাতে আর সন্দেহ রহিল না। তখন মোক্ষদা সে প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য বলিল—একদিন মালতীর গান শুন্‌তে হবে।

পাঁচুর মা বলিল—তার আবার কি? ও ত গান গাইবার জন্যে মুখিয়েই আছে। কথায় বলে—ওরে ক্ষ্যাপা ভাত খাবি, না হাত ধোব কোথায়?······ক্ষ্যামা ঠাকুরঝি, যা না ভাই মালতীকে ধোরে আন্‌ না।

—সে কি ডাক্‌লে এখন আস্‌বে? তার চেয়ে চ আমরাই তার কাছে যাই।

—সেখানে যদি খুড়িমা থাকেন?

—এখন খুড়িমা কোথায়? তিনি এখনো ঠাকুরঘরে, নয়ত হবিষ্যি চড়িয়েছেন।

তখন সকলে মিলিয়া মালতীর সন্ধানে যাত্রা করিল।

মালতী আপনার ঘরে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়া যাদের আচরণের কথা ভাবিতেছিল তাদেরই আবির্ভাবে বিরক্ত হইয়া তাড়াতাড়ি সে উঠিয়া বসিল। সে তাদের দিকে চাহিতে বা কোনো কথা বলিতে পারিল না।

ক্ষমা বলিল—তুমি ভাই আমাদের ওপর রাগ কোরে চোলে এলে, তাই আমরা তোমার কাছে ঘাট মান্‌তে এলাম।

মালতী কুণ্ঠিত দৃষ্টি তাদের দিকে তুলিয়া ধরিয়া বলিল—ওকি কথা ভাই, আমার কাছে ঘাট মান্‌বে কি? আমি রাগ করিনি।

মোক্ষদা হাসিয়া বলিল—আচ্ছা, রাগ করোনি বুঝ্‌ব যদি তুমি একটা গান করো।

মালতী মুস্কিলে পড়িল। এদের কাছে গান করিতেও তার প্রবৃত্তি হইতেছিল না, গান না করিলেও তার রাগ করা স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। একটু ভাবিয়া মালতী বলিল—আমার গান তোমাদের ভালো লাগ্‌বে না, শেষকালে তোমরা আমায় ঠাট্টা কর্‌বে।

ক্ষমা বলিল—না না, ঠাট্টা কর্‌ব কেন? তোমায় একটি গাইতেই হবে।

মালতী লজ্জিত ও বিরক্ত হইয়া বলিল—গান গাওয়া থাক ভাই, ও ঘরে রাণী-মাসিমা আছেন, মাসিমা এখুনি আস্‌বেন, ওঁরা শুন্‌তে পেলে কি বল্‌বেন?······

ক্ষমা বলিল—না না, তোমার বাজে ওজর আমরা শুন্‌ব না! খুড়িমা কোথায় তার ঠিক নেই, তাঁর ওপরে আস্‌তে সেই যার নাম তিনটে। রাণী-মাসিমা এতক্ষণ ঘুমুচ্ছেন, আর আমরা দরজা বন্ধ কোরে দিচ্ছি……

মালতী আজই সবে এ বাড়ীতে আসিয়াছে। এ বাড়ীর যারা পুরাতন বাসিন্দা তারা যে তাকে অভ্যর্থনা করে নাই, পরিচয় জিজ্ঞাসা করে নাই, একটা মামুলি ভদ্রতার কথা পর্য্যন্ত বলে নাই, এবং তারাই যে এখন তাকে অপরিচয় সত্ত্বেও বিনা ভূমিকায় গান করিবার জন্য জেদ করিতেছে, তারা যে তাকে একটি কৌতুককর জীব মনে করিতেছে, এতে মালতীর মন অত্যন্ত বিরক্ত ও সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল। গান গাহিবার প্রবৃত্তি তার কিছুতেই হইতেছিল না।

মালতী অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—তোমরা জেদ কর্‌ছ তাই একটা গাচ্ছি। কিন্তু আর গাইতে বোলো না।

জয়া বলিল—আগে একটা গাওই ত, তারপর আর বল্‌ব কি না সে পরে বোঝা যাবে।

মালতী মাথা নত করিয়া মৃদু গুঞ্জনে গাহিতে লাগিল—

"আরো আঘাত সইবে আমার সইবে আমারো।
আরো কঠিন সুরে জীবন-তারে ঝঙ্কারো।"

মালতীর সমস্ত অন্তরের প্রার্থনা যেন এই গানে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিল। তার মধুর বিকম্পিত করুণস্বরের অনুরণনে ঘরখানি ভরিয়া গেল। এক দণ্ড সকলে মুগ্ধ স্তব্ধ নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে নিশ্বাস ফেলিয়া মোক্ষদা বলিল—বাঃ! কি গলা তোমার ভাই!

তখন একে একে সকলের মুখ খুলিল। ক্ষমা বলিল—হ্যাঁ, গলাটি মন্দ নয়, কিন্তু গানটা ছাই, শুধু কথার হেঁয়ালি। নিধুবাবু কি গোপালে

উড়ের টপ্পা জানো না তুমি? একটা কি ছাই গান যে গাইলে। একটা বেশ ভালো দেখে টপ্পা গাও।

পাঁচুর মা বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐটি গাওনা, ঐ যে কি ভালো মনে আস্‌ছে না—মনে কোরে দে-না ভাই ঠাকুরঝি, সেই যে সেই খেম্‌টাওলিরা সেবার গেয়েছিল······

ক্ষমা বলিল—কোন্‌টা? সেই—

"ভাঙা বাগান জোগান দেওয়া ভার, ফুলে নেই বাহার!"

সেইটে!

পাঁচুর মা চোখ মট্‌কাইয়া মুচকি হাসিয়া মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া বলিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐটি গাওনা ভাই।

মালতীর মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে গম্ভীর হইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আমি ওসব গান জানিনে।

মোক্ষদা বলিল—আচ্ছা, ভাই, তুমি যা জানো তাই আর-একটি গাও।

মালতী দৃঢ়স্বরে বলিল—আমি ত আগেই বোলে রেখেছি, আর আমি গাইব না।

জয়া বলিল—তোমার যে একেবারে ধনুকভাঙা পণ দেখ্‌ছি গো!

ক্ষমা বলিল—কেন গো, গরব হল না কি?

পাঁচুর মা বলিল—সেই সেবার কল্‌কেতা থেকে খেম্‌টাওলিরা এসেছিল, তাদের যত গান ফরমাস কর্‌তাম ততই ত গাইত। বল্‌লে না পেত্যয় যাবে ভাই, তাদের একজন ঠিক তোমার মতন ছিল দেখ্‌তে, হুবহু, গালের ঐ তিলটি পর্য্যন্ত। কেমন ঠাকুরঝি, সত্যি কি না?······

অপমানে মালতীর চোখ জলে ভরিয়া আসিল। তার সমস্ত দেহমন যেন অশুচি স্থানে পড়িয়া সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল! মালতী দৃঢ় পদে ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

ক্ষমা, পাঁচুর মা কত ডাকিল, মালতী একবার ফিরিয়াও চাহিল না। পাঁচুর মা নাক সিঁটকাইয়া বলিল—ছুঁড়ির ঠ্যাকার দেখেছিস্ একবার? তবু যদি নিজের চাল চুলো কিছু থাকৃত!

জয়া বলিল—নষ্ট লোকের মুখ টন্‌কো—কথাতেই বলে। দেখিস্‌নি ছোটতরফের কালীতারাকে? বিধবা মাগী ছোটবাবুর কাছে এসে বেশ আছেন, কিন্তু কেউ একটু কিছু বল্‌লেই অম্‌নি তাঁর মানে ঘা পড়ে!

পাঁচুর মা বলিল—হ্যাঁ জয়া মাসি, কালীতারার নাকি ছেলে হবে? ওমা কি ঘেন্না!

ক্ষমা বলিল—উনি বল্‌ছিলেন যে নিবারণ মুখুজ্জে আর কালীতারার ভাসুর রঘুনাথ দেওয়ান চুপচাপ সব ঢেকে ফেল্‌তে ছোটবাবুকে পরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু কালীতারা কিছুতেই রাজি হচ্ছে না।

মোক্ষদা দয়ার্দ্র স্বরে বলিল—অমন নিষ্ঠুর কাজে রাজি কি হওয়া যায় দিদি! এখনো ত পেটে ধরোনি; যখন ধর্‌বে তখন জান্‌বে ছেলের কি দরদ।

এই কথা শুনিয়া সকলের মনই একটি স্নেহার্দ্র বেদনায় পরিপূর্ণ হইয়া নিজেদের নারীত্ব উপলব্ধি করিল। অল্পক্ষণ কেহ কোনো কথা বলিতে পারিল না।

পাঁচুর মা হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিল—তা যেন হল, কিন্তু অত বড় মানী লোকটা ছোটবাবু, তার ত মান বাঁচাতে হবে।

জয়া বলিল—সেইজন্যে ত ছোটবাবু বলেছে যে কালীতারা তার কথা না শুন্‌লে তাকে বাড়ী থেকে দূর করে তাড়িয়ে দেবে।

মোক্ষদা ব্যথিত হইয়া বলিল—আহা বেচারি, তা হলে কোথায় দাঁড়াবে? ওর ভাসুর দেওয়ানি পাবার জন্যে ওকে ছোটবাবুর কাছে এনে দিয়েছে। বিধবা হয়ে অবধি ভাসুর আর জায়ে ওর কি কম

খোয়ারটা করেছে। ঘরকন্নায় দাসীর মতন খাটিয়ে এক মুঠো খেতে দিত না, একখানা পর্‌তে দিত না, মার্‌ত পর্য্যন্ত। এখন ছোটবাবু তাড়িয়ে দিলে ওরা কি আর ঘরে ঠাঁই দেবে ?

জয়া বলিল—তা ওর যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি ফল হবে।

মোক্ষদা ব্যথিত স্বরে বলিল—না না, অমন নিষ্ঠুর কথা বোলো না জয়া পিসি। ও কি অম্‌নি ছোটবাবুর কাছে এসেছিল ? ছোটবাবু বিদ্যাসাগরের মতে বিয়ে করবে স্বীকার করাতে তবেই এসেছিল। আহা ও ছোটবাবুকে কী ভালোটাই না বাসে! ছোটবাবু চোলে যায়, ওর মনে হয় বুঝি পায়ে বাজ্‌ছে, পায়ের তলায় বুক পেতে দিতে পার্‌লে তবে যেন ওর মনের খেদ মেটে। সেবার ছোটবাবুর ব্যামো হতে আহার নিদ্রে ছেড়ে কি সেবাটাই কর্‌লে—ছোটরাণী-বৌ তার সিকিও করেনি। কালীতারা ত ছোটবাবুকে নিজের সোয়ামী বোলেই জানে। পুরুতে দুটো মন্তর পড়ালেই কি শুধু বিয়ে হয় ? সত্যি কথা বল্‌তে কি, আমরা আমাদের সোয়ামীকে অমন কোরে ভালোবাস্‌তে পারিনি। তবু আমরা সতী, আর কালীতারা অসতী!

জয়া মুখ নাড়িয়া বলিল—ও-সব ঢং লো ঢং! নষ্ট মেয়েদের ঐ-রকম লোকদেখানি ভালোবাসা, নইলে ওদের চল্‌বে কেন ?

জয়ার কথা শুনিয়া মোক্ষদা চটিয়া গিয়া বলিয়া ফেলিল—হাঁ তা হবে, নষ্ট মেয়েদের স্বভাব কেমন তা আমরা কেমন কোরে জান্‌ব, তোমার জানা থাকা সম্ভব।

—কী! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! মোক্ষদা পোড়ারমুখীকে আমি আজ দেখে নেব, এই চল্‌লাম আমি রাণী-বৌয়ের কাছে।—বলিয়া জয়া ফরফর করিয়া চলিয়া গেল।

রোহিণী নূতন মজার সন্ধানে জয়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল।

মোক্ষদা ভয়ে মুখ মলিন করিয়া বলিল—কি হবে ভাই? দিদি, যা না ভাই, ওকে ফিরিয়ে আন।

ক্ষমা হাসিয়া বলিল—তুই ক্ষেপেছিস! ও মুখেই আস্ফালন কোরে গেল, কাউকে কিছু বল্‌বে না! ওর কি বল্‌বার মুখ আছে, না, রাণীমাসি ওর স্বভাব-চরিত্তিরের কথা জানে না। তবু, চ দেখিগে······

সকলে জয়াকে শান্ত করিতে ছুটিল।

মালতী বিরক্ত হইয়া পুরস্ত্রীদের কদর্য্য আলোচনা পরিহার করিয়া আসিয়াছিল বটে, কিন্তু রোহিণীর কৃপায় তাদের বাকি আলাপটুকু শুনিতে বাকি রহিল না। কালীতারার কাহিনী শুনিয়া একদিকে কালীতারার প্রতি করুণায় তার মন ভরিয়া উঠিতেছিল, অপরদিকে সমস্ত জমিদারপরিবারটির স্ত্রী পুরুষ সকলেরই চরিত্রের এমন একটা অভদ্র ছাপের পরিচয় সে পাইতেছিল যে সকলের প্রতি ভয় অবিশ্বাস ও ঘৃণায় তার মন শিহরিয়া উঠিতেছিল। এখন সে বিপিনের গৃহে প্রত্যাগমনের সম্ভাবনাকেও প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না। সে ভয়ে ভয়ে আপনাকে সকলের সংস্রব হইতে সর্ব্বপ্রযত্নে দূরে রাখিতে লাগিল।

মালতী যে এই বাড়ীর দশজনের একজন হইয়া মিশিয়া যাইতে পারিতেছে না, সে যে সতন্ত্র থাকিয়া সকলের মনের সাম্‌নে স্পষ্ট হইয়া থাকিতেছে, এর জন্য খুড়িমা তার প্রতি বিরক্ত হইতে লাগিলেন। একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির মালতীর আগমনে জমিদারপরিবারের অভ্যস্ত জীবনযাত্রা-প্রণালীতে যে একটু বিপরীত বেসুর বাজিয়া উঠিয়াছিল তার জন্য মালতীর সঙ্গে সঙ্গে খুড়িমাও বিশেষ করিয়া সকলের আলোচনার

পাত্রী হইয়া পড়িয়াছিলেন। এজন্য খুড়িমা কিছুতেই মালতীর প্রতি আপনার মনটিকে প্রসন্ন বাধামুক্ত করিয়া তুলিতে পারিতেছিলেন না; মালতী সর্ব্বদা তাঁর কাছে খোঁচা খাইয়া খাইয়া বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল, সে মাসিমাকে ভক্তিশ্রদ্ধায় আপনার জন বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছিল না। মাসিমাকে তার যেন জেলখানার প্রহরীর মতন মনে হইতে লাগিল; এবং এই-সমস্ত অপমান ও লাঞ্ছনার জন্য মনে মনে সে তার মাসিমাকেই দায়ী করিতে লাগিল, যেন তিনিই তাকে জোর করিয়া বা ঠকাইয়া এ বাড়ীতে আনিয়া বন্দিনী করিয়াছেন।

মালতীর অভিমানী ও তেজস্বী প্রকৃতি সকলের নিকট অনাদর ও আঘাত পাইতে পাইতে বিদ্রোহে উদ্যত বজ্রের মতন কঠিন একগুঁয়ে হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে সে কারো প্রতি দৃক্‌পাত করাও আর আবশ্যক মনে করিল না; সে নিজের খেয়াল-মতো পূরামাত্রায় স্বাধীনভাবেই চলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। তার এই উদ্ধত বিদ্রোহ লোককে যতই তার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে লাগিল, তার রোকও ততই বাড়িয়া চলিল।

বিদ্রোহী হইয়া সর্ব্বদাই যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত থাকিয়া শত্রুপক্ষকে ভয় দেখাইয়া হঠাইয়া রাখা চলে, কিন্তু তাতে নিজেরা নিশ্চিন্ত হইয়া আরাম করিবার উপায় থাকে না। চৌধুরীপরিবারের ঘরকন্নার কর্ম্মের বাহিরে পড়িয়া মালতী একাকী নিজেকে লইয়া বিব্রত হইয়া উঠিতে লাগিল। সে নিজের বাড়ীতে থাকিতে সমস্ত দিন পিতামাতার সেবা করিয়া, পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াইয়া, বৌঝিদের শিল্প সেলাই শিখাইয়া, গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া আপনাকে আপনি বোধ করিবার অবকাশ পাইত না। এখানে আপনার কাছে আপনি সে বড় স্পষ্ট হইয়া পড়িতেছিল এবং তার অন্তরে যে সেবাপরায়ণা কল্যাণী নারী-প্রকৃতি ছিল

তাহা অবলম্বনের অভাবে অহরহ আর্ত্তনাদ করিতেছিল। মনের সব ইচ্ছা জোর করিয়া চাপিয়া মারিতে মারিতে তার মনও বোবা হইয়া উঠিতেছিল, সে নিজের মনের মধ্যে আনন্দের তৃপ্তির অভয়ের তেমন অসঙ্কোচ সাড়া আর পাইতেছিল না। তখন তার সেই নিরুপদ্রব নির্জ্জন গৃহখানির স্মৃতি মনের মধ্যে জাগিয়া জাগিয়া হায় হায় করিয়া উঠিতে লাগিল। সেখানে তার কেউ ছিল না; তা না থাকুক, সেখানে পুস্তকের সাহচর্য্য ত কেহ নিবারণ করিতে আসিত না। এখানে এই বাণীর সপত্নীমন্দিরে তাঁর আসন-শতদলের পাপ্‌ড়ি ত একটিও খসিয়া পড়িতে পারে না; যদি বা কখনো পড়ে, লক্ষ্মীর অসংখ্য বাহনের তীক্ষ্ণ নখচঞ্চুর প্রহারে তাহা অধিকক্ষণ টিকিতে পারে না। মালতীর জেদ হইল অসাধ্য-সাধন করিতে হইবে—লক্ষ্মীর মন্দিরে বসিয়া লক্ষ্মীর বাহনদের দেখাইয়া দেখাইয়া বাণীর আসন-শতদল এখানেই বিছাইতে হইবে।

মালতীর সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেলে গর্ভস্থ ভ্রূণের ন্যায় তাহা কার্য্যে পরিণত হইবার জন্য তাকে পীড়া দিতে লাগিল। একদিন সে দেখিল বিপিনের ঘরে সারি সারি আল্‌মারিতে অসংখ্য বই সাজানো আছে। কিন্তু বিপিন ত বাড়ীতে নাই। সে কার নিকট হইতে এই আনন্দরাজ্যে প্রবেশের অধিকার পাইবে? নবকিশোর ত বিপিনের বন্ধু, সে কি কিছু ব্যবস্থা করিতে পারে না? বিপিনের লাইব্রেরীতে অধিকার যদি সে দিতে না-ই পারে, সে নিজে ত আপাতত কিছু বই সংগ্রহ করিয়া দিতে পারে। মালতী নবকিশোরের সাক্ষাৎ লাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

মালতীকে আনিয়া অবধি নবকিশোর অন্দরে কদাচিৎ আসে; আসিলেও মালতীর সঙ্গে দেখা করে না। মালতীকে লইয়া জমিদারের অন্তঃপুরে যে বিষম আন্দোলন চলিতেছিল, তার যথেষ্ট আভাস নব-

কিশোর বাড়ীতে বসিয়াই পাইতেছিল ; তাতে সে মালতীর জন্য ক্লেশ অনুভব করিতেছিল বটে, কিন্তু তার কিছুমাত্র সাধ্য ছিল না যে সে কোনো প্রকার সাহায্য করিয়া মালতীকে রক্ষা করিতে পারে। সে কিঞ্চিৎ মাত্রও চেষ্টা করিলে মালতীর চারিদিকে যে কুৎসার কালি ছড়াইয়া পড়িবে, তাতে মালতীকে আরো ক্লেশ দেওয়াই হইবে। মালতীর নির্য্যাতনের সংবাদে সে নিজেই নিজের মনের মধ্যে উদ্ভিদ্যমান আগ্নেয়-গিরির মতন জ্বলিতেছিল, ফাটিয়া আপনাকে প্রকাশ করিয়া ধরিতে শুধু বিপিনের আসার অপেক্ষা। বিপিন আসিলে তাকে মালতীর রক্ষায় নিযুক্ত করিতে হইবে স্থির করিয়া বিপিনের প্রতীক্ষায় নবকিশোর ছটফট করিতেছিল। বিপিন ঘরের ছেলে; এক বাড়ীতে থাকিয়া সর্ব্বদাই মালতীর তত্ত্ব লওয়া তার পক্ষে কঠিন বা অশোভন হইবে না ; তাতে তারও নিন্দার সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে, কিন্তু ভরসা শুধু এই যে সহজে কেউ মুখ ফুটিয়া বিপিনের নামে কুৎসা রটনা করিতে পারিবে না।

মালতী কিন্তু বিপিনকে চেনে না। তার আগমনে বই পড়িতে পাইবার সুবিধার সম্ভাবনা থাকিলেও, তার অনুমতি লইবার জন্য নবকিশোর-কেই দর্‌কার হইবে। তাই নবকিশোরকে সংবাদ দিতে ইচ্ছা করিয়া একদিন সে তার মাসিমাকে বলিল—মাসিমা, তোমরা ত কোনো কাজকর্ম্ম আমায় ছুঁতে দাও না। সমস্ত দিন চোরের মতন এমন একলাটি মুখ বুজে কেমন কোরে বোসে থাকি বলো ত!

খুড়িমা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—তা আমি কেমন কোরো জান্‌ব দিন তোমার কেমন কোরে কাট্‌বে ? তুমি কি আমার বশে চল্‌ছ, যে, আমায় জিজ্ঞেস কর্‌তে এসেছ ? ঠ্যাকারে কারো সঙ্গে কথা কওয়া হয় না, কারো ত্রিসীমানায় যাওয়া হয় না ; ইচ্ছে-সুখে একলা থাক্‌বি, তার আমি কি কর্‌ব ?

মালতী বলিল—তা মাসিমা, তোমাদের বাড়ীর লোকগুলি যে রকমের, তাঁদের সঙ্গে মিলে মিশে চলা আমার কর্ম্ম নয়।

খুড়িমা তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিলেন—কিন্তু তোর জন্যে যে আমার শুদ্ধু খোয়ার হচ্ছে। উঠ্‌তে বস্‌তে সবাই আমায় ব্যঙ্গ কোরে বলে—মালতীর মাসি, মালতীর মাসি; আমার তোর কথা বল্‌তে হলে তখন আর তোর নামটা কারো মনে পড়ে না, বলে—খুড়িমার বোনঝি।

মালতী ব্যথিত হইয়া বলিল—এর সমস্ত দোষই কি আমার মাসিমা? আমায় তবে বেহালায় পাঠিয়ে দাও। এখানে এসে অবধি ত আমারও সোয়াস্তি নেই, তোমাদেরও সোয়াস্তি নেই!

খুড়িমা গম্ভীর হইয়া মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—আমি ত তোমায় এখানে আন্‌তে পাঠাই নি। তুমি ধিঙ্গি মেয়ে, আপনি নাচতে নাচতে এসেছ, আপনি আপনার মতে চল্‌ছ। যা খুসি তাই কর গে। আমি এ সবের কিছু জানি নে।

খুড়িমার এই অভিমান মালতী বুঝিতে পারিল না। সে একটু ঝাঁঝের সহিতই বলিয়া উঠিল—তুমিও যেমন আমায় আন্‌তে পাঠাও নি, আমিও তেম্‌নি আপনি ব্যস্ত হয়ে তোমাদের এই নরকের জেলখানায় আসিনি। আমাকে নিয়ে এসেছেন নবকিশোর-বাবু। তাঁকে ডাকিয়ে দাও, আমি তাঁর সঙ্গেই বোঝাপড়া করব।

খুড়িমা তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন—আ মর্ পোড়ারমুখী! এততেও তোর হায়া নেই? ধন্যি মেয়ে জন্মেছিলি তুই! উড়ে বস্‌তে পুড়ে যায়—এমন শতেকখোয়ারী তুই! কোথায় লজ্জায় মোরে থাক্‌বি, না আবার চোপা করা হচ্ছে!

মালতী কি বলিতে যাইতেছিল। উচ্ছ্বসিত চোখের জল দমন করিতে

গিয়ে সে-কথা আর বলা হইল না। এক বুক উচ্ছ্বসিত অশ্রুর মুখে সমস্ত শক্তি চাপা দিয়া সে পাষাণের মতো বসিয়া রহিল। তার একগুঁয়ে অভিমানী স্বভাব কেবল বাধার পর বাধা পাইয়া-পাইয়া প্রবল বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল; এখন সে যুদ্ধোন্মুখ, এখন তার কান্না শোভা পায় না। সে স্থির করিয়া লইল এখানে সে কারো কেউ নয়, তার যাহা করিবার আছে তাহা তাকে একলাই করিয়া তুলিতে হইবে। সে সকলকে উপেক্ষা করিয়া চলিবার সঙ্কল্প নীরবে মনের মধ্যে দৃঢ় করিয়া তুলিতে লাগিল।

খুড়িমা যদি একটু নরম হইয়া ভালো-মন্দের বিচার তারই উপর ছাড়িয়া দিতেন, তাহা হইলে মালতী কখনো কারো অপ্রীতিকর আচরণ করিতে পারিত না। কিন্তু খুড়িমা আবাল্য জমিদারের গৃহিণী, স্বামীর সোহাগিনী ছিলেন; শাশুড়ী-ননদের অধীনে কোনো দিন তাঁকে থাকিতে হয় নাই; তিনি হুকুম করিতেই অভ্যস্ত; তারপর অবস্থার ফেরে পড়িয়া পরাধীনতার দুঃখের বিরুদ্ধে নিষ্ফল আক্রোশে দগ্ধ হইতেছিলেন। এমন অবস্থায় তিনি এমন একজন লোককে নিকটে পাইয়াছিলেন যে শুধুই তাঁর বোনঝি নয়, তাঁর আশ্রিতও বটে। হুকুম করিয়া অধীনে দাবাইয়া রাখিবার মধ্যে যে একটি বিলাসিতার আনন্দ আছে, তার প্রলোভন খুড়িমা মালতীকে পাইয়া কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিতেছিলেন না।

এ দিকে মালতীও কখনো কারো অধীনে থাকিয়া হুকুম মানিয়া চলে নাই। সমবেদনায় করুণহৃদয় পিতামাতার স্নেহযত্নের শীতল ছায়ায় সে অবিরোধ স্বাধীন ভাবেই বিচরণ করিয়াছে। আজ অকস্মাৎ অচেনা অপ্রীতিকর পরিবেষ্টনের মধ্যে আটক পড়িয়া পদে পদে প্রতিরোধ সে কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিতেছিল না।

এইরূপে দুই দিক হইতেই বিরোধের ঝড় উদ্যত হইয়া একদিন ভীষণ সংঘাতে প্রলয় তুলিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

১০

নবকিশোর মালতীকে এক রকম জেদ করিয়া এখানে আনিয়া এই লাঞ্ছনার আবর্ত্তে ফেলিয়াছে; তার উপর, আসিয়া অবধি তার একবারও সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নাই, মালতী বাঁচিয়া আছে কি মরিয়া গেছে সে খবরটা পর্য্যন্ত না লইয়া সে পরম নিশ্চিন্ত হইয়া আছে; ইহা মালতীর কাছে নবকিশোরের অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সে নবকিশোরের নিশ্চিন্ত শান্তি ভঙ্গ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

এখন তাকে ডাকিয়া পাঠাইতে হইলে কোনো দাসীর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া ত উপায় দেখা যায় না। দাসীর সর্দ্দারণী রোহিণীকে কোনো অনুরোধ করিতে মালতীর প্রবৃত্তি হইল না। মালতী মনে করিল হাবার-মা যখন হাবার-মা, তখন সে হাবা না হোক ভালো মানুষ হওয়া সম্ভব; এই মনে করিয়া মালতী তাকে একদিন নির্জ্জনে পাইয়া মিনতির স্বরে বলিল—হাবার-মা, আমার একটু উপকার কর্‌তে পার্‌বে?

হাবার-মা উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি দিদিমণি?

—তুমি যদি একটু দয়া কোরে নবকিশোর-বাবুকে ডেকে দাও।

—এ আর বড় কথা কি দিদিমণি? এখুনি ডেকে আন্‌ছি।—বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

পথে রোহিণীর সঙ্গে দেখা। রোহিণী জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁলা হনহন কোরে কোথায় চলেছিস্?

—কোথায় আবার যাব? এই মালতী-দিদিমণি একবার দাদা-ঠাকুরকে ডেকে দিতে বল্‌লে তাই একবার ভট্‌চায্যি-বাড়ী যাচ্ছি।

—ও! দূতী হয়েছিস্!

হাবার-মা তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল—তুই দূতী হগে যা! তোর সাতগুষ্টি দূতী হোক্ গে! পোড়ারমুখীর যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!…যাই দেখিন রাণীমাকে বোলে দেই গে…

হাবার-মা আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল রোহিণী চটিল না; মুচকি হাসিয়া চোখ মট্‌কাইয়া বলিল—যা না, রাণীমাকে বোলে দেখ্ গে না, রাণীমা পূজো করবেন 'খন। মালতী ছুঁড়ি একজন পুরুষ-মানুষকে ডাকতে বল্লে আর তুই অম্‌নি ডাকতে ছুট্‌লি—রাণীমা টের্ পেলে তোকে মণ্ডা খাওয়াবে! ভাগ্যিস তোর আমার সঙ্গে দেখা হল, নইলে যে চাকরী যেত।

হাবার-মা একটু ভাবিয়া দেখিয়া ভীত হইয়া বলিল—সত্যিই ত! ভাগ্যিস তুই ডেকে জিজ্ঞেস কর্‌লি! যাই বলিগে—দিদিমণি, আমা দিয়ে এ কাজ হবে না।

রোহিণী বলিল—দূর নেকী। তাতে আর তোর বিপদ কাট্‌ল কৈ? রাণীমা যদি টের পায় যে হাবার-মাকে মালতী এই কথা বলেছিল কিন্তু হাবার-মা আমাকে কিছু জানায় নি, তখন রাণীমার কাছে কোন্ মুখে কি জবাব দিবি? তার চেয়ে এখনি রাণীমাকে সব কথা বল্‌গে যা—তা হলে তোর ওপর কোনো ঝুঁকিই পড়বে না।

হাবার-মা রোহিণীর বুদ্ধি-বিবেচনা দেখিয়া অবাক হইয়া বলিল—ঠিক বলেছিস্! তাই বলিগে তবে।

হাবার-মাকে গিন্নির কাছে নালিশ করিতে পাঠাইয়া দিয়া রোহিণী একছুটে মালতীর কাছে গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—দিদিমণি, করেছ কি, অ্যাঁ! এমন অল্প বুদ্ধি তোমার।

মালতী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—কেন, কি করেছি?

রোহিণী পরম ব্যথিত ভাবে কপালে চড় মারিয়া বলিল—করেছ আমার মাথা আর আমার মুণ্ডু! দাদাঠাকুরকে ডাক্‌তে চাও তা আমায়

ল্‌লে হত। আমায় ত তুমি দুচক্ষে দেখতে পারো না! তোমার বিশ্বাসের লোক হল কিনা হাবার-মা! সে ওদিকে রাণীমার কাছে গিয়ে সব বোলে দিয়েছে।

মালতী বিরক্ত হইয়া বলিল—বল্‌লেই বা! এর মধ্যে লুকোবার কি আছে?

রোহিণী গালে হাত দিয়া পরম বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল—অবাক করলে দিদিমণি! পুরুষ-মানুষকে ডেকে পাঠাবে কি গাঁয়ে ঢেঁট্‌রা পিটিয়ে! আমাদেরও এককালে সোমত্থ বয়েস ছিল বটে, কিন্তু এমন বুকের পাটা ছিল না বাপু!

মালতী ক্রোধে বিবর্ণ হইয়া বলিল—দূর হ তুই আমার সাম্‌নে থেকে!

রোহিণী মুচকি হাসিয়া চোখ মটকাইয়া বলিল—ইস্‌ বাপরে! রাণী মার কি! ভয়ে পিঁপড়ের গর্ত্তে লুকোবো নাকি? এখনি রাণীমা এসে কাকে দূর করেন দেখা যাবে!

মালতী তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া গেল।

ক্রোধে লজ্জায় অপমানে লাঞ্ছনার সম্ভাবনায় অভিভূত হইয়া মালতী আর দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। সে ঘরে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

খুড়িমা মেঝেয় বসিয়া মালা জপ করিতেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—এখন অসময়ে গিয়ে শুলি যে?

মালতী কি উত্তর দিবে? সে আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিল।

খুড়িমা বকিতে লাগিলেন—সকল অনাছিষ্টি। সকল কুলক্ষণ! গুরুজনকে একেবারে অগ্রাহ্যি!……

মালতী প্রতিক্ষণে গিন্নির আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল। কারো পদশব্দ হইলেই সে চম্‌কিয়া উঠিয়া মনে করিতেছিল এইবার লাঞ্ছনার ঝড় তার মাথায় ভাঙিয়া পড়িবে। কেউ কথা বলিতেছে শুনিলে

তার মনে হইতেছিল তারই কুৎসা আলোচনা হইতেছে। সে এই বাড়ীতে আসিয়া অবধি তাকে লইয়া ঘোঁট করা মেয়েমহলে একটা প্রধান বিলাসিতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হাবার-মা যে হাবার মা সেও যে তাকে অপমান করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিল না ইহাই মালতীর মনে বড় বেশী বাজিয়াছিল।

হঠাৎ গিন্নি প্রচণ্ড ক্রোধে দ্রুত গমনের চেষ্টায় মেঝে কাঁপাইয়া খুড়িমার ঘরে আসিয়াই তীক্ষ্ণ স্বরে বলিয়া উঠিলেন—বলি ছোটবৌ, বোনঝির কীর্ত্তি শুনেছ?

খুড়িমা অবাক হইয়া একবার গিন্নির আরবার মালতীর মুখের দিকে চাহিলেন। মালতী বালিশে মুখ গুঁজিয়া আড়ষ্ট মড়ার মতন পড়িয়া রহিল।

গিন্নি যেরূপ সালঙ্কারে মালতীর নূতন কীর্ত্তিকাহিনী বর্ণনা করিলেন তাতে মালতীর অসময়ে শয়নের কারণ খুড়িমার নিকট ভয়ানক স্পষ্ট হইয়া উঠিল। গিন্নির কথার প্রতিবাদ করিয়া মালতীর মন চীৎকার করিয়া বলিতেছিল—মিথ্যা মিথ্যা, সব আগাগোড়া মিথ্যা!—কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে একটি কথাও আপনার পক্ষ সমর্থনের জন্য বলিতে পারিল না।

গিন্নি ঘর হইতে চলিয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেলেন—এমন মেয়ের ঠাঁই আমার ঘরে হবে না, এ আমি স্পষ্ট বোলে দিচ্ছি ছোট বৌ। তুমি বোন্‌ঝির জন্যে অন্য জায়গা দেখ। আর রসবতী বোন্‌ঝিকে ছেড়ে থাকৃতে না পারো তুমি শুদ্ধ ঠাঁই দেখ। এই আমার শেষ কথা।

ঘর নিস্তব্ধ। সে নিস্তব্ধতা খুড়িমা ও মালতীর বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মতন চাপিয়া বসিয়া শ্বাস রোধ করিবার উপক্রম করিতেছিল। খুড়িমার ইচ্ছা হইতেছিল যে মালতী তাঁকে বলুক—'মাসিমা, এ সমস্ত

মিথ্যা কথা, আমি নির্দ্দোষী।' আর মালতীর মনে হইতেছিল খুড়িমা তাকে প্রশ্ন করুন, তিরস্কার করুন, লাঞ্ছনা করুন, এমন নির্ব্বাক্ স্বীকারের দ্বারা তাকে অপরাধী করিয়া বসিয়া থাকা একেবারে অসহ্য।

খুড়িমা কিছুতেই কথা বলেন না দেখিয়া মালতী উঠিয়া বসিয়া আপনাকে খুড়িমার দৃষ্টির সাম্‌নে প্রকাশ করিয়া ধরিতে চাহিল। তথাপি খুড়িমা তাকে লক্ষ্য করিলেন না দেখিয়া মালতী অভিমানদৃপ্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—মাসিমা, আমাকে তুমি বেহালায় পাঠিয়ে দাও। আমি এ বাড়ীতে আর এক দণ্ড থাক্‌ব না বোলেই নবকিশোর-বাবুকে ডাক্‌তে বলেছিলাম।

এত বড় কাণ্ডের পর মালতীর কণ্ঠে এতটুকু সঙ্কোচ নাই, বাক্যে এতটুকু কুণ্ঠা নাই, যে জন্য দিকে দিকে ধিক্কার ছি ছি করিয়া ফিরিতেছে সেই কথা জোর করিয়া বলিতে লজ্জা নাই, দেখিয়া খুড়িমা একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। সন্দেহের অন্ধকারজালে জড়াইয়া তিনি চিন্তা করিতেছিলেন এই জাল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সত্যের আলোকে বাহির হইয়া পড়িবেন কি না; অন্ধের মতন হাতড়াইয়া মরার চেয়ে চোখ মেলিয়া পুড়িয়া মরা ভালো কি না। এমন সময় হঠাৎ মালতী কথার আঘাতে তাঁর সন্দেহজালের মধ্যে যে একটি বড় রকম ছিদ্র করিয়া দিল, তার মধ্য দিয়া লাফাইয়া বাহির হইতে গিয়া খুড়িমার প্রতিকূল মন একেবারে জালে জঞ্জালে জড়াইয়া জট পাকাইয়া গেল। তিনি আর প্রশ্ন মাত্র না করিয়া অজস্র তিরস্কার করিয়া যাইতে লাগিলেন—পোড়ারমুখী শতেকখোয়ারী হাড়জ্বালানী! দূর হয়ে যা! দূর হয়ে যা!······

মালতী আর একটি কথাও না বলিয়া চুপ করিয়া আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল।

মালতীর এই নূতন লাঞ্ছনার খবর নবকিশোরের অগোচর রহিল না; সে পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের মতন নিষ্ফল আক্রোশে ফুলিতে লাগিল। সর্ব্বস্ব দিয়া, প্রাণ দিয়া এই অসহায়া অবলাকে রক্ষা করিতে পারিলে সে করিত, কিন্তু তার কেবলই মনে হইতেছিল উপায় নাই, উপায় নাই। মালতীকে রক্ষা করিবার সামান্য চেষ্টাও তার প্রতিকূলেই যাইবে।

নবকিশোর হাতের উপর মাথা রাখিয়া মালতীকে রক্ষা করিবার উপায় চিন্তা করিতেছিল, এমন সময় ভট্টাচার্য্য-মহাশয় সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন; পিতাকে দেখিয়া নবকিশোর উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া পিতার আদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিল। ভট্টাচার্য্য-মহাশয় স্নিগ্ধ স্বরে বলিলেন—বাবা কিশোর, তুমি একবার অন্দরে যাও, শুন্‌তে পাচ্ছি মালতী নাকি তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে চেয়েছে।

নবকিশোর মাথা নত করিয়া বলিল—এত কাণ্ডের পর আমার যাওয়া কি ঠিক হবে?

—এত কাণ্ড হয়েছে বোলেই ত তোমার যাওয়া আরো বেশী দর্‌কার। প্রথমত নিশ্চয় কোনো অভাব জানাবার জন্যেই মালতী তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে চেয়েছিল। তারপর তাকে যেরকম অন্যায় ভাবে উৎপীড়ন করা হচ্ছে তাতে তাকে সান্ত্বনা দেওয়াও ত দরকার।

—কিন্তু আমি গেলে মালতীর অধিকতর লজ্জার কারণ হবে না?

—না বাবা, তুমি গেলেই তার লজ্জাটা সহজ আর সহনীয় হয়ে যাবে।

নবকিশোর একটু চিন্তা করিয়া বলিল—তবে আমি এখন যাই।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—হ্যাঁ যাও বাবা।

নবকিশোরের চালচলন স্বভাবতই দৃপ্ত। আজ সে আরো মাথা সোজা করিয়া, পদক্ষেপ আরো দৃঢ় করিয়া, মুখভাবে আরো অসঙ্কোচ ফুটাইয়া যেন

মস্ত নিন্দা, সমস্ত লজ্জা, সমস্ত অপমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্যই মিদারের অন্তঃপুরের উদ্দেশে যাত্রা করিল।

নবকিশোর অন্দরে গিয়া উপস্থিত হইতেই চারিদিকে একটা াড়া পড়িয়া গেল। সকলেই এই বেহায়ার অতি সাহস দেখিয়া মুখ াওয়াচাওয়ি করিয়া বিদ্রূপের হাসি ও অব্যক্ত টিট্‌কারী চালাচালি রিতে লাগিল। নবীনারা মুচ্‌কি হাসিয়া বলাবলি করিল—মাথায় যেন নক নড়েছে? রূপসী বিম্বেধরীর ডাক! হাওয়ার মুখে ছুটে চলে! স্থির ক আর থাকা যায়!

নবকিশোরের তীক্ষ্ণ সচেতন দৃষ্টি হইতে এসকলের কিছুই এড়াইল া। তথাপি সে সমস্তই অগ্রাহ্য করিয়া সপ্রতিভ ভাবে বড় গলা করিয়া াকিল—মা!

নবকিশোরের বজ্রগম্ভীর আহ্বান সকল কোলাহল নিরস্ত করিয়া য়া কক্ষে কক্ষে ধ্বনিত হইল। আজ এত কাণ্ডের পর তার আহ্বানের ত্তরে গিন্নি তাঁর অভ্যস্ত প্রসন্ন সরলতায় "কেন রে কিশোর?" বলিয়া াড়া দিতে পারিলেন না। তাঁর আদেশে রোহিণী উপরের দালান হইতে ঠানে দণ্ডায়মান নবকিশোরকে বলিল—দাদাঠাকুর, রাণীমা এই ঘরে াছেন।

নবকিশোর প্রসন্ন স্মিতমুখে অসঙ্কোচ সহজ পদক্ষেপে উপরে উঠিয়া গন্নির ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। গিন্নি তখন একখানি খয়ের রঙের াল গায়ে জড়াইয়া শাদা ধবধবে পুরু বিছানার উপর বড় একটা তাকিয়ায় ঠস দিয়া বসিয়া ছিলেন; নবকিশোর গিয়া তাঁর কোলের কাছে বসিয়া লিল—বিপিন নেই বোলে মা একবার আমার খোঁজও করে না। মা খন ডাকে না, তখন ছেলেই মাকে দেখতে এল। বিপিনের এগজামিনের আর বেশী দেরী নেই।

নবকিশোর কথা বলিয়া বুঝিতে পারিল তার কথাগুলো ভারি খাপ ছাড়া রকমের হইল, সে কিছুতেই যেমন করিয়া বলিলে ভালো হইত তেম করিয়া কথা বলিতে পারিল না। সে তখন আনমনে গিন্নির পায়ে আঙুলের আংটি খুঁটিতে মনোনিবেশ করিল।

গিন্নিও নবকিশোরের কথার উত্তরে কিছুই বলিতে পারিলেন না তাঁর কেবলি মনে হইতেছিল এ বাড়ীতে সেই দজ্জাল মেয়েটা আছে যে এই কতক্ষণ আগে নিজে উপযাচিকা হইয়া এই তরু যুবাকে ডাকিতে চাহিয়াছিল। এবং সেই জন্যই আজ নবকিশোরে আগমনটা তাঁর নিকট তেমন সাধারণ বা সহজ ঘটনা বলিয়া বো হইতেছিল না।

নবকিশোর গিন্নির সহিত কোনোরূপ আলাপ জমাইতে না পারিয় হঠাৎ যেন চেষ্টা করিয়া বলিয়া উঠিল—সন্ধ্যে হয়ে গেল, যাই একবা খুড়িমা আর মালতীর সঙ্গে দেখা কোরে আসি।

এ কথায় গিন্নির মন ভীত হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনি নবকিশোরকে নিষেধ করিতেও পারিলেন না। তার রকম দেখিয়া তিনি বুঝিয়াছিলে যে নবকিশোর বিদ্রোহীর ভাবে সকল বাধা অগ্রাহ্য করিবার জন্য উদ্ধত ও প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছে। নবকিশোর যখন দেখিল যে গিন্নি তাকে তিরস্কার বা নিষেধ কিছুই করিলেন না, তখন সে একটু অপ্রতিভ ও সঙ্কুচিত ভাবে খুড়িমার কক্ষের দিকে চলিয়া গেল।

নবকিশোর অদৃশ্য হইয়া গেলে গিন্নি চুপিচুপি বলিলেন—যা ত রোহিণী, আড়ি পেতে শুন্‌গে ত কি কথা হয়।

রোহিণীর মন আপনা হইতেই ছটফট করিতেছিল; এখন হুকুম পাইয়া সে মহানন্দে গুপ্তচরের কার্য্যে ছুটিয়া গেল।

নবকিশোরের কণ্ঠ ও পদশব্দ ভুল করিবার সাধ্য কারো ছিল না।

তার সাড়া পাইয়া খুড়িমা লজ্জায় ও আশঙ্কায় ম্রিয়মাণ ও সঙ্কুচিত হইয়া তাড়াতাড়ি দেয়ালের হুক হইতে মালা নামাইয়া জপ করিতে বসিলেন, আর মালতীর এতক্ষণকার রুদ্ধ বেদনা উচ্ছ্বসিত হইয়া চোখের জলে গলিয়া পড়িতে লাগিল।

নবকিশোর দ্বারের কাছে আসিয়া ডাকিল—খুড়িমা!

খুড়িমা উত্তর দিলেন না; ঘন ঘন মালা চালনা করিতে লাগিলেন, যেন জপে ব্যাপৃত থাকাতেই কথা বলিতে পারিতেছেন না। ইহা দেখিয়া মালতী মুখ ফিরাইল।

নবকিশোর খুড়িমার সাড়া না পাইয়া ডাকিল—মালতী!

মালতী তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া উঠিয়া-দাঁড়াইয়া বলিল—আসুন।

নবকিশোর খুড়িমার সাড়া না পাইয়া বাহির হইতেই হয়ত ফিরিয়া যাইত। কিন্তু মালতী বেহায়ার মতন তাকে ডাকিয়া বসিল। খুড়িমার নিকট ইহা ভীষণ ধৃষ্টতা ও তাঁরই প্রতিকূলতা বলিয়া মনে হইল। তিনি দৃষ্টিতে নিজের মনের সমস্তখানি ক্রোধের উত্তাপ পুঞ্জীভূত করিয়া মালতীকে ভস্ম করিয়া ফেলিতে চাহিতেছিলেন।

খুড়িমার কোনো সাড়া না পাইয়া কেবল মাত্র মালতীর আহ্বানে এই আসন্ন সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে মালতীর ঘরে প্রবেশ করিতে নবকিশোরের এক মুহূর্ত্ত দ্বিধা বোধ হইতে লাগিল। পর মুহূর্ত্তেই সে ভাবিল নিশ্চয় খুড়িমা ঘরে আছেন, নতুবা মালতী এমন অসঙ্কোচে তাকে আহ্বান করিত না। নবকিশোর ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরে গিয়া দেখিল খুড়িমা দেয়ালে ঠেস দিয়া হাঁটু উঁচু করিয়া বসিয়া বেগে মালা ঘুরাইতেছেন এবং মালতী এক পাশে দৃপ্তভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

মালতীকে তখন শ্রাবণ-পূর্ণিমার মতন জলে মেঘে আলোতে অনির্ব্বচনীয় দেখাইতেছিল।

নবকিশোর মুগ্ধ নেত্রে মালতীর দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া খুড়িমা মালতীর দিকে কটমট করিয়া চাহিতে লাগিলেন। কিন্তু এত কাণ্ডের পরও বেহায়া মেয়েটা নবকিশোরের দিকে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল। তখন খুড়িমা জপ শেষ হওয়ার ভাণ করিয়া তাড়াতড়ি মালা মাথায় ঠেকাইয়া মালতীকে বলিলেন—মালতী, যা না, কাপড়গুলো সন্ধ্যে ডিঙোবে, তুল্‌গে না।

মালতী তার মাসিমাকে সংক্ষিপ্ত একটি 'যাচ্ছি' বলিয়া নবকিশোরকে বেশ স্পষ্ট কণ্ঠেই বলিল—আমি আপনাকে একবার ডেকে পাঠাব কতদিন থেকে ভাব্‌ছি, কিন্তু আপনাকে একবার ডেকে দেবে এতটুকু উপকারও এ বাড়ীর লোকের কাছথেকে পাবার জো নেই। আপনি এসেছেন, ভালোই হয়েছে, আমায় স্বস্থানে ফিরিয়ে দিয়ে আসুন······

মালতীর এই দুঃসাহস দেখিয়া খুড়িমা অবাক হইয়া তার দিকে চাহিয়া রহিলেন। মালতী তাতে ভ্রূক্ষেপও করিল না। তার মধ্যে তখন বিদ্রোহ প্রবল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উঠিয়াছে। সে বুঝিতেছিল এ বিদ্রোহ তারই বিনাশ ও দুঃখের হেতু; কিন্তু পদে পদে অপমানে মাথা নত করার চেয়ে সেও শ্লাঘ্য, সেও শ্রেয়।

নবকিশোর বলিল—তুমি বাড়ী চোলে যেতে চাচ্ছ কেন? মার কাছে ছিলে, মাসির কাছে এসেছ······এখানে তোমার কি দুঃখ?

মালতী প্রত্যেক কথায় ঘৃণার সহিত জোর দিয়া দিয়া বলিল—এখানে আমার কি সুখ তাই জিজ্ঞেস করুন। মাসির অতিরিক্ত স্নেহে আর অন্য-সকলের অতিরিক্ত যত্নে এখানে তিষ্ঠানো আমার দায় হয়ে উঠেছে। এমনি যত্ন, যে, কেউ আমাকে একটি কাজ ছুঁতে দেন না, কাছে ঘেঁসতে

দন না, রাত্রিদিন মিষ্টি কথায় কাণ জুড়িয়ে রেখেছেন, কারণ আমি একটা শেমিজ পরি, আমি মালা হাতে কোরে, দুনিয়ার লোকের কুৎসা করি নে, আমি মনের মধ্যে নরক পুষে ঘোম্‌টা ঢাকা দিয়ে সাধু হতে পারিনে, তাই আমি ম্লেচ্ছ, আমি খৃষ্টান, আমি অস্পৃশ্য! এ বাড়ীর পুণ্যশীলাদের সঙ্গে আমার বন্‌বে না। আপনি আমাকে নিয়ে এসেছেন, আপনিই আমাকে স্বস্থানে ফিরিয়ে রেখে আসুন। আমি এখানে আর একদিনও থাক্‌ব না।

খুড়িমা মুখ খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিলেন—তা থাক্‌বে কেন? বলি, যাবি কোন্ চুলোয় পোড়ারমুখি! একবার বল্‌বেন নিয়ে চলো, আবার বল্‌বেন রেখে এস···কে তোর বাবার চাকর আছে শতেকখোয়ারী!

মালতী এই তিরস্কারে দৃকপাতও না করিয়া নবকিশোরকে বলিল—আমার এইসব লাঞ্ছনা-অপমানের জন্তে আপনি দায়ী। আমি ত আস্‌তে চাইনি। আপনি আমাকে জোর কোরে এনেছেন। এখন আপনি আমায় রেখে আস্‌তে বাধ্য!

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—আমি যে-জন্তে তোমায় এনেছি সে কাজ ত এখনো সম্পন্ন হয়নি; এই সূত্রপাত হয়েছে মাত্র। বিপিন না আসা পর্য্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা কর্‌তে হবে, সহ্য কর্‌তে হবে।

—কিন্তু এ বাড়ীর সকল লোকেরই মন এমন সন্দিগ্ধ আর কুৎসিত যে এ সংসর্গে ভদ্রলোক থাকতে পারে না।

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—এই রকম হওয়াটাই ত স্বাভাবিক। যারা রক্তসম্বন্ধ ছাড়া স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক শুধু স্বামীস্ত্রীরূপেই জানে, আর-কোনো-রকম সম্পর্ক যে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে থাকা সম্ভব এ যারা কখনো দেখেনি বা কখনো কল্পনাও করে না, তাদের মন ত ওরকম হবেই। তাদের ভদ্র কোরে তুল্‌তে হবে দৃষ্টান্ত দেখিয়ে আমাদের। যখন এরা দেখ্‌বে

যে রক্তসম্পর্কশূন্য হয়েও স্ত্রীপুরুষের মধ্যে বন্ধুত্ব থাক্‌তে পারে, তখন এদের মনও পবিত্র হয়ে উঠবে, তখন অসম্পর্কীয় স্ত্রীপুরুষের ঘনিষ্ঠতা আর অসঙ্গত বোলে মনে হবে না।

—কিন্তু ততদিনে যে আমি ক্ষেপে উঠব।

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—না, তুমি ক্ষেপে উঠতে পাবে না। আমাদের কাজে সাহায্য কর্‌তেই ভগবান তোমায় আমাদের মধ্যে এনে ফেলেছেন।

মালতী ক্ষণেক নিরুত্তর থাকিয়া বলিল—তবে আমাকে খানকতক বই পাঠিয়ে দেবেন; আমার দিন আর কাটে না।

নবকিশোর বলিল—এখন আপাততঃ বইটইয়েরও দর্‌কার নেই। এ বাড়ীতে জ্ঞানবৃক্ষের নিষিদ্ধ ফল বইয়ের প্রবেশ নিষেধ। এখন যে-আন্দোলনটা উদ্যত হয়ে উঠেছে এইটেই আগে সহ্য করো, এর ওপর বইয়ের খোঁচা পেলে এই আন্দোলনের যে মূর্ত্তি ধারণ কর্‌বে তা কিছুতেই সহনীয় হবে না। আর অল্প ক'টা দিন চুপচাপ কোরে সয়ে থাক। বিপিনের আস্‌তে আর বেশী দেরি নেই, সে এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

মালতী মাথা নত করিয়া ভাবিতে লাগিল—বিপিন আসিলেই কি সব ঠিক হইয়া যাইবে? এই জমিদার-সংসারে তাকে একটু আরাম শান্তি দিতে সক্ষম কেউ যদি থাকে তবে সে কি একমাত্র বিপিন? সেই বিপিন তাকে এই-সমস্ত কুৎসিত উৎপাত হইতে রক্ষা করিতে চাহিবে কি না, পারিবে কি না, তাহা ভবিতব্যই জানে। তবু মালতী আশা করিয়া সকল উৎকণ্ঠা দূরে ঠেলিয়া ফেলিতে চাহিল, বিপিনকে ভাবী উদ্ধারকর্ত্তা বন্ধু বলিয়া মনে মনে তার মূর্ত্তি কল্পনা করিতে লাগিল, আগ্রহে তার আগমন অভিনন্দন করিতে লাগিল।

মালতীর মৌন, সম্মতির লক্ষণ বুঝিয়া নবকিশোর খুড়িমার দিকে ফিরিয়া স্মিতমুখে বলিল—দেখ খুড়িমা, তোমার ক্ষেপা মেয়েটিকে ঠাণ্ডা করে দিয়ে গেলাম।...সন্ধ্যে হল, এখন তবে আসি।

খুড়িমা নিরুত্তরে গোঁজ হইয়া বসিয়া রহিলেন। নবকিশোর তাঁর পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া প্রস্থান করিল।

খুড়িমা নবকিশোর ও বিপিনকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। কিন্তু মালতীকে লইয়া বিক্ষোভের যে আঘাত তাঁকে সহ্য করিতে হইতেছিল তার জন্য মনে মনে তিনি নবকিশোরকেই গৌণভাবে দায়ী করিয়া আসিতেছিলেন। সে যদি মালতীকে আনিয়া উপস্থিত না করিত, তবে এত জ্বালা তাঁকে পোহাইতে হইত না। তারপর নবকিশোরের আজকার কথা শুনিয়া খুড়িমার মনে সন্দেহ হইতেছিল মালতী ও বিপিনকে লইয়া নবকিশোর কি জানি কি একটা অনাসৃষ্টি ষড়যন্ত্র করিতেছে। তিনি নবকিশোরের কথা ভালো করিয়া বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই তাঁর সন্দেহ ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। এ জন্য তাঁর মন নবকিশোরের এবং সঙ্গে সঙ্গে বিপিনের প্রতিও অপ্রসন্ন হইয়া উঠিতেছিল। তাদের দৃষ্টি ও সংসর্গ হইতে মালতীকে দূরে রাখা খুড়িমা একটা মহৎ কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন।

১২

নবকিশোর চলিয়া গেলে সকলেরই জানিবার কৌতূহল হইতেছিল সে মালতীর সহিত কি পরামর্শ করিয়া গেল। কিন্তু খুড়িমার ভয়ে কেউ মালতীর কাছে ভিড়িতে সাহস করিতেছিল না।

রোহিণী ফিরিয়া আসিয়া গিন্নিকে বলিল—রাণীমা গো রাণীমা, বল্লে পেত্যয় যাবে, দাদাঠাকুরের সাড়া পেয়েই মালতী তাড়াতাড়ি ছুটে

বেরিয়ে এসে আপনি দাদাঠাকুরকে ডেকে হাত ধোরে ঘরে নিয়ে গেল; একটু সরম হল না, একটু ডর হল না! মেয়েমানুষের বুকের পাটা দেখে ডরে আমার বুকটা এখনও ঢিপ ঢিপ কোরে কাঁপতে নেগেছে! বাপরে বাপ! এমন মেয়ে বাপের জন্মে দেখিনি।

এই বলিয়া রোহিণী একবার গালে হাত দিয়া ঘাড় কাত করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিল; তারপরেই বুকে হাত দিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিয়া ভয়ের অভিনয় করিতে লাগিল। বাস্তবিকই রোহিণীর বুক ভয়ে কাঁপিতেছিল; কিন্তু তাহা মালতীর বুকের পাটা দেখিয়া নহে; আর একটু হইলে তার আড়ি পাতা নবকিশোরের কাছে ধরা পড়িয়া যাইত! এবং নবকিশোরের মেজাজ কারো অজানা ছিল না

গিন্নি রোহিণীর অভিনয়ে উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তারপর? তারপর? ছোটগিন্নি কোথায় ছিলেন? কি পরমর্শ হল?

—খুড়িমা ঐ ঘরেই ছিল। মালা জপ কর্‌ছিল; দাদাঠাকুরের সঙ্গে কথা কইলে না। মালতী বাড়ী চোলে যাবে বোলে দাদাঠাকুরের কাছে বায়না ধর্‌লে। খুড়িমা তাতে কত রাগ কর্‌তে লাগল; দাদাঠাকুর কত কি বোলে বোঝাতে লাগল—তার এক বর্ণও বুঝতে পারলাম না, আমরা কি ছাই ইংরিজি ফার্সী জানি। শেষকালে দাদাঠাকুর বল্‌লে দাদাবাবু বাড়ী আসুক তোমার আর কোনো কষ্ট থাক্‌বে না······

গিন্নি মধ্য হইতে বলিয়া উঠিলেন—আমার বিপিনের অমন স্বভাব নয়। কিশোর ছোঁড়াকেও ত ভালো বোলে জান্‌তাম। কলিকালের ছেলে-মেয়েদের চেন্‌বার জো নেই। যা ত একবার ছোটবৌকে ডেকে আন্‌গে ত।

রোহিণীর মুখে গিন্নির তলব শুনিয়া খুড়িমার মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—দিদি কেন ডাক্‌ছেন রোহিণী?

রোহিণী পরম নিরীহ মানুষটির মতন বলিল—তা আমি কেমন কোরে জানব খুড়িমা?—কিন্তু তার ছোট ছোট গোল গোল চোখ দুটো সয়তানী কৌতুকচ্ছটায় মিটমিট করিতে লাগিল।

খুড়িমা রোষকষায়িত লোচনে একবার মালতীর দিকে চাহিয়া রোহিণীর সহিত প্রস্থান করিলেন।

খুড়িমা গিন্নির কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। দিদি ডাক্‌ছ?

গিন্নি মুখ ভার করিয়া বলিলেন—ভাসুরপোর সঙ্গে কি পরামর্শ হল?

গিন্নির কথার ভঙ্গিতে ক্ষুণ্ণ হইয়া খুড়িমা বলিলেন—কি আর পরামর্শ হবে দিদি? মালতী কিশোরকে বল্‌ছিল কল্‌কাতায় রেখে আসতে।

গিন্নি পূর্ব্ববৎ গম্ভীর ভাবেই বলিলেন—তারপর? কবে যাওয়া ঠিক হল?

—কিশোর এখন নিয়ে যেতে চাইলে না।

রোহিণী অম্‌নি মুখ নাড়িয়া বলিয়া উঠিল—কেন, তুমিও ত যেতে দিতে চাইলে না, কত বক্‌লে!

খুড়িমা বুঝিলেন রোহিণী আড়ি পাতিয়া সব কথা শুনিয়া আসিয়া আগে-ভাগেই গিন্নিকে সব জানাইয়া রাখিয়াছে। এখন কিছু গোপন করিবার প্রয়াস বৃথা। তখন তিনি রোহিণীর কথা যেন শুনিতেই পান নাই এম্‌নি ভাবে নিজের কথার ধারাবাহিক রূপেই বলিতে লাগিলেন—আমিও মালতীকে বল্‌লাম, এমন জায়গাতেই তুই শাসন মান্‌ছিস্ নে, নিজে স্বাধীন হলে ত রক্ষে রাখবিনে। ভালো ছিলেম ভাগ্যক্রমে যদি এসে পড়েছিস্ তবে হাতের লক্ষ্মী সাধ কোরে পায়ে ঠেল্‌তে যাচ্ছিস্ কেন?

—না ছোট বৌ, অমন জাঁহাবাজ মেয়ের ঠাঁই আমার এ বাড়ীতে

আর হবে না। তুমি ওকে সাম্‌লে রাখতে পার্‌বে না। শেষে কি তোমার বোনঝির জন্তে আমাদের শুদ্ধ মাথা হেঁট হবে? এর মধ্যেই ত তোমার বোনঝির গুণের কথায় গাঁময় ঢি ঢি পড়ে গেছে। আজ ত সন্ধ্যে হল, কালকে কিশোরকে ডেকে আমি বল্‌ব ওকে রেখে আসুক্ গে। আমি এত পরের ঝক্কি সইতে পার্‌ব না! এমন সব ম্লেচ্ছপনা দেখতে পার্‌ব না!

খুড়িমা মিনতির স্বরে বলিলেন—দিদি, বড় গাছেই ঝড় লাগে; বট অশথ গাছেই পাখীরা বাসা বাঁধে, অপবিত্র করে; কিন্তু তাতে গাছের গৌরবই বাড়ে, বট অশথ মানুষের কাছে দেবতার পুজো পায়। তোমার বড় হিল্লেয় কত লোক শান্তিতে আশ্রয় পেয়েছে। মেয়েটাকে যদি পায়ে একটু স্থান দিয়েছ তবে ওকে একেবারে রসাতলে ফেলে দিয়ো না। তুমি ওকে ত্যাগ কর্‌লে ওর সর্ব্বনাশ হবে।

খুড়িমার কথায় গিন্নির বিরাগ হ্রস্ববেগ হইয়া গেল। প্রসন্ন অনুকম্পার সহিত বলিলেন—তা ত বুঝছি ছোট বৌ, কিন্তু ও মেয়ে কি শোধরাবার? ঘুয়ে ডুব দেয় না, ডিঙি মেরে চলে, একেবারে ধিঙ্গি! ভয় হয় পাছে ওর দেখাদেখি অন্য বৌঝিগুলো পর্য্যন্ত বিগড়ে যায়।

খুড়িমা চোখ মুছিয়া বলিলেন—দিদি, তুমি সতী লক্ষ্মী ভাগ্যিমানি; তুমি আশীর্ব্বাদ কর ওর মতিগতি ফির্‌বে! এখানে এসে হাত শুধু কোরে থান ত পরেছে। অন্য সব বদখেয়ালও ক্রমে ক্রমে ছাড়বে।

গিন্নি বলিলেন—তবে আগে ওর ঐ ঘাগরাটা ছাড়াও ছোট বৌ! ঐ ঘাগরাটাই যত নষ্টের গোড়া।

খুড়িমার সহিত যখন গিন্নির কথাবার্ত্তা হইতেছিল সেই অবকাশে ক্ষমা, মোক্ষদা, জয়া, পাঁচুর মা প্রভৃতি এক দঙ্গল নবীনা ও প্রবীণা গিন্না

মালতীকে আক্রমণ করিয়াছিল। ক্ষমা ডাকিল—ওলো ভাই মালতী, কি কচ্ছিস্ লো?

আজ এই গায়ে পড়িয়া সাধিয়া ভাব করিতে আসার উদ্দেশ্য মালতী বেশ বুঝিতে পারিল। সে কোনো উত্তর না দিয়া একমনে প্রদীপের কাছে মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া সুপারী কাটিতে লাগিল।

মালতীর উত্তর না পাইয়া ক্ষমা জনান্তিকে বলিল—উঃ! গুমর দেখলে হয়ে আসে!—মালতীকে বলিল—কথা কচ্ছিস্‌নে কেন ভাই? কিসের জন্য এত রাগ?

পাঁচুর মা ক্ষমার কাণে কাণে অথচ মালতী শুনিতে পায় এমন ভাবে বলিল—রাগ নয় অনুরাগ!

মালতীকে তথাপি নিরুত্তর দেখিয়া ক্ষমার অক্ষমা ক্রোধে উদগ্র হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু আজ শীঘ্র মালতীর সহিত ঝগড়া করার ইচ্ছা তার ছিল না; নবকিশোরের সহিত মালতীর আলাপটা জানিয়া লইবার আগ্রহ তাকে সংযত করিয়া রাখিতেছিল। বারবার তিনবার চেষ্টা করিয়া দেখা শাস্ত্রসঙ্গত; এজন্য পুনরায় কপট হাসি হাসিয়া ক্ষমা যাত্রার সুরে বলিল—ওলো ধনী মানিনী রাই, তোমার মানের গোড়ায় ছাই, আমি মান ভিক্ষে চাই, পড়ি তোমার পায়!—বলিয়া মালতীর পা ধরিতে গেল।

মালতী শ্লেষকটুস্বরে বলিল—ছি! ওকি! তোমরা সব পুণ্যাত্মা মানুষ! মেলেচ্ছ খৃষ্টানের পায়ে হাত দিতে আছে!

মালতীকে কথা বলিতে শুনিয়া আশ্বস্ত হইয়া সকলে তার সম্মুখে কাছে ঘেঁসিয়া বসিল। ক্ষমা বলিল—নে ভাই, তোর ঠাট্টা রাখ্। আমরা আবার ধর্ম্মিষ্টি কিসে? তুই ভাই, অমন্ কোরে মুখ গোম্‌ড়া কোরে থাকিস্ কেন? তোর এখা কছুই পছন্দই হয় না।

পাঁচুর মা চুপিচুপি অথচ মালতী শুনিতে পায় এমন ভাবে বলিল-কেবল কিশোর-ঠাকুরপো ছাড়া।

মালতী তার ডাগর আঁখি দুটি ঘৃণা-ভর্ৎসনায় ভরিয়া পাঁচুর মার দিকে চাহিতেই সে মাথা নীচু করিল।

ক্ষমা এসব যেন লক্ষ্যও করে নাই এমনি নিরীহভাবে বলিল—তুমি নাকি চোলে যেতে চাচ্ছ? তা কিশোর-দাদা কি বল্‌লে?

মালতী বিরক্তির স্বরে বলিল—তোমাদের কিশোরদাদা বল্‌লেন, তুমি যাবজ্জীবন এই নরকযন্ত্রণা ভোগ করো।

ক্ষমা অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—তুই অত রেগে রেগে কথা কইছিস কেন ভাই?

পাঁচুর মা বলিল—তা ভাই, রাগ ত হতেই পারে। হাজার হোক মেয়েমানুষ, নিজে থেকে মুখ ফুটে একটা কথা বল্‌লে, অথচ কিশোর-ঠাকুরপোর কি যে আক্কেল, স্বীকার হল না। এতে না রাগ হয় কার? আমরা হলে লজ্জায় ঘেন্নায় গলায় দড়ি দিতাম!

মালতী এই প্রচ্ছন্ন শ্লেষ সহ্য করিতে না পারিয়া বলিতে যাইতেছিল—তোমরা আমার ঘরে থেকে দূর হও!—কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল এ ঘরে তার কিছুমাত্র অধিকার নাই। অগত্যা সে-ই সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। এদের এই-সব নিষ্ঠুর নিগূঢ় সরব নীরব ঘাত-প্রতিঘাত তার ধৈর্য্যের উপর অত্যন্ত বেশী অত্যাচার করিতেছিল।

মালতী চলিয়া গেলে এরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করিয়া হাসিয়া উঠিল। পাঁচুর মা হাসিয়া বলিল—ইস্! দেমাক দেখে বাঁচিনে! তবু যদি নিজের চাল্‌চুলো থাক্‌ত!

পাঁচুর মা এমন ভাবে কথাটা বলিল যেন তাদের সকলেরই চাল্‌চুলো যথেষ্টই আছে।

ক্ষমা বলিল—চ, চ, দেখি ছুঁড়ি কোথায় গেল। ওকে সহজে ছাড়া হবে না।

মালতীকে কোন্ কোন্ বাক্যবাণে অতঃপর বিদ্ধ করিতে হইবে তারই পরামর্শ করিতে করিতে সকলে মালতীর সন্ধানে নির্গত হইল। মালতী যে নিজেকে সকলের কাছ হইতে নির্লিপ্ত করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল তাতেই এই-সকল নিষ্কর্ম্মা কুৎসাপ্রিয় পুরাঙ্গনাদিগকে তার বিরুদ্ধে অধিকতর উত্তেজিত করিতেছিল। এরা নিরুপায় দাম্ভিকাকে কাছে কাছে ধরিয়া রাখিয়া ঘৃণা ও পীড়ন করিবার বিলাসসুখ হইতে বঞ্চিত হইতে চায় না বলিয়াই মালতীর উপেক্ষায় জ্বলিয়া মরিতেছিল। পলাতক শিকারের পশ্চাতে ব্যাধের মতো এরা মালতীকে এক ঘর হইতে অন্য ঘরে তাড়াইয়া লইয়া ফিরিতে লাগিল। মালতী কোনো ঘরের কোণের অন্ধকারে লুকাইয়া নিজের আহত হৃদয়টিকে যে একদণ্ড শুশ্রূষা করিবে এমন একটু অবকাশ পাওয়া তার পক্ষে দুর্ঘট হইয়া উঠিল—যেখান-সেখান হইতে সকলের তীক্ষ্ণ কৌতুক-দৃষ্টি আসিয়া তার ক্ষতস্থানটিই উদ্‌ঘাটন করিতে গিয়া নির্ম্মম আঘাত করিতে থাকে। এখানে স্বাধীন ভাবে প্রাণ ভরিয়া বেদনা ভোগ করিবার মতনও একটু নিরালা জায়গা নাই, কৌতূহলদৃষ্টির কণ্টকে আচ্ছন্ন হইয়া সমস্ত বাড়ীটা তার একলার পক্ষেও নিতান্ত সঙ্কীর্ণ বোধ হইতেছিল। পিঞ্জরাবদ্ধ আহত পাখীর মতো তার উড়িয়া পালাইবার চেষ্টা শুধু তার নূতন আঘাতের কারণ হইতে লাগিল।

১৩

ভট্টাচার্য্য-মহাশয় নবকিশোরকে রাজবাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়া তার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় উৎসুক ভাবে তাঁর বাড়ীর বাহিরে একটি ছোট

বাগানের সম্মুখে একখানি লাল বনাত গায়ে জড়াইয়া মহিম্নস্তোত্র পা করিতে করিতে পায়চারী করিতেছিলেন। স্তোত্রের তালে তালে তাঁহা পায়ের খড়ম চট্‌চট্‌ শব্দ করিতেছিল। রাজবাড়ীতে আরতি করিে যাইবার সময় হইয়াছে, কিন্তু নবকিশোরের নিকট সমস্ত না শুনিয়া যাইতে পারিতেছিলেন না। তিনি অধৈর্য্যের সহিত ঘন ঘন পথপানে তাকাইতেছিলেন। ক্রমে ক্রমে ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বলিল। গোয়ালঘর হইতে শাঁজালের ধোঁয়া সন্ধ্যার কুয়াসায় মিশিয়া হিমঘন বাতাসকে ধূসর করিয়া তুলিল। এমন সময় নবকিশোর বাড়ী ফিরিল।

ভট্টাচার্য্য ডাকিলেন—বাবা কিশোর।

—আজ্ঞে।—বলিয়া নবকিশোর পিতার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন—মালতী কেন ডেকেছিল?

—সে এখান থেকে চোলে যেতে চায়। তার ওপর অত্যন্ত অন্যায় অত্যাচার হচ্ছে। সে জামা পরে বলে তাকে ছোঁয় না, কাছে বস্‌তে দেয় না, কোনো কাজ করতে দেয় না। তা ছাড়া সকলে তাকে নানা রকম অকথা কুকথা বোলে অপমান কর্‌ছে।

—ছোট বৌ কি কর্‌ছেন, নিজের বোনঝিকে তিনি সাম্‌লাতে পারেন না?

খুড়িমাও দেখ্‌লাম সকলের ওপর রাগ কোরে মালতীকেই নির্য্যাতন কর্‌ছেন।

—তুমি মালতীকে কি বোলে এলে? নিয়ে যেতে স্বীকৃত হয়েছ?

—না, তাকে কোথায় নিয়ে যাব? সেখানে তাকে কে দেখ্‌বে? আমি বল্‌লাম, বিপিন আসা পর্য্যন্ত সহ্য করে থাকুক, সে এলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

—কেমন কোরে ?

—বিপিন সর্ব্বদা বাড়ীর মধ্যেই থাকবে, তখন তার ভয়ে মালতীর ওপর কেউ কিছু উৎপাত করতে সাহস করবে না। আর মালতীও বিপিনের সঙ্গ পেয়ে নিতান্ত একলা বোধ করবে না।

—কিন্তু এটা ত রোগ প্রতিরোধ হল, রোগের প্রতিকার ত হল না। বিপিন একদিন বাড়ী থেকে অন্যত্র সোরে গেলেই সকলের রুদ্ধ আক্রোশ যে একদিনেই সমস্ত শোধটা তুলে নেবার জন্যে প্রচণ্ড হয়ে উঠবে; যদিই বা না ওঠে, তবু মালতী ত কারো কাছে একটু স্নেহ যত্ন সহানুভূতি পাবে না। সকলের বিরাগভাজন হয়ে থাকা কি সহজ ? এর প্রতিকারের কি উপায় ঠাওরেছ ?

—এর প্রতিকার ত সহজ নয়। স্ত্রীশিক্ষা যতদিন না স্ত্রীলোকের চিন্তাকে প্রসারিত কোরে তাদের সামনে মহৎ আদর্শের পথ খুলে দিচ্ছে ততদিন ত তারা ক্ষুদ্রতা নীচতা ত্যাগ কোরে ভিন্ন মতের লোককে ক্ষমার উদার চক্ষে দেখতে পারবে না।

ভট্টাচার্য্য নীরবে দুবার পায়চারী করিয়া বলিলেন—আচ্ছ বলো ত, তুমি যতখানি দেখেছ শুনেছ তাতে মালতীর স্বভাব চরিত্র কেমন বোধ হয় ?

নবকিশোর উৎসাহিত হইয়া বলিল—খুব ভালো। মালতী বড় চমৎকার লক্ষ্মী মেয়ে। বিনয় আর তেজ, বশ্যতা আর স্বাতন্ত্র্য তার স্বভাবে চমৎকার মিশ খেয়েছে। গৃহকর্ম্মেও খুব পটু। একখানি নিখুঁত কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীর প্রতিমা !

ভট্টাচার্য্য আবার নীরবে দুবার পায়চারি করিয়া বলিলেন—মালতীকে রক্ষা করবার একমাত্র উপায় আমার মনে হয় মালতীর বিবাহ। তুমি কি মনে করো।

—আমিও এই কথা অনেক দিন ভেবেছি। কিন্তু বিধবার বিবাহের কথা সাহস কোরে তুল্‌তে পারিনি।

—কেন বাবা, বিধবার বিয়ে ত অশাস্ত্রীয় নয়; দেশাচারে দিনকতক বন্ধ হয়ে গেছে। যা যুক্তি আর শুভবুদ্ধির প্রতিকূল নয় সে কথা স্বীকার কর্‌তে বা প্রকাশ কর্‌তে ভয় কর্‌লে চল্‌বে কেন।

—কিন্তু মালতীর উপযুক্ত পাত্র কৈ?

ভট্টাচার্য্য নবকিশোরের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন—আমি ঠিক করেছি মালতীকে আমারই পুত্রবধূ কর্‌ব।

নবকিশোর কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া বলিল—না বাবা, আমি যে-ব্রত গ্রহণ করেছি তাতে আমার বিয়ে করা সুবিধে হবে না।

—তুমি কি মালতীকে বিবাহ কর্‌তে আপত্তি কর্‌ছ?

—না, তা নয়। যদি আমি বিয়ে করি তবে মালতীকে আমার সহধর্ম্মিণীরূপে পেলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান বোলে মনে কর্‌ব। কিন্তু আমার আপত্তি বিবাহের সম্বন্ধেই। আমার মুক্ত শক্তি আর বিপিনের অর্থ দেশে শিক্ষা প্রচারের জন্যে নিযুক্ত করতে হবে। বিপিন যে-রকম পরনির্ভর দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক, তারই সহধর্ম্মিণীর উপযুক্ত পাত্রী মালতী।

—কিন্তু তোমার বাপ মা স্বেচ্ছায় বিধবাকে বধূরূপে বরণ কর্‌তে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু বিপিনের বেলা যে মহা বিরোধ উপস্থিত হবে?

—সেই জন্যেই ত তার সফলতার মূল্যও বেশী হবে।······বিপিনের পরীক্ষা শিগ্‌গির শেষ হয়ে যাবে। আমি একবার কল্‌কেতা গিয়ে তাকে সমস্ত প্রতিকূলতার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বার মতন কোরে তৈরি কোরে আন্‌ব!

—কিন্তু এখন তাকে মালতীর সঙ্গে বিবাহের কথা কিছু বোলো

না। তাদের উভয়ের দেখাসাক্ষাতের পর উভয়ের মনের ভাব বুঝে তবে যা হয় করতে হবে। হঠাৎ কিছু করলে তা শুভ হবে না।...... আচ্ছা, তুমি বাড়ী যাও, আমি আরতি কোরে আসি, তারপর এবিষয়ে বিশেষ আলোচনা করা যাবে।..... ওরে মুরলী, আমায় একটা লণ্ঠন আর লাঠি-গাছটা এনে দে ত।

নবকিশোর মালতীর বিবাহের কথা ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল। তার মনে হইতে লাগিল মালতীর রূপ, মালতীর শিক্ষা, মালতীর গুণপনা, মালতীর তেজস্বী মধুর প্রকৃতি—যাহা কিছু পুরুষ কামনা করিতে পারে মালতীতে সে সব প্রচুর মাত্রায় আছে। একটি ছোট্ট "হাঁ" বলিলেই এমন মালতী তার হইতে পারে; মালতীও দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য আনন্দে তাকে বরণ করিতে স্বীকার করিবে। সুখের পথ তার সম্মুখে এমন প্রমুক্ত, এমন সরল; সুখ তাকে সাধিয়া ফিরিতেছে, সে হাত বাড়াইয়া শুধু তুলিয়া লইলেই হয়। কিন্তু না। বড় প্রলোভন মনে হইতেছিল বলিয়াই নবকিশোর জোর করিয়া মালতীর দিক হইতে মন ফিরাইয়া লইয়া ভাবিল কোনো প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া সঙ্কল্প পণ্ড করিবার মতন দুর্ব্বল প্রকৃতি তার নয়; যেমন করিয়াই হোক বিপিনের সহিতই মালতীর বিবাহ ঘটাইয়া তুলিতে হইবে, তাহা হইলে মালতী স্নেহশীল উপযুক্ত স্বামীর আশ্রয়ও পাইবে এবং বিপিনের মতন একজন জমিদারকে সংস্কারের কাজে চিরদিনের জন্য পাওয়া যাইবে—যৌবনের আবেগ হ্রাস হইলে পুরাতন গণ্ডির মধ্যে ফিরিয়া গিয়া নিশ্চিন্ত হইবার পথ তার একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। মালতীকে দিয়াই বিপিনের দ্বিধার পথ রুদ্ধ করিতে হইবে।......কিন্তু মালতী বড় সুন্দর! বারবার করিয়া কেন মনে হইতেছে মালতী বড় সুন্দর! রূপে গুণে সুন্দর! অনির্ব্বচনীয় সুন্দর! অপরূপ সুন্দর! বড় লোভনীয়!

……হোক সুন্দর! হোক লোভনীয়! কল্যাণের সঙ্গেই এই সুন্দরকে যুক্ত করিতে হইবে, নিজের লালসার সঙ্গে নহে! নিজের চিরপোষিত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাকে এই ত্যাগ স্বীকার করিতেই হইবে!…… মালতী তার হইলে হইতে পারিত কিন্তু তাকে সে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতেছে এই আনন্দবোধের দ্বারা নবকিশোর মালতীর চিন্তা চাপা দিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু বায়ুহিল্লোলে সলিলনিমজ্জিত পদ্মের মতো মালতীর মুখচ্ছবি নবকিশোরের আলোড়িত মনে থাকিয়া থাকিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া উঠিতে লাগিল, কিছুতেই তাকে একেবারে ডুবাইয়া রাখা যাইতেছিল না।

১৪

বিপিনের শেষ পরীক্ষার দিন দু-প্রহরকালে নবকিশোর কলিকাতার বাসায় গিয়া পৌছিল। পঞ্চা-খান্‌সামার যত্নে তার স্নানাহারের কোনো অসুবিধা ঘটিতে পারিল না।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিপিন তারককে সঙ্গে করিয়া বাসায় আসিল। নবকিশোরকে দেখিয়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল—বাহব্বা! কিশোর যে! একেবারে surprise visit! কখন এলে? খবর সব ভালো ত?

তারক তার শীর্ণ মুখের মধ্য হইতে বড় বড় শাদা শাদা দাঁত সবগুলি বাহির করিয়া বলিল—কি হে ভট্‌চায্‌, ভালো ত?

নবকিশোর স্মিতমুখে বলিল—সব ভালো!…তারপর বিপিন, কেমন এগ্‌জামিন দিলে?

—মন্দ নয়। পাশ হব। তবে ফার্ষ্ট ক্লাশ হবে কি না ঠিক বুঝ্‌তে পারছিনে। এংলো স্যাক্সন ফাইললজির পেপারটা একটু খারাপ হয়ে গেছে; আর প্রোজ পেপারটাও তেমন মনের মতন হয় নি।

—অন্য পেপারগুলো সব ভালো হয়েছে ত? তবে ভয় নেই ফাষ্ট ক্লাশ হয়ে যাবে। তারপর বাড়ী যাচ্ছ কবে?

—এই ত তুমি এসেছ, যেদিন বল্‌বে।

—যাবার আগে অনেক কাজের পরামর্শ কোরে মতলব এঁটে বাড়ী যেতে হবে।

—কি পরামর্শ?

—সে অনেক কথা। এখন তাড়াতাড়ি হবে না। হাত মুখ ধোওগে। সন্ধ্যার পর পরামর্শ হবে এখন। তুমি যাও, আমি ততক্ষণ তাড়কার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ জুড়ে দি।

তারক দাঁত বাহির করিয়া, গলার শিরা ফুলাইয়া বলিল—বেশ! এহেহি যুদ্ধং দেহি!·········কোন্ বিষয়ে যুদ্ধ হবে? বিধবাবিবাহ, না জাতিভেদ, না সমুদ্রযাত্রা, না কি?

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—আরে ছ্যাঃ। ঐ একঘেয়ে বকেয়া বকুনি কি আর ভালো লাগে। ঐ সব পুরোণো মতের আলোচনার চূড়ান্ত হয়ে গেছে। তোমরা নব্য হিন্দুর দল, নতুন রকম একটা সমস্যা খাড়া করো, তবে ত!

তারক গম্ভীর হইয়া বলিল—যথা?

নবকিশোরও খুব গম্ভীর হইয়া বলিল—এই মনে করো, তোমরা বিধান দেবে যে মেয়েদের দ্রৌপদীর মতন একেবারে পঞ্চস্বামী হবে, তা হলে তারা সতীকে সতী থাক্‌বে অথচ 'পঞ্চ আপৎসু পাঁচমোহাড়া আগ্‌লানো থাকাতে বিধবা-বিবাহের পাপের আশঙ্কা থাক্‌বে না; কিংবা ধরো, মেয়ে জন্মাবামাত্র তাদের চক্ষু উৎপাটন আর জিহ্বা ছেদনের ব্যবস্থা দেবে, তা হলে আর স্ত্রীশিক্ষার কথা কেউ তুল্‌বেও না। কিম্বা এই বিধান দেবে যে সকলকেই স্বপাক খেতে হবে, নইলে জাত যাবে, অধর্ম্ম হবে, সাড়ে

সাতান্ন পুরুষ রৌরব নরকে বায়ান্ন লক্ষ বৎসর ডুবে থাক্‌বে;—কারণ, জোর কোরে ত বলা যায় না যে স্ত্রী-কন্যারাও ঠিক আমাদের স্বজাত!..............এগুলো নমুনা মাত্র। এই রকম ধরণের বিশেষ গবেষণাত্মক নতুন নতুন ব্যবস্থা দাও। তখন তার বিরুদ্ধে বা স্বপক্ষে যে আলোচনা চল্‌বে তা মৌলিক এবং নতুন রকমের হবে বটে। মনুর আমলের মতগুলো যেমন পুরোণো, তার আলোচনাও তেমনি পুরোণো হয়ে গেছে। বুদ্ধিমান লোকের এখন ওসব বিষয়ে আলোচনা না কর্‌লেই বুদ্ধির মর্য্যাদা রক্ষা করা হয়।

তারক নবকিশোরের কথা শুনিয়া বুঝিল যে নবকিশোরের এখন তর্ক করিবার ইচ্ছা নাই, সে তাকে লইয়া বিদ্রূপ করিতেছে। তারকের বেশ জানা ছিল যে নবকিশোরের বিদ্রূপের ঝাল কি রকম উগ্র। সুতরাং সে আত্মরক্ষার জন্য ব্যগ্র হইয়া বলিল—ওহো! একটা বিশেষ কাজ মনে পোড়ে গেল, আমি চট কোরে ঘুরে আস্‌ছি।

নবকিশোর বলিল—তবে এখন ঝগ্‌ড়া ধামা চাপা থাক। অন্য দিন মীমাংসা হবে। কিন্তু কাজটা কি জরুরি?

—উঃ বড্ড।

—কিন্তু অভয় যদি দি যে তর্ক দ্বন্দ্ব এখন সন্ধিতে বন্ধ থাক্‌বে, তা হলে?

—কেন, আমি কি তর্ককে ডরাই নাকি। আচ্ছা, আমি ঝাঁ কোরে আস্‌ছি।

তারক ধাঁ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ক্ষণেক পরে বিপিন আসিয়া নবকিশোরকে জিজ্ঞাসা করিল—তাড়কা গেল কোথায়?

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—আমার নতুন শাস্ত্রবিধানের আভাস

পয়ে ভেগেছে। ফিরে আস্‌বে বোলে গেছে বটে, কিন্তু আজ আর স ফির্‌ছে না।

বিপিন হাসিতে হাসিতে বলিল—চলো আমরা বারান্দায় গিয়ে বসিগে।

দুই বন্ধু রাস্তার ধারে বারান্দায় চেয়ার পাতিয়া মোটা মলিদার চাদর াায়ে জড়াইয়া বসিল। কলিকাতার ধোঁয়া ও ধূলার চাদর গায়ে জড়াইয়া াীতকালের ভারি বাতাস আড়ষ্ট হইয়া আছে। ধূলিধূমের কুজ্ঝটিকা ভদ করিয়া পথপ্রান্তের গ্যাসের আলো ঝাপ্‌সা হইয়া মিটমিট করিয়া ‍লিতেছিল—যেন দূর আকাশের অস্পষ্ট নীহারিকা। তার ধূসর আলোকে সমস্ত কলিকাতা কেমন যেন তন্দ্রাতুরের মতন দেখাইতেছে। ধ্যে মধ্যে বাড়ী কাঁপাইয়া, সহিসের চীৎকারে গলি ভরিয়া, মাতালের চাখের মতন ঘোলা আলো চম্‌কাইয়া ঘোড়ার গাড়ী ছুটিয়া যাইতেছিল। ই বন্ধু রাজপথের বিচিত্র জনপ্রবাহ দেখিতে দেখিতে গল্প করিতে করিতে বকিশোর বিপিনকে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা বিপিন, তোমার কোনো রুষে ত লেখাপড়া কেউ করেন্‌নি। তুমি এই অনভ্যস্ত বিদ্যার চর্চ্চা নিয়ে কি কর্‌বে? জমিদারীর জমাখরচের খাতার মধ্যে কি এর নকল তোলা থাক্‌বে?

বিপিন হাসিয়া বলিল—"ঘরের কোণে বুড়ো থাকুন,

পয়সা কড়ি করুন জমা,

দেখুন বোসে বিষয়পত্র

করুন মাম্‌লা মোকদ্দমা।"

আর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে কাব্য আলোচনা কর্‌ব। কাব্য আলোচনার খ এম্‌নি মিঠে যেন প্রেয়সীর প্রথম চুম্বন—তেম্‌নি এক অবুঝ আনন্দভরা, আধো গুপ্ত আধো ব্যক্ত ভাবের, কি চমৎকার! সে সুখ ছেড়ে মা ওয়াশীল বাকী, আর কোর্ফা মোকর্‌ররি? রামঃ!

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—কবি, তোমার প্রেয়সীর প্রথম চুম্বন আর বেশী দিন কেবলমাত্র কল্পনার সামগ্রী হয়ে থাক্‌ছে না; শীঘ্রই সে সুখের অভিজ্ঞতা লাভ হবে। তখন যেন সেই শরীরিণী কবিতা পুঁথিগত সরস্বতীকে দূর কোরে না ভায়।

বিপিন হাসিতে হাসিতে বলিল—না হে না, সে শুভদিন যদি আসে তবে তখনই ত আরো বেশী কোরে বাণীর দর্‌কার হবে নিজের অব্যক্ত ভাবকে আকার দেবার জন্যে। "লাজুক হৃদয় যে কথাটি নাহি কবে, কবি লুকাইয়া কবে তাহারে।"

নবকিশোর বলিল—আমাদের দেশের সব মেয়েই ত মূক, তাদের মুখের বাণী ত আমরা হরণ কোরে রেখেছি। যে মেয়ে সেই নিষিদ্ধ জ্ঞানবৃক্ষের ফল আস্বাদ কর্‌বার দুরাশা করে তাকে যে আমরা কেমন মনে করি তার প্রমাণ মালতী। মালতী জ্ঞানবৃক্ষের নিষিদ্ধ ফলের যৎকিঞ্চিৎ আস্বাদ পেয়ে তোমার বাড়ীতে ঢুকেছে বোলে একেবারে গোল বেধে গেছে।

বিপিন উৎসুক হইয়া বলিল—কেন কি হয়েছে?

নবকিশোর বলিতে লাগিল—প্রথম কারণ, মালতী বিধবা হয়েও দুইগাছি চুড়ি আর নরুন-পেড়ে কাপড় পোরে গিছ্‌ল। সে কিন্তু গিয়েই সে-সব ছেড়েছে—এ ত্যাগ তার সেই অচেনা স্বামীর স্মৃতির সম্মানে নয়, নিজের মনের বৈরাগ্য হতেও নয়, এ ত্যাগ সমাজের জবর্‌দস্তি জুলুমের জন্যে।

তারক এক সময়ে আস্তে আস্তে আসিয়া সেখানে বসিয়া পড়িয়াছিল। সে আস্ফালন করিয়া বলিয়া উঠিল—যে লোক সমাজে থেকে সমাজের আদর্শ অবহেলা কর্‌বে তার ওপর জুলুম কর্‌বার অধিকার সমাজের একশ বার আছে···

নবকিশোর তারকের আস্ফালন লক্ষ্য না করিয়াই বলিয়া যাইতে লাগিল—দ্বিতীয় কারণ, মালতী শেমিজ পরে; সেটা সে কিছুতেই ছাড়্‌তে পারেনি। তৃতীয় কারণ, সে স্বীকার করেছে যে সে লেখাপড়া জানে। চতুর্থ কারণ, সে তুচ্ছ বিষয়ের আলাপে যোগ দিতে পারে না। পঞ্চম কারণ, সে পুরুষকে দেখে ব্যাঘ্রঝম্পে পলায়ন করাটাকেই অধিক লজ্জার কারণ মনে করে। এই-সব তুচ্ছ কারণে সবাই মিলে তাকে অতিষ্ঠ কোরে তুলেছে; নির্য্যাতনের অবধি নেই—কেউ তাকে একটি ভালো কথা বলে না; কোনো কাজ ছুঁতে দেয় না; সে অত লোকের মধ্যে একলা পোড়ে কারাযন্ত্রণা ভোগ কর্‌ছে। বাড়ী গিয়ে তোমার প্রথম কাজ হবে মালতীকে রক্ষা করা; তারপর পরিবারগত কুসংস্কার দূর কোরে পুরস্ত্রীদের শিক্ষায় আদর্শে উন্নত কোরে তোলা। মালতীকে তুমি দোসর কোরে নিতে পার্‌লে তোমার শ্রম অনেক লাঘব হয়ে যাবে।

তারক বলিয়া উঠিল—খবরদার! অমন কর্ম্ম কখনো কোরো না, কোরো না, তোমাদের খৃষ্টানি আদর্শ আমাদের শান্ত অন্তঃপুরে খাড়া কোরে আগুন জ্বালিয়ে তুলো না বল্‌ছি। তোমরা যা কর্‌ছ পুরুষেরাই তাতে জ্বলুক, আমাদের কুললক্ষ্মীদের শান্তি নষ্ট কর্‌লে তোমাদেরও কল্যাণ হবে না।

বিপিন অসহায়া মালতীর প্রতি নিজের পরিবারগত অত্যাচার নিজকৃত অপরাধ মনে করিয়া উত্তেজিত হইয়া বলিল,—অকল্যাণের আবর্জ্জনা দূর কর্‌তে আগুন যদি জ্বাল্‌তে হয় ত জ্বাল্‌ব। আর অন্যায়ের প্রতিকার যদি না কর্‌তে পারি তবে সে আগুনে নিজেরাই পুড়ে মর্‌ব—পরিবারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছাড়্‌ব।

ভাবপ্রবণ বিপিনকে উত্তেজিত দেখিয়া নবকিশোর সন্তুষ্ট হইয়া

বলিল—সম্পর্ক ছাড়্‌লে চল্‌বে কেন? মা বোন ত ছাড়্‌বার নয়; তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই পরিবারের মধ্যে নূতন উন্নত আদর্শ প্রতিষ্ঠা কর্‌তে হবে।

বিপিন অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল—আচ্ছা কিশোর, মালতীর বিয়ে দিলে হয় না?

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—পাত্র?

বিপিন হাসিয়া বলিল—তুমি।

নবকিশোর হাসিতে হাসিতে বলিল—আগে মালতীকে একবার দেখ, তারপর পারো যদি পরের নাম কোরো।

বিপিন হাসিতে লাগিল। তারক চোখমুখ লাল করিয়া বলিয়া উঠিল—এ্যাঁ তোমরা কি এমনই অধঃপাতে গেছ যে ব্রহ্মচারিণী বিধবাকে নিয়ে রহস্য! জেনো তোমরা—হিন্দুসমাজ এখনো মরেনি। সেই বিপুল প্রকাণ্ড শক্তিকে তোমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত কোরে তুলো না, এতে কল্যাণ হবে না, হবে না, হবে না, এ আমি বোলে রাখছি।'

তারক আবেগের তাড়নায় বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। নবকিশোর ও বিপিনের উচ্চ হাস্য তার পশ্চাতে তাড়া করিয়া ছুটিতে লাগিল।

১৫

বহুকাল পরে সব কয়টা পাশের এগ্‌জামিন দিয়া বিপিন বাড়ী আসিতেছে। বাড়ীর সকলেই উৎসুক চিত্তে বিপিনের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। গিন্নির মন আজ মাতৃগর্ব্বে প্রসন্ন ভরপূর। তিনি মনে মনে ভাবিতেছিলেন এই ফাল্গুন মাসের মধ্যেই প্রচুর উৎসবের আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে তাঁর বধূ-সহিত পুত্রকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিবেন,

আজিকার এ উৎসব তারই পূর্ব্ব-সূচনা। গিন্নির আনন্দে আজ সবাই আনন্দিত। রোহিণী আজ অকারণে চেঁচাইয়া হাট বাধাইতেছিল। বাড়ীর বৌ-ঝিরাও অতিরিক্ত ঔৎসুক্যে আপনাদের আগ্রহ দমন করিতে পারিতেছিল না।

এই আনন্দ-উল্লাসের মধ্যে দুটি লোকের মন দ্বিধান্বিত হইয়া ছিল—খুড়িমার ও মালতীর। বিপিনের আগমনের আনন্দে তাঁরা সকলের সহিত এক হইয়া যোগ দিবেন, কি একান্তে থাকিবেন, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছিলেন না। সকলের আনন্দে যোগ দিতে গেলেই লোকের বিরক্তি উৎপাদন করিবেন, না, একান্তে থাকিলেই লোকের অন্যায় বোধ হইবে, ইহা তাঁরা ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। খুড়িমা বিপিনকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন। তার আগমনে খুড়িমার হৃদয় আপনা হইতে চাহিতেছিল তাকে সকলের আগে আশীর্ব্বাদ করিবে—বিপিন তাঁর অদিনে যে উপকার করিয়াছে তাহা ত ভুলিবার নহে। কিন্তু তাঁর সহজ আচরণের পথে অন্তরায় জুটিয়াছিল মালতী। তাকে লইয়া পাছে আবার নূতন গণ্ডগোল হয় এই ভয়ে তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইতেছিলেন! মালতীকে লইয়া তিনি সকলের আনন্দে যোগ দিতে পারেন না, আবার মালতীকে সঙ্গে না লইয়া একাকী যাওয়াও ভালো দেখায় না—খুড়িমার পক্ষে ইহাই মহা সমস্যা হইয়া উঠিয়াছিল।

মালতীর অন্তরে সুখ ও সঙ্কোচের দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। নবকিশোর বলিয়াছিল বিপিন আসিলেই তার সকল দুঃখ-যন্ত্রণা ঘুচিবে। সেই তার দুঃসহ-দুঃখ-ত্রাতা বন্ধু আজ আসিতেছে। তাকে দেখিবার দারুণ কৌতূহল মালতীকে পীড়া দিতেছিল। সে যে মনে মনে একটি কল্পিত মূর্ত্তি গড়িয়া রাখিয়াছে তার সহিত বাস্তবকে মিলাইয়া দেখিতে

সাধ হইতেছিল। কিন্তু তার ভয় হইতেছিল পাছে লোকে আবার কিছু বলে।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে খুড়িমা স্থির করিলেন মালতীকে সঙ্গে লইয়াই সকলের সহিত কিন্তু সকলের পশ্চাতে থাকিয়া বিপিনের অভ্যর্থনায় যোগ দিবেন এবং বিপিন বাড়ীতে প্রবেশ করিলে গোলমালের মধ্যে মালতীকে লইয়া তিনি সরিয়া আসিবেন।

খুড়িমা মালতীকে বলিলেন—চ নীচে যাই। সকলে যেখানে বিপিনের জন্তে অপেক্ষা কোরে রয়েছে সেখানে আমাদের না গেলে ভালো দেখাবে না। কিন্তু তুই সকলের পেছন থাকবি, বুঝলি? অমন প্যাঁট প্যাঁট কোরে তাকাচ্ছিস কেন? তখন যেন অম্‌নি হাঁ কোরে তাকিয়ে থাকিস্ নে। আর আমি যেই ডাক্‌ব অম্‌নি চোলে আস্‌বি, বুঝলি? হ্যাও, এখন মুখের ওপর ঘোম্‌টাটা একটু টেনে দাও ·····না বাপু, তোকে নিয়ে আমি পার্‌ব না। একটা কথা কি তোর শুন্‌তে নেই ছাই!

মালতী বলিল—আমি একগলা ঘোম্‌টা দিতে পারব না, সে আমার ভারি লজ্জা করে।

—আ মরি! ঘোম্‌টা দিতে লজ্জা করে, আর মুখ দেখাতে লজ্জা করে না—কি যে কথার ছিরি! যা খুসি কর্‌গে যা, মর্‌গে যা—বলিয়া খুড়িমা বেগে প্রস্থান করিলেন। মালতী ধীরমন্থর গমনে তাঁর পশ্চাতে চলিয়া গেল।

গিন্নি তখন খুড়িমা ও মালতীর কথাই জয়াকে বলিতেছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন—দেখছ জয়া-ঠাকুরঝি, ছোট বৌটার আক্কেল। আজকে আমার বিপিন বাড়ী ফিরে আসছে, আজকেও কিনা বোনঝিকে নিয়ে ঘরের কোণে বোসে থাকা হয়েছে।

জয়া বড় চালাক মেয়ে। সে খোসামোদ দিয়া গিন্নির দুর্ব্বল প্রকৃতিকে

আপনার শত অনাচার অন্যায় একেবারে ভুলাইয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু গিন্নির কথা শুনিয়া এখন সে ঠিক ধরিতে পারিল না গিন্নির মনের বাতাস কোন্ মুখো বহিতেছে এবং কোন্ মুখো দাঁড়াইয়া সে কটুকাটব্যের ধূলা-কুটা নিক্ষেপ করিবে। আন্দাজ একটু ভুল হইলে নিজের হাতের ত্যক্ত ধূলি নিজের চোখেই পড়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে এবং তার পরিণাম যে চোখের জল সেটা জয়ার বিলক্ষণ জানা ছিল। তাই সে আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিল—তাই ত তাই ত ছোটবৌকে দেখছিনে বটে!

এমন সময় খুড়িমা আসিয়া দূরে দাঁড়াইলেন। গিন্নি তাঁকে দেখিয়া চুপিচুপি জয়াকে বলিলেন—দেখ্‌ছিস জয়া-ঠাকুরঝি, বিপিন আসছে উদ্দেশেই কোটর ছেড়ে বেরিয়েছেন। কিন্তু বিপিনকে পেলেন কোথা থেকে? সে এই আমা হতেই ত?

জয়া গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—তা ত বটেই! তুমি আগে না বিপিন আগে। তুমিই ত হলে সকলকার গোড়া। আহা, বাবা আমার মাথার চুলের মতন পের্‌মাই পাক। দেখেছ, দিদি, মালতী মেমও বেরিয়েছেন। মুখের ওপর একরত্তি ঘোম্‌টা আর নেই। ইচ্ছেটা রূপ দেখিয়ে বিপিনকে বশ কর্‌বেন।

গিন্নি মালতীর দিকে ফিরিয়া দেখিলেন সেই বিষণ্ণ মুখশ্রীর মধ্যে কোথাও চঞ্চলতা চটুলতা নাই; সংযমের একটি ব্রীড়া মুখমণ্ডলে মাখানো রহিয়াছে; চোখদুটি যেন লজ্জার ভারে ভাঙিয়া পড়িতেছে। গিন্নির তখন মনে হইল এর চেয়ে বড় ঘোম্‌টা বুঝি আর নাই। তখন তিনি জয়াকে একটু খোঁচা দিয়া বলিলেন—বিপিন আমার তেমন ছেলে নয়; সে তার বাপের ধারা একটুও পায়নি।

জয়া এই প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপে লজ্জিত হইয়া এই গ্লানি চাপা দিবার জন্য

যখন ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে তখন তাকে অব্যাহতি দিয়া বাহিরে গুড়ুম গুড়ুম শব্দে বন্দুক ও বোমা আওয়াজ হইল এবং রোহিণী হাততালি দিয়া চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল—দাদা-বাবু এস্‌তেছে! দাদা-বাবু এস্‌তেছে!

গিন্নি অম্‌নি চীৎকার করিতে লাগিলেন—ওরে ওখানে শূন্য কলসী রাখলে কে? সরা সরা···না না, ভোরে দে ভোরে দে। আ মর্, সব ন্যাকা যেন, সবাই মিলে তাল পাকিয়ে ঘুরপাক খেতে লাগল। শীগ্‌গির কর্ না, বিপিন এসে পড়বে যে।

পাঁচ-সাতজন চাকরদাসী শূন্য কলসী ভরিতে ছুটিল। অন্যান্য সকলে বিপিনের আগমন-প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া স্থানে স্থানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই বিপিন স্মিতমুখে উঠানে প্রবেশ করিল। তাকে দেখিতে পাইয়াই বিনি দৌড়িয়া গিয়া বিপিনের হাঁটু দুটি জড়াইয়া ধরিল; বিনোদও দুই লাফে অগ্রসর হইয়া দাদার হাতখানিকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া নাচিতে নাচিতে বলিতে লাগিল—'ওরে দাদা এসেছে রে! দাদা এসেছে রে!' বিনিও দাদার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে লাগিল—'ওলে দাদা এচেচে লে! দাদা এচেচে লে!

বিপিন স্মিতমুখে বিনি ও বিনোদের মুখচুম্বন করিয়া বিনিকে বুকে তুলিয়া লইল এবং বিনোদের হাত ধরিয়া মাকে প্রণাম করিতে গেল। গিন্নি ব্যস্তভাবে তার প্রণামে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন—আরে বোকা ছেলে রোস রোস! আগে পূর্ণঘটকে পেন্নাম কোরে ঠাকুরকে পেন্নাম কর্, তবে ত আমাকে পেন্নাম কর্‌বি।

বিপিন হাসিয়া বলিল—তোমার চেয়ে আমার বড় ঠাকুর আর কেউ নেই মা। ঠাকুর আমার মাথায় থাকুন, তোমায় ত আগে প্রণাম করি।

গিন্নি প্রসন্ন হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—তোরা সব এখন ইংরিজী পোড়ে খিষ্টান হয়ে গেছিস্। তবু আমরা যে-কদিন আছি আমাদের মতেই একটু চলিস্।

বিপিন হাসিয়া বলিল—আচ্ছা, কি কর্‌তে হবে চটপট বলো সেরে নি, তুমি আমার প্রণামটাকে মুল্‌তুবি রেখে একেবারে জুড়িয়ে দিচ্ছ। কি কর্‌তে হবে বলো।

গিন্নি ঘট দেখাইয়া বলিলেন—এই পূর্ণ ঘটকে পেন্নাম কর্, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

বিপিন বলিল—না মা, ঐ সব যা-তাকে প্রণাম করা আমায় দিয়ে হবে না। আমি ও ঘট-ফটকে প্রণাম কর্‌ব না। আমি তোমাকেই প্রণাম করি।

বিপিন মাতার পায়ের কাছে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া মাতার পায়ের ধুলা মাথায় লইল। গিন্নি স্মিতমুখে স্নেহের অনুযোগ করিয়া বলিলেন—তুই কি মা ছাড়া আর কিছুই জান্‌বি নে?—এবং তারপর বিপিনের দাড়িতে হাত দিয়া নিজের হস্ত চুম্বন করিয়া বলিলেন—বৌ ঘরে এলে দেখব, কেমন তখন মাকে মনে থাকে।

বিপিন হাসিয়া বলিল—সে রকম আশঙ্কা আছে বোলেই ত বৌকে ঘরে আমল দিইনি।

বিবাহের কথা উঠিতেই বিপিনের মালতীকে মনে পড়িল। বিপিন চারিদিকে একবার চোখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—মা, খুড়িমা কৈ?

গিন্নিও চারিদিকে চাহিয়া খুড়িমাকে না দেখিয়া বলিলেন—এই ত ছিল। কোথায় গেল আবার? বোনঝিকে নিয়ে চোলে যাওয়া হয়েছে বুঝি! যা ত রোহিণী, ডেকে আন্‌গে ত।

বিপিন বাধা দিয়া বলিল—না রোহিণী, ডাকতে হবে না, আমিই যাচ্ছি।

গিন্নি বারণ করিতে পারিলেন না, কিন্তু খুড়িমার প্রতি বিপিনের টান দেখিয়া তাঁর মন একটু অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

জয়া মনে করিয়াছিল বিপিন তাকে একটা প্রণাম করিবে, কিন্তু তার কোনো সম্ভাবনা না দেখিয়া খুড়িমার সৌভাগ্যে সেও ঈর্ষাক্ষুণ্ণ হইল।

বিপিন খুড়িমার উদ্দেশে প্রস্থান করিলে ছেলে মেয়ে বৌ ঝি সকলেই পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। আজ বিপিনকে সবিস্ময় আনন্দে দেখিয়া দেখিয়া কারো তৃপ্তি হইতেছিল না। আজ যেন সে নূতন হইয়া সকলের নিকট ফিরিয়াছে।

বিপিন খুড়িমার ঘরের নিকটে গিয়াই ডাকিল—খুড়িমা!

খুড়িমা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন—এস বাবা এস!

বিপিন ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া খুড়িমার পায়ের ধূলা মাথায় লইল। খুড়িমা উচ্ছ্বসিত অশ্রুবেগ অতিকষ্টে অবরুদ্ধ করিয়া বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলিলেন—প্রাতঃবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি, সুখী হও বাবা।

মালতীকে দেখিবার জন্ম বিপিনের কৌতূহল তাকে তাগিদ ও পীড়া দিতেছিল। তাই সে হাসিয়া বলিল—খুড়িমা ঘরে চলো, দরজা থেকেই বিদায় করবে নাকি?

খুড়িমা অপ্রস্তুত ও বিব্রত হইয়া বলিলেন—এস বাবা এস। কিন্তু তুমি এখানে দেরি করলে দিদি যে রাগ করবেন।

—তা হয় ত একটু করবেন। কিন্তু মায়ের রাগ ভুলিয়ে দিতে কতক্ষণ?—বলিয়াই বিপিন ঘরে প্রবেশ করিল।

ঘরে প্রবেশ করিতেই বিপিন দেখিল একটি অপরূপ রূপসী নিরাভরণ

তরুণী একপাশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বিপিনকে দেখিবামাত্রই তার দৃষ্টি লজ্জায় কৌতূহলে চঞ্চল উজ্জ্বল হইয়া তার সৌন্দর্য্যের মোমবাতিতে যেন শিখা জ্বালিয়া তুলিল।

বিপিন মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিল—এই মালতী! এত সুন্দর! এমন রূপ ত সে কল্পনাতেও গড়িয়া তুলিতে পারে নাই! তার চোখ দুটি যেন শরতের আকাশ-কাটা টুক্‌রা, তার গালদুটি যেন গোলাপের পাপড়ি, মুখটি যেন ডালিমের ফুল, বর্ণে যেন শুক্তির লাবণ্য! সে যেন মূর্ত্তিমতী উষা! সাক্ষাৎ বসন্তশ্রী!

বিপিন ও মালতীর চার চোখ এক হইল। বিপিনের স্বচ্ছ উদাম দৃষ্টি সবিস্ময় প্রশংসায় ভরিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া মালতীর সরম-কোমল দৃষ্টি নত হইয়া পড়িল। তার মুখের উপর স্মিতরেখা ফুটিয়া উঠিল। বিপিন দেখিল সেই নিখুঁত মুখখানিতে সেই হাসিটি বিশ্বশিল্পীর চরমনিপুণতার তুলিকাপাত!

বিপিনকে দেখিয়া মালতীরও মন প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। সে দেখিল বিপিন উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মাঝারি আকারের মানুষটি: মুখশ্রী তার অতি কোমল, প্রিয়দর্শন প্রশান্ত হাস্যময়; চোখদুটি করুণা সরলতায় সর্ব্বদাই টলটল ছলছল করিতেছে; তার স্বচ্ছ দৃষ্টির ভিতর দিয়া তার কোমল প্রকৃতি উঁকি মারিয়া যাইতেছে; তার উন্নত নাসিকা যেন অল্পেই অভিমানে স্ফুরিত হইয়া উঠে; ললাট তার জ্ঞানের দীপ্তিতে উজ্জ্বল; সে বেশভূষাতে ফিটফাট, পায়ের নখটি হইতে কুঞ্চিত কেশের বিন্যাস পর্য্যন্ত সমস্ত পরিপাটী। বিপিনের বাহিরটি যেন তার অন্তরেরই দর্পণ। বিপিনকে পরমাত্মীয় বলিয়া স্বীকার করিতে মালতীর চোখের দেখা ছাড়া দ্বিতীয় প্রমাণের আর অপেক্ষা রহিল না। দুটি তরুণ হৃদয় প্রথম সাক্ষাতের আনন্দেই পরস্পরের অভিমুখ হইয়া উঠিল।

বিপিন ও মালতীর এই দৃষ্টি-বিনিময় খুড়িমার দৃষ্টি এড়াইল না। খুড়িমা ইহাতে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন; মালতী বিপিনকে দেখিবার জন্য যেই দ্বিতীয় বার মাথা তুলিয়াছে অমনি খুড়িমার রূঢ় দৃষ্টি তাকে সচেতন করিয়া দিল। এই তিরস্কার বিপিনেরও অগোচর রহিল না।

মালতী ঘর হইতে প্রস্থান করিবার জন্য দ্বারের দিকে গমন করিল। বিপিন অমনি 'এখন মার কাছে যাই' বলিয়া হঠাৎ অপর দিকের দ্বারের দিকে চলিয়া গেল।

প্রকাণ্ড ঘরের দুই প্রান্তের দুই দ্বারের কাছে আসিয়া মালতী ও বিপিন উভয়েই একবার ফিরিয়া চাহিল। আবার তাদের দৃষ্টি-বিনিময় হইল। মালতী তার ডাগর চোখের দীর্ঘ বক্র পক্ষ্মজালের মধ্য দিবা বিপিনের দিকে স্নিগ্ধ করুণ সরমসন্নত দৃষ্টিতে এমন ভাবে চাহিল যেন আজ সে বিপিনের মধ্যে নিজের আশ্রয়, নিজের সান্ত্বনা, নিজের বন্ধুকে দেখিতে পাইয়াছে। তারপর মালতী দ্বারের বাহিরে দণ্ডায়মানা পুরনারীদের ভিড়ের মধ্যে ডুবিয়া গেল।

এই একটি চকিত দৃষ্টি দিয়া বিপিনও দেখিয়া লইল মালতীর দৃষ্টি যেন একটি ভীরু আত্মীয়তার পরিচয় জানাইয়া গেল। মালতীর সর্ব্বঅবয়বে যৌবনের উচ্ছ্বসিত আনন্দ দীপ্যমান; জলস্রোতে জ্যোৎস্নাপাতের মতো একটি সম্ভ্রমসংযত সজীবতা তার সর্ব্বাঙ্গে ঝলমল করিতেছে। তার লজ্জা দিয়া এই ঢলঢল লাবণ্যরাশি ঢাকিবার চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া কাচের আবরণে তড়িৎশিখার মতো তাহা ক্ষণে ক্ষণে দৃষ্টিতে হাসিতে তনুলতার হিল্লোলে চকিত হইয়া উঠিতেছিল।

বিপিন মুগ্ধ হইয়া ফিরিল। আতপচ্ছন্ন দৃষ্টির সম্মুখে যেমন শত সূর্য্যের ছবি নাচিতে থাকে, বিশ্বচরাচর কম্পিত হইতে থাকে, তেমনি বিপিনের

অন্তরে বাহিরে মালতীর রূপচ্ছবি ভরিয়া উঠিল। বিপিন যাইতে যাইতে আবার মুখ ফিরাইল, কিন্তু আর মালতীকে দেখিতে পাইল না।

বিপিনের এই এতক্ষণের প্রসন্ন মুখ সহসা এক মুহূর্তে গম্ভীর হইয়া উঠিল। মালতীর সঙ্গে কেমন করিয়া পরিচয় করা যায় এই চিন্তা তাকে পাইয়া বসিল! বিপিনের মনে হইল এই তরুণী বিপিনেরই পরিজন দ্বারা অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত, সে এই এতবড় পরিবারের সহিত সম্পর্কশূন্য একাকী। সমবেদনায় বিপিনের চিত্ত ভরিয়া উঠিতে লাগিল। তার মনে হইতে লাগিল এই-সব সেকেলে ধরণের লোকদের সঙ্গে তারও ত বনিবে না, নিজের পরিবারে সেও ত নিসঙ্গ একাকী। যদি সে কোনো প্রকারে মালতীর সহিত ঘনিষ্ঠ আলাপ করিয়া লইতে পারে তাহা হইলে মালতীও সঙ্গ পায়, সেও সঙ্গ পাইয়া বাঁচে। এই পরিচয়ের :মধ্যে উভয়েরই স্বার্থ আছে—এ বাড়ীতে টিকিয়া থাকিতে হইলে তাদের উভয়ের পরিচয় হওয়াই আবশ্যক।

বিপিন মালতীর সহিত আলাপ পাতাইবার শতেক উপায় উদ্ভাবন করিল, কিন্তু কোনটাই মনঃপূত হইল না। কেবলি মনে হইতে লাগিল সবচেয়ে যেটি ভালো অথচ সহজ উপায় সেটি নবকিশোর ফাঁকি দিয়া প্রথমেই আত্মসাৎ করিয়া খরচ করিয়া ফেলিয়াছে। হায় হায়! সেদিন যদি বিপিন নবকিশোরের সঙ্গে মালতীর বাড়ীতে যাইত তাহা হইলে মালতীর সহিত পরিচয় ত তার হইয়াই থাকিত, আজ আর আলাপের উপায় খুঁজিতে এমন করিয়া মাথা ঘামাইতে হইত না। কেন তার অমন কুবুদ্ধি ঘটিয়াছিল! ভাবিতে ভাবিতে তার মনে হইতে লাগিল নবকিশোর যেন ঠকাইয়া তার আগে মালতীর সহিত পরিচয় করিয়া লইয়াছে। বিপিন নিজের কাছে স্বীকার না করিলেও নবকিশোরের সৌভাগ্যে তার মন ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

ভাবপ্রবণ বিপিন ভাবের ঝোঁকে এমনি করিয়াই নিজেকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল। ভাবজাল বিস্তার করিয়া মালতীকে ধরিবার জন্য যতই সে ফন্দি আঁটিতেছিল নিজেই তত জড়াইয়া গিয়া নির্গমনের পন্থা খুঁজিয়া পাইতেছিল না মালতীর সহিত আলাপ করিবার জন্য যতই বেশী ব্যগ্র হইয়া উঠিতেছিল ততই তার নিকট সকল উপায়ই অতিমাত্র বিসদৃশ ও লজ্জাজনক বলিয়া ঠেকিতে লাগিল। এক-একবার তার মনে হইতে লাগিল তার মন্ত্রী নবকিশোরের শরণ লইলে সকল সমস্যার হয়ত সহজেই সমাধান হইয়া যাইতে পারে; কিন্তু নবকিশোরের অনায়াস-সফলতা তার এই দুষ্কর প্রয়াসকে উপহাস করিবে মনে করিয়া লজ্জায় বিপিন কিছুতেই নবকিশোরের পরামর্শ লইতে মনকে স্বীকার করাইতে পারিল না।

বিপিন যখন খুড়িমার ঘর হইতে ফিরিয়া আসিল তখন এ বিপিন যেন আর সে বিপিন নহে; যে হাসিমুখে গিয়াছিল, সে আঁধার মুখে ফিরিয়া আসিল দেখিয়া নানা জনে নানারূপ জল্পনা করিতে লাগিল। গিন্নি মনে করিলেন নিশ্চয়ই ছোটবৌ তাঁর নামে তাঁর ছেলের কাছে একখানা কথা সাতখানা করিয়া লাগাইয়া ছেলের মন ভারী করিয়া দিয়াছে। অপর সকলে ভাবিল নিশ্চয় ঐ ডাইনি ছুঁড়ি গুণ করিয়াছে।

এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া গিন্নি খুড়িমাকে বেশ দশকথা ঝালঝাল শুনাইয়া দিলেন। বিপিন যে একবাড়ী লোকের সাক্ষাতে তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়া গেছে খুড়িমার অশ্রুজলসিক্ত ঐ কৈফিয়ত গিন্নিকে কিছুতেই নিঃসন্দেহ করিতে পারিল না। পুরস্ত্রীরা মিলিয়া মালতীকে উঠিতে বসিতে কটু কথায় ত্যক্ত করিয়া তুলিল। মালতী কিন্তু নীরবেই সকল অত্যাচার উপেক্ষা করিয়া যাইতে লাগিল।

তিন-চারিদিন বিপিন বাড়ী আসিয়াছে, কিন্তু সেই প্রথম দর্শনের পর মালতীকে দেখিতে পাওয়ার সৌভাগ্য তার আর হয় নাই। তার মন বিরস হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম সাক্ষাতের পরই সে ভাবিয়াছিল যাদুকরের মায়াতরুর মতো তাদের প্রণয়বীজ এক মুহূর্ত্তেই অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়া উঠিবে এবং সেই পুষ্প লইয়া একটি চিরকিশোর দেবতা যে শর তৈরি করিবে তার আঘাত সে একাই সহ্য করিবে না, তার আঘাতে ব্যস্ত হইয়া মালতীও এখন হইতে কোনো-না-কোনো ছুতায় ঘুরিয়া ফিরিয়া তাকে দেখা দিবে। বিপিন দেখিল যে, সে ভুল বুঝিয়াছিল—মালতী বিপিনের ত্রিসীমানা মাড়ায় না, বিপিনের অনাবশ্যক যাতায়াতের পথেও দৈবাৎ একবার দেখা দেয় না। ঘন ঘন খুড়িমার ঘরের দিকে যাইতে বিপিন নিজের কাছেই লজ্জা অনুভব করে বলিয়াই তার মনে হয় অপরেও বুঝি তার ছল বুঝিতে পারিতেছে; তার আর যাওয়া হয় না। যদি বা কখনো বিশেষ চেষ্টার পর সে খুড়িমার ঘরে যায়, তথাপি সেখানে মালতীকে সে দেখিতে পায় না, মালতী তার সাড়া পাইলেই সেখান হইতে সরিয়া যায়। যে খুড়িমার ঘর আগে তার সমস্ত দিনের আশ্রয় ছিল, সেই খুড়িমার ঘরেও অধিকক্ষণ বিলম্ব করার তার আর জো নাই—খুড়িমার ঘরে সে গেলেই খুড়িমা কেমন বিষণ্ণ সন্ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া তাকে গম্ভীর ভাবে বলেন—আমার ঘরে তুমি ঘন ঘন এসোনা বাবা, দিদি রাগ কোরে আমার আবার খোয়ার করবেন।—এর পর তাঁর ঘরে বিলম্ব করা বিপিনের পক্ষে সম্ভব হইত না। তার স্নেহময়ী খুড়িমার এই নিষ্ঠুর পরিবর্ত্তনের কারণ অনুমান করিতে পারিলেও সে বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিত।

মিলনের পথে বাধা পাইয়া পাইয়া একগুঁয়ে ভাবপ্রবণ বিপিন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতে পারিত, কিন্তু তাকে দমন করিয়া রাখিয়াছিল মালতীর অতিসাবধান ব্যবহার। মালতী যে সাধ্যপক্ষে বিপিনের সম্মুখে দেখা দিতেছিল না, এবং হঠাৎ সাম্‌নে পড়িয়া গেলেও খুব কুণ্ঠিত সম্ভ্রমে সরিয়া যাইত, তাতে বিপিন একটু নিরুৎসাহিতই হইয়া পড়িতে লাগিল। ক্রমে তার চৈতন্য হইতে লাগিল যে, মালতী বিধবা; বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে বিপিনের নিজের মত যাই হোক না কেন, একজন বিধবার মতামত না জানিয়া তার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করা, তাকে অপমান করারই নামান্তর। তা ছাড়া মালতী তাদেরই আশ্রিত; এমন অবস্থায় বিপিনের দিক হইতে কিছুমাত্র অসংযত ব্যবহার বা প্রগল্‌ভতা, অবস্থার সুবিধা পাইয়া মালতীকে জালে জড়াইবার চেষ্টা বলিয়া মালতীর মনে হইতে পারে; মালতী স্বাধীন স্বতন্ত্র হইলে বিপিন যতখানি অসঙ্কোচে তার কাছে আপনার অভিলাষ প্রকাশ করিতে পারিত, মালতী তার নিতান্ত হাতের মুঠার ভিতর আটক আছে বলিয়া সেরূপ করিবার উপায় বিপিনের মোটেই নাই। অধিকন্তু বিপিনের পরিজনেরা মালতীর প্রতি যেরূপ প্রতিকূল হইয়া আছে, তাতে এক্ষণে একটুমাত্রও ব্যবহারের ব্যতিক্রম ঘটিলে মালতীর উপর অত্যাচার বৃদ্ধি করারই কারণ হইবে। তখন বিপিন সবলে আপনাকে দমন করিতে লাগিল। আপনার উদ্দাম আবেগ দমন করিবার জন্য বল-প্রয়োগ করিতে করিতে বিপিন ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল। সে আপনাকে নিরাশ্রয় দুর্ব্বল মনে করিতে লাগিল। এগ্‌জামিন দেওয়ার বিষম ব্যস্ততার পরে একেবারে নিষ্কর্ম্মা হইয়া একেই বিপিনের ফাঁকা-ফাঁকা লাগিতেছিল, তার উরর এই দুর্বিপাক উপস্থিত। এখন সে নিজেকে কোনো একটা কাজে লিপ্ত করিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

তখন বিপিনের মনে পড়িল কলিকাতা হইতে আসিবার সময় নবকিশোরের সঙ্গে সে পরামর্শ স্থির করিয়া আসিয়াছে যে তার পরিবারস্থ সকল স্ত্রীলোককে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য একটি পাঠসভা করিতে হইবে। একদিন বিপিন তার মাতার নিকটে বাড়ীর প্রায় সকল মেয়েদের সমবেত হইয়া অকাজে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া প্রস্তাব করিল—দেখ মা, আমি মনে করেছি, রোজ দুপুরবেলা তোমাদের ভালো ভালো বই পোড়ে পোড়ে শোনাব। দুপুরবেলা তোমাদের কারো ত কোনো কাজ থাকে না, তাস খেলে কড়ি খেলে সময় নষ্ট কর বৈ ত নয়। তারচেয়ে বই থেকে দুটো ভালো কথা শোনা কি ভালো নয়? কি বলো তোমরা?

এই প্রস্তাবে কারো তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। গিন্নি ছেলের মনরাখা রকমে বলিলেন—তা বেশ ত। কাল থেকে ঐ দালানে সবাই বোসে শুন্‌বে, তুই পড়িস্।

জয়া বিপিনের প্রসন্নতা লাভের জন্য বলিল—তা আমরা শুন্‌ব। তবে ইংরিজি-টিংরিজি পোড়ো না বাবা; ইংরিজিতে শোন্‌বার মতন কিছু নেই, ও ত পাঁচু পড়ে শুনেছি—শুধু ঘোড়া গাধা গোরু আর ঘাস-কাটার গল্প।

এই বলিয়া জয়া পাঁচুর মার দিকে চাহিয়া হাসিল, যেন তার কথার যদি কেউ সমঝদার থাকে ত সে একমাত্র পাঁচুর মা। পাঁচুর মা দুই আঙুলে ঘোম্‌টা ফাঁক করিয়া চোখ মটকাইয়া জয়ার হাসিতে হাসিয়া সায় দিল, ভাবটা,—বড় মিথ্যে বলোনি জয়া-পিসি!

ক্ষমা বলিল—না, ইংরিজি-টিংরিজি গল্প আমাদের ভালো লাগবে না। বেহুলা-লখিন্দর, কমলে কামিনী, গোলেবকাওলি—এই সব গল্প বেশ!

মোক্ষদা বিজ্ঞভাবে বলিল—ওসব ত মহাভারতের গল্প।

গিন্নি উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ বিপিন, তুমি মহাভারত পড়িস্। সময়ও কাট্‌বে, ধর্ম্মও হবে।

বিপিন হাসিয়া বলিল—আচ্ছা তাই হবে। কাল থেকে আমি মহাভারত পড়ব। তোমাদের কিন্তু সবাইকে বোসে শুন্‌তে হবে।

জয়া বলিল—তা শুন্‌ব বৈ কি বাবা।

বিপিন চলিয়া গেলে একে একে সকল মেয়েই গিন্নির নিকট হইতে উঠিয়া অন্য ঘরে গিয়া জড়ো হইল। পাঁচুর মা বলিয়া উঠিল—এই এক ফ্যাসাদ জুট্‌ল দেখছি।

ক্ষমা বলিল—সত্যি ভাই, দুপুর বেলাটা একটু শুতে গড়াতে পাব না, দুটো কথা কইতে পাব না, একটু খেল্‌তে পাব না, চুপ কোরে মুখ বুজে বোসে থাক্‌তে হবে। আমার ত ভাই ঢুলুনি আস্‌বে। বিপিন-দাদা এ এক বিপদ করলে।

জয়া বলিল—আরে অত ভাবছিস্ কেন? বিপিন ছট্‌ফটে মানুষ। দুদিনের বেশি একজায়গায় ও স্থির হয়ে থাক্‌তে পার্‌বে ভেবেছিস্?

পরদিন দ্বিপ্রহরে বড়দালানে ফরাশ বিছাইয়া পাঠসভা বসিল এবং বিপিনের জন্য একখানি আসন পৃথক পাতা হইল। বিপিন কালীপ্রসন্ন সিংহের গদ্য মহাভারত বগলে করিয়া পাঠসভায় আসিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—সকলেই দালানের ফরাশে বসিয়া আছে, কেবল খুড়িমা ঘর হইতে দালানে আসিবার দরজার কাছে মাটিতে বসিয়া আছেন, এবং তাঁর পশ্চাতে দরজার আড়ালে লুকাইয়া অপর একজন কেহ আছে।

বিপিন একটি চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পড়িতে বসিল। পড়িতে পড়িতে তার মন উৎসাহিত হইয়া উঠিল, সে মহাভারতের মধ্যেকার ভৌগোলিক সংস্থান, ইতিহাসের ইঙ্গিত, সমাজতত্ত্ব, চরিত্রের বিশেষ

বুঝাইয়া বুঝাইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। সে মহাভারতের ঘটনার দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতে লাগিল প্রাচীন ভারতে জাতিভেদ ছিল না, ছোঁয়া-ছুঁয়ির ভয় ছিল না, বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ হইতে পারিত, বাল্যবিবাহ লোকের স্বপনেরও অতীত ছিল। এই-সব প্রথা পরে কেমন করিয়া নিষিদ্ধ বা প্রচলিত হইয়াছে এবং তাতে সমাজের কি কি অনিষ্ট হইয়াছে তাহা বুঝাইবার সময় মুখচোরা বিপিনের বাগ্মিতা দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইতে লাগিল। বিপিন পাঠ করিতে করিতে এক-একবার যখন মাথা তুলিতেছিল, তখনই দেখিতে পাইতেছিল দুটি ডাগর চোখের ব্যগ্র দৃষ্টি কপাটের আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া মারিয়া যেন তার কথা পান করিতেছে; তার চোখে চোখে মিলিত হইবামাত্র সেই কালো চোখ দুটির উৎসুক দৃষ্টি নত হইয়া সরিয়া যাইতেছিল। সমস্ত শ্রোত্রীরা পুত্তলিকার মতো ভাবশূন্য দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া বসিয়া আছে। কেহ হাই তুলিতেছে, কেহ ঢুলিতেছে, কেহ ফিস্-ফিস্ করিয়া অবিরাম কথা কহিতেছে; কিন্তু দ্বারের অন্তরালবর্ত্তিনী শ্রোত্রীটির যে ঔৎসুক্য ও আগ্রহের অভাব নাই তা তার দৃষ্টি দেখিয়া বিপিন বুঝিতে পারিতেছিল।

বিপিন হঠাৎ পাঠ বন্ধ করিয়া "আজ এইখানে থাক" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এবং কারো কোনো উত্তরের প্রতীক্ষামাত্র না করিয়া বই বগলে তুলিয়া হনহন করিয়া দালান হইতে ঘরের মধ্য দিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় আর-একবার অন্তরালবর্ত্তিনী শ্রোত্রীটির সলজ্জ কুণ্ঠিত দৃষ্টির সঙ্গে বিপিনের সপ্রশংস দৃষ্টির বিনিময় হইয়া গেল।

জয়া তুড়ি দিতে দিতে সশব্দে হাই তুলিল। ক্ষমা মোক্ষদাকে ঠেলা দিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—'এই মুক্ষী, ঢুলে পোড়ে যাবি যে!' পাঁচুর মা ঘোম্‌টা খুলিয়া হাঁপ ছাড়িল। গিন্নি বলিলেন—এস

জয়া-ঠাকুরঝি, একটু তাস খেলা যাক্! রোহিণী তাসজোড়া আন্‌গে ত।

খুড়িমা আস্তে আস্তে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। মালতীর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, সে আগেই কখন্ উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে।

১৭

বিপিন যখন মহিলাদের পাঠসভা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল, নবকিশোরও তখন নিশ্চিন্ত ছিল না। সে মথুরাপুরে পিতার টোলটিকে কেন্দ্র করিয়া মণ্ডলে মণ্ডলে পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করিতেছিল।

তার পিতার টোলের পুরাতন ছাত্র ছাড়াও তার বিদ্যার খ্যাতি শুনিয়া অনেক নূতন ছাত্র ভর্ত্তি হইতে লাগিল। তাদের কেহ ব্যাকরণ, কেহ স্মৃতি, কেহ বা বেদান্ত, এমনি এক-একটি মাত্র বিষয় পড়িবার সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছে। নবকিশোর তাদের বলিল—দেখ, আমার টোলে কেবলমাত্র একটি বিষয় কেউ শিখ্‌বে না। মানুষের জ্ঞান বহুমুখ না হলে তার চিন্তাশক্তি সজীব হয় না, সমস্ত জগৎব্যাপারের সঙ্গে তার যোগ হয় না।

অভিরাম নামক একজন ছাত্র বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া টিকি নাড়িয়া বলিল—আজ্ঞে, তা হলে এ যে একেবারে স্কুল হবে। ম্লেচ্ছ রকমেই যদি শিখ্‌ব তবে টোলে এলাম কেন।

নবকিশোর গম্ভীরভাবে বলিল—আমার টোল এই রকম ম্লেচ্ছ ধরণেরই হবে। যে-সব ছাত্র শিক্ষার আর জ্ঞানের জাতিবিচার করে তাদের জন্য আমার এ টোল নয়। তারা স্বচ্ছন্দে বিদায় নিয়ে নিবারণ-মুখুয্যের টোলে যেতে পারে।

ইহা শুনিয়া সকল ছাত্রই নীরব হইয়া রহিল। নবকিশোর বলিতে

লাগিল—শিক্ষা শেষ কোরে প্রত্যেক ছাত্রকে আমায় গুরুদক্ষিণা দিতে হবে, এবং সেজন্যে ভর্ত্তি হবার সময়েই একটা অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর কোরে দিতে হবে।

অভিরাম ভয়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে নবকিশোরের দিকে চাহিয়া বলিল—আজ্ঞে, এ ত বড় কঠিন কথা! আপনার দাবী যদি আমাদের সাধ্যাতীত হয় তবে ত প্রতিজ্ঞাভঙ্গজনিত পাপে নিরয়গামী হবই, অধিকন্তু চাইকি আপনি চুক্তিভঙ্গের নালিশ কোরে জেল খাটিয়েও ছাড়্তে পারেন।

নবকিশোর হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল—ভয় নেই অভিরাম, আমি বেদ ঋষির মতন শুভশুক্লা রাণীর কাণের কুণ্ডল চাইব না, আর তার জন্যে উতঙ্কের মতন তোমাদের নাগলোকে ছুটোছুটি কর্‌তেও হবে না; কিংবা বরতন্তুশিষ্য কৌৎস্যের মত রঘুরাজারও শরণাপন্ন হতে হবে না। আমার প্রার্থনা যৎসামান্য। যাঁরা আমার টোল থেকে উপাধি নিয়ে বেরুবেন তাঁরা অন্ততঃ তিন বৎসর আমার গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষা দিয়ে যাবেন; সেই কয় বৎসরও তাঁরা ছাত্রাবস্থার মতন কেবলমাত্র খোরপোষ পাবেন। আর এক কথা বোলে রাখি, আমার টোলে আমি বিবাহিত ছাত্র নেবো না; টোলে থাক্‌তে থাক্‌তে কেউ বিবাহ কর্‌তে পাবে না; কারণ, শিক্ষা সমাপ্ত কোরে গার্হস্থ্য-আশ্রমে প্রবেশ করাই আমাদের দেশের সনাতন নিয়ম।

এমন সময় নবাব্দি মণ্ডল ও তার পুত্র আস্‌মত আলি নবকিশোরের টোলের রকের নীচে আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। নবাব্দি হরিবিহারী বাবুর একজন সম্ভ্রান্ত প্রজা।

নবকিশোর তাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রতিনমস্কার করিয়া বলিল—নবাব্দি কাকা যে, এস এস। সঙ্গে আসমৎ বুঝি? ওকে

ছোটবেলায় দেখেছি, এখন বড় হয়েছে, চেন্‌বার জো নেই। এস তোমরা ওপরে উঠে এস।

অভিরাম আপত্তির স্বরে বলিয়া উঠিল—এঁ! ওপরে আসবে কি?

নবকিশোর তার দিকে ফিরিয়া ভ্রুকুটি করিয়া বলিল—কেন? আপত্তি কি?

অভিরাম টিকি আস্ফালন করিয়া বলিল—যবন নেড়ে টোলে উঠ্‌লে টোল অপবিত্র হবে না!

নবকিশোর হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল—তা বটে। নবান্দি-কাকারও আপত্তি হতে পারে তোমাদের মতন কাফেরের সঙ্গে এক জায়গায় বস্‌তে। তোমাদেরই শাস্ত্রে না বলে যে "রুচীনাং বৈচিত্র্যাৎ ঋজুকুটিল-নানা-পথজুষাং নৃণাম্ একো গম্যস্ত্বমসি পয়সাম্ অর্ণব ইব!" তোমাদেরই শাস্ত্রের না উপদেশ "সর্ব্বদেবময়োঽতিথি! সর্ব্বত্রাভ্যাগতঃ গুরুঃ!" তোমরা শাস্ত্রের নির্দ্দেশ সুবিধামত কতক মানো কতক মানো না—অর্থাৎ কিনা নিজেরই প্রবৃত্তির বশেই চল, শাস্ত্র শুধু একটা আবরণ মাত্র। যদি তোমাদের শাস্ত্রের এ কথায় আস্থা না থাকে, তোমরা উঠে চলে যেতে পারো।......এস নবান্দি-কাকা, নীচে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

নবান্দি কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—থাক্ বাবা, আমি এখানেই বেশ আছি......

নবকিশোর নীচে নামিয়া গিয়া দুই হাতে দুজনের দুই হাত ধরিয়া উপরে তুলিয়া লইয়া আসিল এবং এক রকম গায়ের জোরে তাদের ফরাসের উপর বসাইল!

অভিরাম প্রভৃতি বিরক্ত ও সঙ্কুচিত হইয়া সরিয়া বসিল, কিন্তু কেউ উঠিয়া গেল না।

নবকিশোর তাদের লক্ষ্য না করিয়াই বলিল—তারপর নবান্দি-কাকা, তোমাদের সব ভালো ত ? কি মনে কোরে আসা হয়েছে ?

—আল্লার দোয়াতে সব খয়ের বাবা। আস্‌ছে এৎওয়ারে আস্‌মতের আর আমার নিকাহ্‌া-বেটা রহমতের সাদি হবে। তাই হুজুরে এত্তেলা করতে এসেছিলাম।

নবকিশোর জিজ্ঞাসা করিল—কাকা-বাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

—মুলাকাৎ হয়েছে, হুজুরের হুকুমনামা পেয়েছি। ছোটবাবু কল্‌কাত্তা থেকে এসেছেন দেখলাম, তিনি আমার গরিবখানায় পায়ের ধুলো দেবেন কবুল করেছেন; তুমিও যদি মেহেরবানি কোরে একবার যাও ত বড় খুসী হব বাবা।

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—নিশ্চয় যাব।

নবান্দি পুত্রকে বলিল—দে দে, বাপজীকে একখানা খত দে।

আস্‌মত একখানি গোলাপী রঙের কাগজে সোনালি ছাপা নিমন্ত্রণ-পত্র দিল। নবকিশোর পড়িতে লাগিল—

শ্রীশ্রীহকনামজী ভরসা

করিম রহিম আল্লা খালেক গফ্‌ফার
দোন্‌ জাহানের বিচে মালেক সবার।
পহেলা তাঁহার নাম করিয়া ছজুদ,
দুএমেতে নবি-পরে ভেজিব দরুদ।
মহম্মদ মুস্তাফা যিনি হবিব আল্লার,
তাঁহার উপরে ভেজি দরুদ হাজার।
ছিএমেতে চার ইয়ারে কুর্নিস হাজার,
চাহারমে আমি বান্দা বড় গুনাহ্‌গার।

পরেতে আরজ এই সবার জোনাবে—
দুইটি কেব্‌লার মেরা শুভ সাদি হবে।
২৫শে অগ্রাণ, সন হাল এৎওারে
নওসা দোন আসিবেন সাদি করি ফিরে।
সেই অছিলায় থোড়া তাআম গরিবানা
তৈয়ার করিব আমি ভাবিয়া রব্বানা।
এ খাতেরে আরজ ও উম্মেদ আমার
তারিখ মজকুর, ওয়খৎ শাম, এৎওার
মায় খেশ বেরাদর হাম্‌শবায় লইয়া
গরিবখানায় সবে পৌছিবেন আসিয়া।
মেহের নজরে তাআম তানাওল করে
সর্‌ফরাজ করাইবেন এই অধীনেরে।
কদমের ধূল যেন পাই সবাকার,
খিদ্‌মতে হইব রুজু খাহেশ আমার।
মজ্‌লিশ রওশন মেরা করিবেন আসিয়া
হস্‌রৎ মিটিয়া যাবে দিদার দেখিয়া!
হীন শ্রীসেখ নবাব্দি মণ্ডল অধীনের নাম,
মৌজা শীতলপুরে জানিবেন মেরা বাসধাম।
পত্রের দ্বারায় সকলেরে করিলাম এতাদা,
আসিতে গরীব বলে না হবে রঞ্জিদা।
এই তক্ হইল ইতি সকলে জানিবে।
আমি অধীনের কেহ খতা না ধরিবে।
আপনকার জানিবেন এই শুভ কাম,
দাওতের পত্র ইতি, বান্দারও সেলাম।

পত্র পড়িয়া নবকিশোর খুব হাসিতে হাসিতে বলিল—নবাব্দি-কাকা, এ করেছ কি ? এ না হয়েছে বাংলা, আর না হয়েছে উর্দ্দু ! বাঙালীতে বাঙালীদেরই নেমন্তন্ন করছ, তখন এমন নানান ভাষায় বিশ্রী খিচুড়ী বানিয়েছ কেন ?

নবাব্দি অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—আমাদের এই-রকম রেওয়াজ বাবা ! ফার্সী লব্‌জ্‌ না থাক্‌লে ভারি নিন্দে হয়।

নবকিশোর হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল—অদ্ভুত রীতি ত ! বুঝতে পারি আর না পারি ফার্সী চাই ! এ রকম রোগ শুধু তোমাদের নয়, আমাদেরও আছে—আমরাও সংস্কৃত শ্লোক রচনা কোরে নেমন্তন্ন করি। ...আচ্ছা আমরা সন্ধ্যে বেলা যাব।

নবাব্দি উঠিতে উঠিতে বলিল—বাবা, শুন্‌লাম, তুমি সব কি পাঠশালা করছ। যদি আস্‌মতকে একটা কাজ দাও.........

নবকিশোর বলিল—তা বেশ ত। তোমাদের শীতলপুরে, নবিনগরে পাঠশালা হবে ; সেখানে বাড়ীতে থেকেই আস্‌মত কাজ করতে পার্‌বে। আস্‌মত তুমি কতদূর পড়েছিলে......ফাষ্ট আর্ট্‌স্ পর্যান্ত পড়েছিলে না ?

—আজ্ঞে ! এগ্‌জামিনের আগে অসুখ হল বোলে এগ্‌জামিন দেওয়া হয়নি।

—তুমি যদি কাজ নিতে রাজি থাক, তা হলে মাস তিনেক আমার কাছে এসে কি কোরে পাঠশালা চালাতে হবে সেটা শিখে নিতে হবে।

নবাব্দি বলিল—সাদি হয়ে গেলেই ওকে পাঠিয়ে দেবো বাবা। তুমি কোথাও ওর থাক্‌বার একটা বন্দোবস্ত করে দিয়ো। ও নিজেই রেঁধে খেতে পারে।

নবকিশোর বলিল—কেন, আমাদের এই বাড়ীতেই থাক্‌বে। আমাদের রান্না কি তোমরা খাও না ?

—ভাত খাওয়াটা রেওয়াজ নেই·········

নবকিশোর হো হো করিয়া হাসিয়া নিজের ছাত্রদের দিকে ফিরিয়া বলিল—শুন্‌ছ হে অভিরাম, তোমরা যেমন ম্লেচ্ছ বোলে ঘৃণা কোরে ওঁদের ছোঁয়া খাও না, ওঁরাও তেম্‌নি ঘৃণা কোরে কাফেরের ছোঁয়া খান না। তোমরাই যে নাক সিঁট্‌কে উঁচুতে বোসে সকলকে দূর কোরে রেখেছ তা মনে কোরো না; তোমাদেরও ঘৃণা কোরে দূরে ঠেলে রেখেছে দেশের বিদেশের সকলেই।·········আচ্ছা, আস্‌মত একবেলা ভাত রেঁধে খাবে; একবেলা আমরা রুটি লুচি কোরে খাওয়াব। তা হলে হবে ত? কিন্তু এখানে মাংসটাংস খাওয়ার সুবিধে হবে না।

আস্‌মত বলিল—আমি কখনো মাংস খাইনে।

নবকিশোর বলিল—তবে ত কোনো ল্যাঠাই নেই। আমি সব ঠিক কোরে নেবো।

নবান্দি বলিল—বহুত মেহেরবানি বাবা, তোমার বহুত মেহেরবানি। এখন তবে আসি বাবা।

—না, একটু বসো কাকা, একটু জল খেয়ে যাও।—বলিয়া নবকিশোর বাড়ীর মধ্যে গিয়া মাকে বলিল—মা, নবান্দি মণ্ডল আর তার ছেলে আস্‌মত এসেছে. কিছু জলখাবার দাও ত।

নবকিশোরের মা দুখানি পাতার টুক্‌রায় জলখাবার সাজাইতে লাগিলেন।

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—মা, গোব্‌রা মুখুয্যে এলে কিসে কোরে জলখাবার দিতে?

গোবর্দ্ধন মুখুয্যে নিবারণের পুত্র; প্রসিদ্ধ দুশ্চরিত্র ও দুষ্কর্ম্মী।

নবকিশোরের মা পুত্রের কথার ইঙ্গিত বুঝিয়া হাসিয়া বলিলেন—হাজার হোক তবু সে বামুনের ছেলে, আর এরা মোছলমান!

—মা, নিবারণ যদি বামুন হয় ত এরাই বা বামুন নয় কেন ?

—এরা সব যা-তা খায়·····

—লোকে ত বলে শুনেছ, নিবারণ গোরাদের এঁটো খানা খেত। আর এরা মাংস খায় না। কে ভালো বামুন বলো ত মা! একজন ভদ্রলোক তোমার বাড়ীতে এসেছেন, অতিথি, তুমি জাত বিচার কোরে তাঁকে যদি পাতা পেড়ে খেতে দাও ত তাঁকে অপমান করা হয় না ?

নবকিশোরের পিতা সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—না বাবা, আমাদের দেশে রাজাকে পর্য্যন্ত পাতা পেতে খাবার ছায়; কম্বলের আসন পেতে রাজা ফকির দুজনকেই বস্‌তে ছায়।

নবকিশোর বলিল—তা ঠিক, কিন্তু সে দশের সঙ্গে হলে। একলা এঁদের যদি এ-রকম কোরে দি, এঁরা কি মনে কর্‌বেন না আমরা এঁদের একটু হীন মনে কর্‌ছি ?

নবকিশোরের মা হাসিয়া বলিলেন—নে থাম্, তোর তর্ক রাখ্। তোরা এখন আমাদের সেকেলে মতে ত চল্‌বিনে। রেকাবি কোরেই খাবার দিচ্ছি। ওগুলো আলাদা থাক্‌বে, তোর অতিথি-সেবার জন্যে !

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—আচ্ছা এখন তাই হোক। পরে ক্রমে ক্রমে এ বাসনগুলো সব বাসনের সঙ্গে মিলে যাবে দেখ্‌তে পাবে।

নবকিশোর খাবার লইয়া অতিথির অভ্যর্থনা করিতে গেল।

নবকিশোর মুসলমানকে আসন পাতিয়া থালা গেলাসে করিয়া জলখাবার খাইতে দিল, দেখিয়া টোলের ছাত্রদের ত চক্ষু স্থির।

নবাব্দি ও আস্‌মতকে জল খাওয়াইতে খাওয়াইতে নবকিশোর বলিল—আস্‌মত, তোমরা ত বাঙালী।

—আজ্ঞে বাঙালী বৈ কি।

—তবে অমন ইজের চাপ্‌কান পোরে মাথায় টুপি দিয়ে অবাঙালী হয়ে থাক কেন? ও পোষাকে সমস্ত মুসলমান-সমাজের সঙ্গে যোগ হতে পারে, কিন্তু নিজের দেশবাসীর সঙ্গে ভেদ ঘটে। ধর্ম্মসম্প্রদায়ের চিহ্ন দিয়ে নেশনকে কেন দ্বিখণ্ডিত করো?

—আপনাদের হিন্দুরাও ত কম পার্থক্যের চিহ্ন ধারণ করেন না—শাক্তরা যে নামাবলী ব্যবহার করেন, বৈষ্ণবেরা তা করেন না; শাক্তের ফোঁটা, বৈষ্ণবের তিলক; শাক্তের রুদ্রাক্ষের মালা, বৈষ্ণবের তুলসীর মালা। এ গুলো যদি নেশন গড়্‌বার পক্ষে বাধা না হয়, আমাদের পোষাকটাই কি যত বৈষম্যের কারণ হবে?

—শুধু তোমাদের পোষাকে ত বৈষম্য নয়, তোমাদের চালচলন, আচার-ব্যবহার, কথাবার্ত্তা, সমস্ততে তোমরা দেশ থেকে স্বতন্ত্র। এ রকম হবে কেন? এমন কি তোমাদের নাম পর্য্যন্ত বাংলা নয়।

—তা বটে। কিন্তু আপনারা যেমন ঠাকুর-দেবতার নামে নাম রাখ্‌তে ভালোবাসেন, আমরাও তেম্‌নি ভালোবাসি। আপনারা রাখেন হরিচরণ, কালীমোহন, রামলোচন, আর আমরা রাখি গোলাম-মহম্মদ, আব্‌দুল-রসুল, আবদর্-রহমান্‌। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র আর্‌বীতে লেখা, আর্‌বী কথা ব্যবহার না কোরে আমাদের উপায় কি?

নবকিশোর সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—বেশ বেশ। তুমি আমার মনের মতন শিক্ষক হতে পার্‌বে। তোমার সঙ্গে আমার খুব বোনে যাবে।

আস্‌মত সেলাম করিয়া বলিল—আপনার অনুগ্রহ।

উহারা চলিয়া গেলে নবকিশোর ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিল—মুরলী, এই থালা-গেলাসগুলো নিয়ে যা।

মুরলী বলিল—এজ্ঞে আমি মোছলমানের এঁটো ছোঁব না। আমার জাত যাবে।

নবকিশোর হাসিয়া নিজে সেই থালা গেলাস মাজিতে লইয়া গেল।

নবকিশোরের ছাত্রেরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে করিতে আস্তে আস্তে উঠিয়া উঠিয়া একে একে সকলেই প্রস্থান করিল।

১৮

অভিরাম প্রভৃতি টোলের ছাত্রেরা মর্ম্মাহত হইয়া গিয়া নিবারণ মুখুয্যের শরণাপন্ন হইল। নিবারণ তাদের মুখে নবকিশোরের অনাচারের সংবাদ শুনিয়া কড়া তামাকে জোরে দম দিয়া কাশিতে কাশিতে মাথা নাড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে কাশি সাম্‌লাইয়া করঞ্জার মতন চোখ দুটিতে ক্রূর হাসি জ্বালিয়া, একসঙ্গেই গলা হইতে সরু ও মোটা দুরকম স্বর বাহির করিয়া বলিতে লাগিল—ও আমি জান্‌তামই, কিশ্‌রে ছোঁড়া এম্‌নি বাড়াবাড়ি একদিন করবেই। তোমরা কি হরিবিহারীকে এ খবর জানিয়েছ ?

—আজ্ঞে না। প্রথমে আপনার পরামর্শ না নিয়ে ত আমরা কিছু কর্‌তে পারিনে, তাই ছুটে আগে আপনার কাছেই এসেছি।

নিবারণ পরম সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—ঠিক করেছ ভায়ারা, ঠিক করেছ। চুল পাকালাম তবু একটি দিনের তরে শাস্তর লঙ্ঘন করিনি। আমি যেমন নিজে শাস্তর মানি, তেম্‌নি লোককেও মানাতে চাই বোলে লোকে রাগ কোরে আমার নামে কি না রটায়। তা থাক্‌গে মরুক্‌গে। এখন একবার হরিবিহারীর কাছে চলো—আমি যা করব তাই হবে, তবু সে গ্রামের জমিদার, তাকে জানিয়ে কাজ করা ভালো।

অভিরাম জিজ্ঞাসা করিল—কি ব্যবস্থা কর্‌বেন দাদামশায় ?

—কিশ্‌রে ছোঁড়ার মাথা মুড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত করাব, নয় ওদের জাতে ঠেল্‌ব। এর কি আর তৃতীয় পন্থা আছে হে ভাই! শাস্তর যে সব পথ মেরে রেখে দিয়েছে!

নিবারণ একখানা ময়লা পুরাতন র‍্যাপার গায়ে জড়াইয়া খড়ম ছাড়িয়া একজোড়া চটি-জুতা পায়ে দিল; চটি জোড়া শুকাইয়া ফাটিয়া গিয়াছে, তার সাম্‌নের অর্দ্ধেকটা বাঁকিয়া ডিগ্‌বাজি খাইবার উপক্রমে ছিল বলিয়া নিবারণের পায়ের আধখানা চটির বাহিরেই ঝুলিয়া রহিল। অগ্রে অগ্রে নিবারণ ও তার পশ্চাতে ছাত্রেরা হরিবিহারীর বৈঠকখানায় গিয়া উপস্থিত হইল।

হরিবিহারী তাকিয়ায় ঠেস দিয়া অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে আল্‌বোলার নল মুখে দিয়া ফুড়ুক ফুড়ুক করিয়া তামাক খাইতেছিলেন; বৃদ্ধ দেওয়ান পাশে বসিয়া জমিদারীর খাতাপত্র দলিলদস্তাবেজ লইয়া হরিবিহারীকে শুনাইতেছিলেন, দস্তখত করাইতেছিলেন। নিবারণের চটির শব্দ পাইয়া চোখ একটু বিস্ফারিত করিয়া হরিবিহারী বলিলেন—এই যে খুড়ো, এস। এত চেলা চামুণ্ড নিয়ে কি মনে কোরে?

নিবারণ পরম হতাশভাবে ফরাসে বসিয়া পড়িয়া কাতর স্বরে বলিল—আর বাপু, তোমরা ত দেখবে শুন্‌বে না, কিন্তু তোমরা না রক্ষা কর্‌লে জাতধর্ম্ম ত আর থাকে না।

হরিবিহারী উৎসুক হইয়া বলিলেন—কেন, ব্যাপার কি?

—এই-সব ভদ্রলোকের ছেলেরা গাঁ-অন্তর থেকে এসেছে, মনে করেছে কিশরে ছোঁড়া বুঝি দিগ্‌গজ পণ্ডিত। এখন এরা তার কাণ্ডকারখানা দেখে কেঁদে এসে পড়েছে, তোমাকে ছাড়া আর কাকে বল্‌তে যাবে বলো?

—কিশোর? সে করেছে কি?

বল্‌লে না পেত্যয় যাবে বাবাজী, সে টোলঘরে মোছলমানকে বাসনে কোরে খাইয়ে এদের দেখিয়ে দেখিয়ে তাদের এঁটো খেয়েছে···

অভিরাম বাধা দিয়া বলিতে গেল—না এঁটো···

নিবারণ চোখ পাকাইয়া বলিল—আরে তুমি থামো না হে ছে. ⁻দের তুমি কি সব গুছিয়ে বল্‌তে পার্‌বে, আমাকেই বল্‌তে দাও···

হরিবিহারী আল্‌বোলার নল ফেলিয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন—কি বল্‌ছিলে তুমি?

অভিরাম বলিল—এঁটো খেতে আমরা দেখিনি, তবে তিনি মোছলমানদের টোলের বিছানায় বসিয়ে তাদের বাসনে কোরে খেতে দিলেন, এঁটো বাসন তুলে নিয়ে নিজে মাজ্‌তে গেলেন, দেখে আমরা চলে এসেছি······

নিবারণ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—আরে নাও, তাই না হয় হল, ওকেই বলে এঁটো খাওয়া—ঐ থালা গেলাস ত আর ফেলে দেবে না, নিজেরা আবার ঐ বাসনে খাবে ত? চাই কি ঠাকুর দেবতা, গো ব্রাহ্মণ সবাইকে খাওয়াবে। আর মোছলমানের এঁটো ছুঁলে ত? রামঃ! রামঃ!

হরিবিহারী বলিলেন—কিশোরের এ-সব ত ভারি অন্যায়! তা আচ্ছা, আমি কিশোরকে ডেকে ধম্‌কে দেবো 'খন, থালা গেলাসগুলো ফেলে দিলেই হবে।

নিবারণ ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না বাপু, এ কি একটা কথা হল? এমন অনাচার যে করেছে তাকে উচিতমত শাস্তি দিতে হবে।

—কি কর্‌তে বলো তুমি?

—ওদের একঘরে কর্‌তে হবে। তা যদি না করো তবে এ গাঁ থেকে আমাদের বাস তুলতে হবে, ম্লেচ্ছসংস্পর্শে শেষে কি নরকে পোচে মর্‌ব? চোদ্দ পুরুষের বাস্তুভিটে ছেড়ে যাব, তবু ধর্ম্ম ছাড়্‌তে পার্‌ব না।

নিবারণকে চরম নিষ্পত্তি করিতে শুনিয়া ঝঞ্ঝাটভীরু হরিবিহারী

নির্ভাবে তাকিয়ায় ঢলিয়া পড়িয়া বলিলেন—তবে যা ভালো বোঝো করো।

হরিবিহারীকে সহজে হাল ছাড়িয়া দিতে দেখিয়া নিবারণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু দেওয়ান বলিলেন—একবার স্মৃতিরত্নমশায়কে ডেকে এ কথা বলা উচিত। যদি কিশোর প্রায়শ্চিত্ত করে তা হলে ত আর কোনো গোল থাক্‌বে না।

নিবারণ ভীত হইয়া সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল—হাঁঃ! রেখে দিন্ আপনার প্রায়শ্চিত্ত। যে জেনে বুঝে ইচ্ছে কোরে পাপ করে, তার আবার প্রায়শ্চিত্ত কি?

অভিরাম বলিল—আর তিনি প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে স্বীকার কর্‌বেন না। তিনি বলেন, প্রায়শ্চিত্ত মনের মধ্যে হয়, বাহিরের অনুষ্ঠানে নয়। এ-সব অনাচার তিনি অন্যায় বোলেই স্বীকার করেন না! এ সম্বন্ধে আমরা তাঁর সঙ্গে তর্ক কোরে এলে দিয়েছি·····

দেওয়ান বলিলেন—কিশোর প্রায়শ্চিত্ত না করে যদি, স্মৃতিরত্নমশায় পুত্রকে ত্যাগ কর্‌বেন। দোষ করেছে কিশোর, স্মৃতিরত্নমশায়কে তবে একঘরে করা যাবে কি অপরাধে?

হরিবিহারী আশ্বস্ত হইয়া আবার উঠিয়া বসিয়া বলিলেন—ঠিক বলেছেন দেওয়ানজী। তোমরা একজন কেউ গিয়ে স্মৃতিরত্নমশায়কে ডেকে আনোগে।

নিবারণের মন একেবারে দমিয়া গেল! স্মৃতিরত্ন ও নবকিশোরের উপর তার বিলক্ষণ ক্রোধ ছিল। এঁরা নিবারণ-পুত্র গোবর্দ্ধনকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করেন না, ব্রাহ্মণ-ভোজনে তাকে নিমন্ত্রণ করেন না এবং নিজেরাও গোবর্দ্ধন যে-বাড়ীতে আছে সে-বাড়ীতে পদার্পণ পর্য্যন্ত করেন না। প্রকারান্তরে তাঁরা নিবারণদের জাতে ঠেলিয়া একঘরে

করিবার চেষ্টায় আছেন, ইহাই নিবারণের ধারণা। এখন তাদের শত্রুতার শোধ দিবার সুযোগ উপস্থিত, তাদের একঘরে করিতে পারিলে তবে নিবারণের মনের খেদ যায়। কোথা হইতে বুড়া দেওয়ানটা জুটিয়া তার এমন পাকা চালের ঘুঁটি কাঁচাইয়া দিবার উপক্রম করিয়াছে দেখিয়া নিবারণ অত্যন্ত বিরক্ত ও উৎকন্ঠিত হইয়া হরিবিহারীকে বলিল—তা বাপু, ভট্চায্যিকে ডাক্তে হয় ডাকো, কিন্তু ওদের সহজে ছেড়ে দিলে চল্‌বে না। অন্য লোক এমন অনাছিষ্টি অনাচার কর্‌লে আমি কিছুতেই একঘরে না কোরে ছাড়তাম না; কিন্তু তোমার পুরুত বোলে যা রেয়াত করছি। তোমার পুরুত বোলেই না ওদের এত বাড় বেড়েছে, এমন অহঙ্কার হয়েছে যে আমাদের মানুষ বোলেই মনে করে না। মোছলমানের এঁটো খেতে পারেন অথচ বামুনের বাড়ী খেলে ওঁদের জাত যায়। ওরে আমার নিষ্ঠে রে! ওরা বাপ-বেটায় ঘাট মানিয়ে আমার বাড়ীতে খাবে তবে আমি ছাড়্‌ব, এ আমি তোমায় বোলে রাখ্‌ছি বাপু।

হরিবিহারীর মন বিষাক্ত করিবার জন্য নিবারণ অনর্গল গরল উদ্গিরণ করিয়া যাইতেছিল। ভট্টাচার্য্য-মহাশয় ঘরে প্রবেশ করিয়া তার কথা বন্ধ করিয়া বলিলেন—হরি, আমায় ডেকেছ কেন ভাই?

—আজ্ঞে বসুন, বল্‌ছি।

ভট্টাচার্য্য বসিলে হরিবিহারী অপ্রতিভ ভাবে মাথা নত করিয়া বলিলেন—এঁরা বল্‌ছেন কিশোর নাকি মোছলমানকে টোলে তুলে—

—হাঁ, এরা যা বল্‌ছেন তা সত্যি।

—এখন কর্ত্তব্য?

—এর আবার কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য কি?

—মোছলমানের সঙ্গে খেলে······

—মোছলমানের সঙ্গে খায়নি। আর যদি খেয়েই থাকে তাতেই বা কি ?

—ম্লেচ্ছসংস্পর্শে ধর্ম্মহানি হল না ?

—ম্লেচ্ছ তারা যারা অপরিষ্কার নোংরা, কুৎসিত-চরিত্র, কুৎসিত কর্ম্মে লিপ্ত—তা তারা যে ধর্ম্মই স্বীকার করুক আর যে আচারই পালন করুক বা যে কুলেই জন্মাক্। কোনো বাস্তবিক ভদ্রলোক ম্লেচ্ছ হতে পারে না……

নিবারণ বেগে মাথা নাড়িয়া বলিল—তা বোলে যবন গোরুখোরের ছোঁয়া খেতে হবে ?

ভট্টাচার্য্য হাসিয়া বলিলেন—মুসলমানের ছোঁয়া খান্‌নি কে? হরিবিহারী সোডা লেমনেড্ বরফ খান্। মুখুয্যে-মশায়ও অস্বীকার কর্‌তে পার্‌বেন না বোধ হয়।

নিবারণ বলিল—সোডা লেমনেড বোতলের মধ্যে থাকে, সেটা পরোক্ষ ছোঁয়া, বরফ ত জলবিকার। প্রত্যক্ষ ছোঁয়াতেই দোষ—গোরু-খোরের সদ্য ছোঁয়া!

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা গোরু খেতেন তার প্রমাণ আছে; আজকাল আধ-জানা আধ-লুকানো রকমে হোটেলে খান এমন লোকের সঙ্গে আপনাদের আহার ব্যবহার চলে। আপনারা নিজেরা পাঁঠা ভেড়া হরিণ খান। শিং-ওলা এক রকম চতুষ্পদ যদি খেতে পারি ত অপর রকম খেতে পার্‌ব না কেন তার কারণ ত যুক্তিতে খুঁজে পাইনে। এ-সমস্ত শুধু সংস্কার আর রুচির কথা; আমার খেতে প্রবৃত্তি হয় না, অপরের হয়, তার জন্যে অপরকে ঘৃণা কর্‌ব ?

নিবারণ বলিয়া উঠিল—শাস্ত্রের শাসন!

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—শাস্ত্রের সমস্ত বিধি কি আপনারা মেনে চলেন? শাস্ত্রে ত বিধি আছে শজারু, বনবরা, গোসাপ খাবে। খেতে পারেন? আপনারা স্বচ্ছন্দে মাছ খান, মনে কোনো দ্বিধা বোধ করেন না; এজন্যে হিন্দুস্থানীরা বাঙালীদের মাছ-খাউয়া বোলে ঘৃণা করে। আপনারা যেমন একজনের একটা অভ্যাস দেখে ঘৃণা করেন, অপরে আপনাদের একটা অভ্যাস দেখে ঘৃণা করে। এ-সমস্ত পরস্পরের সংস্কারের কথা। সংস্কার প্রায়ই যুক্তিবহির্ভূত অভ্যাস মাত্র।

নিবারণ মাথা নাড়িয়া বলিল—সে যাই বলুন, আমাদের সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন কোরে কিশোর ভয়ানক অন্যায় করেছে।

—তা করেছে স্বীকার করি। সেজন্যে আপনারা কি ব্যবস্থা করতে চান?

—কিশোরকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

—কিন্তু কিশোরকে প্রায়শ্চিত্ত করাবার আগে যাঁরা ব্যবস্থা দেবেন তাঁরা প্রায়শ্চিত্ত কোরে শুচি হলে তবে কিশোর প্রায়শ্চিত্ত করবে।

নিবারণ এ কথা কাণে না তুলিয়া বলিল—যদি কিশোর প্রায়শ্চিত্ত না করে তবে আপনাকে ত্যাগ করতে হবে তাকে।

—আমার কাছে ত সে কোনো অপরাধ করেনি। তবে আমি তাকে ত্যাগ করব কেন?

—তবে বাধ্য হয়ে আমরা আপনাদের ত্যাগ করব।

—ইচ্ছে হয় করতে পারেন।—বলিয়া ভট্টাচার্য্য উঠিলেন। দ্বারের কাছে গিয়া বলিলেন—হরি, তা হলে আজকের লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের আরতির জন্যে অন্য কিছু ব্যবস্থা কোরো।

হরিবিহারী বিষণ্ণ মুখে বলিলেন—ভট্‌চায্যি-দা, এ কথাটা কি ভালো হ'ল। একটু ভেবে দেখুন।

—কি করব ভাই। আধাআধি রফা করা ত আমাদের কুষ্ঠিতে লেখেনি।

অভিরাম প্রভৃতি ছাত্রগণ বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্যের কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল। তারা নবকিশোরের দোষের মাত্রা জোরালো প্রতিপন্ন করিবার জন্য বলিল—অধ্যাপক-মশায় নিজে জাত মানেন না, আমরা মানি বোলে তিরস্কার করেন, মূর্খ চিন্তাশক্তিহীন বোলে গালা-গালি দেন।

ভট্টাচার্য্য ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—যার যা বিশ্বাস সে চায় তার ছাত্রদেরও সেইরূপ বিশ্বাস হোক্। তোমাদের আপত্তি থাকে ওর মত গ্রহণ কোরো না, পারো ওর মত খণ্ডন কোরো, ইচ্ছে হয় টোল ছেড়ে চোলে যেতে পারো·········শাস্ত্র অধ্যয়ন কোরেও যারা শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, বেদাঙ্গ তাদের কি বলেছেন জানো ?—স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূদ্ অধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোঽর্থম্—যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে অথচ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে না সে কাঠের কুঁদো বা ভারবাহী গর্দ্দভের সমান···এত শাস্ত্র পোড়েও তোমরা যে এমন মূর্খ আছ তা আমি জান্‌তাম না।······

নিবারণ পরম বিজ্ঞের মতন ঘাড় নাড়িয়া বলিল—তা যাই বলুন, আপনার কথা আমাদের মনে নিচ্ছে না। আপনারা শাস্ত্র পড়েছেন, দুটো বচন আওড়ে যা তা একটা বুঝিয়ে দিলেই যে আমরা বুঝব তা আপনি মনে করবেন না।

ভট্টাচার্য্য-মহাশয় হাসিয়া বলিলেন—না, এতখানি বুদ্ধিমান বোলে আমি আপনাদের কখনো মনে করি না। আপনি হলেন সাক্ষাৎ নিবারণ—যা সত্য, যা মঙ্গল, তা আপনি নিবারণ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই থাকেন জানি। কেবল নিজের গোবরাটির বেলায় আপনি আর নিবার-

থাকেন না, তখন হন নিপাতন—নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাতে তখন আর বাধে না।

এই কথা শুনিয়া টোলের ছাত্রেরা আর হাসি রাখিতে পারিল না।

তাদের হাসিতে দেখিয়া নিবারণ ক্রুদ্ধ হইয়া উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল—তা হলে আপনাদের একঘরে করলাম।

ভট্টাচার্য্য হাসিয়া বলিলেন—যারা নিজেরাই একঘরে হয়ে আছে তাদের আবার নূতন কোরে একঘরে করে কার সাধ্য! আপনি আমাদের একঘরে কোরে খুব একটা অপমান কি অপদস্থ করলেন মনে কোরে অহঙ্কার বোধ করবেন না। আজকাল দেখছি একঘরে তাঁরাই যাঁরা ধর্ম্ম বা সমাজের ভালোর জন্যে নূতন কিছু সংস্কার করতে চান; যাঁর জগতের গড্ডলিকা-প্রবাহের মধ্যে অগ্রগামী নেতা; যাঁরা জাতীয় জড়তার মধ্যে জীবনের স্পন্দন। অনেক সময় একঘরে হওয়ার মানে মূর্খতা বা অধর্ম্ম নয়; তার অর্থ সাহস, উৎসাহ স্বার্থত্যাগ! ইচ্ছা হলে আপনারা স্বচ্ছন্দে আমাদের একঘরে করতে পারেন।

এই বলিয়া ভট্টাচার্য্য-মহাশয় দৃপ্তপদক্ষেপে সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। ঘরের সকলে নীরব হইয়া বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে হরিবিহারী চিন্তিত ভাবে বলিলেন—তাই ত! এখন লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের পূজো করাই কাকে দিয়ে?

নিবারণ উৎসাহিত হইয়া বলিল—ভাবনা কি বাপু! আমি রয়েছি! গোবর্দ্ধন আছে! যে হয় একজন এসে দুটো ফুল ফেলে দেবো।

নিবারণ ও ছাত্রগণ যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিল। হরিবিহারী ঠাকুরের যা-হোক-একটা কিনারা করিয়া দিয়া পরম নিশ্চিন্ত মনে তামাক টানিতে লাগিলেন।

১৭

বিকাল বেলা। বিপিন মহিলাদের পাঠসভায় মহাভারত পাঠ করিতেছে। এমন সময় রোহিণী হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল—ভট্‌চায্যি-মশায়রা একঘরে হয়েছেন।

এই অবিশ্বাস্য অদ্ভুত সংবাদে সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। বিপিন অবিশ্বাস করিয়া রোহিণীর দিকে রুষ্ট দৃষ্টিতে চাহিল। রোহিণী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ, সত্যি দাদাবাবু, মুখুয্যে-মশায় কাছারীতে রাজাবাবুর কাছে এসে সব ঠিক কোরে গেছে।

বিপিন জিজ্ঞাসা করিল—ভট্‌চায্যি জ্যাঠার কি অপরাধ, কিছু শুনেছিস্?

রোহিণী বলিল—দাদাঠাকুর নাকি মোছলমানের ভাত খেয়েছে।

বিপিন বই মুড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—যাই, দেখে আসি ব্যাপার কি।

বিপিন ঘরের মধ্য দিয়া যাইবার সময় দেখিল দরজার আড়ালে আজ মালতী বসিয়া নাই। চারিদিকে চাহিয়া মালতীকে অনুসন্ধান করিতে করিতে বিপিন বাহির-বাড়ীতে যাইতেছিল; হঠাৎ দেখিল মালতী তারই পথে যেন তারই অপেক্ষায় তাকে কিছু বলিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। বিপিন স্পন্দিত হৃদয়ে মালতীর কাছে আসিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। যে মালতীকে দেখিবার জন্য সে ছলের পর ছল সৃষ্টি করিয়া ফিরিতে ফিরিতে কুণ্ঠিত ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল সেই দুর্লভদর্শন মালতী আজ একাকিনী নির্জ্জনে একেবারে তার সাম্‌নে। বিপিন কোমল দৃষ্টিতে মালতীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মালতী চলিয়া না গিয়া মুখ তুলিয়া বিপিনের

মুখের দিকে চাহিয়া বেশ সহজ ভাবেই বলিল—ভট্‌চায্যি-মশায়দের খবর জেনে এসে আমায় একটু বল্‌বেন।

মালতীর সহিত বিপিনের এই প্রথম বাক্যালাপ। বিপিনের কাণে সৌন্দর্য্যের সুর বাজিতে লাগিল। সে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে শুধু বলিতে পারিল—আচ্ছা।

মালতী তখন ধীরে ধীরে ফিরিয়া চলিয়া গেল। স্তব্ধ বিপিন একটু সম্বিৎ পাইতেই তার মনের মধ্যে ছাঁত করিয়া উঠিল। তার মনে হইল, নবকিশোরের জন্যই মালতীর এই ব্যাকুলতা! মালতী তাড়াতাড়ি পাঠসভা হইতে চলিয়া আসিয়া তার পথ আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, এবং নিজে যাচিয়া তার সহিত প্রথম কথা বলিল—সে কেবল নবকিশোরেরই সংবাদ পাইবার জন্য! বিপিনের মনের কাণে ঈর্ষা গুঞ্জন করিয়া বলিল—ভাগ্যবান নবকিশোর!

বিপিন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া গেল।

বিপিন বিষণ্নমুখে নবকিশোরের বাড়ীতে গিয়া দেখিল টোলের ঘরে একখানি শতরঞ্চ বিছাইয়া নবকিশোর বসিয়া পড়িতেছে। বিপিন বুঝিল বিক্ষুব্ধ চিত্তকে শান্ত করিবার এই আয়োজন।

বিপিনকে দেখিয়া বই বন্ধ করয়া হাসিয়া নবকিশোর বলিল—শুনেছ?

—শুনেছি। কিন্তু ব্যাপার কি?

—বসো বল্‌ছি।

বিপিনকে পাশে বসাইয়া নবকিশোর আদ্যোপান্ত সমস্ত বলিল। শুনিয়া বিপিন হাসিয়া বলিল—এই! আমি মনে কর্‌লাম না জানি কি মহামারী ব্যাপার। কিন্তু যাই হোক, আমাদের এই প্রথম মোহড়ায় একটা এরকম বাধা ওঠা সুবিধের হল না। তুমি অতটা না কর্‌লেই

পার্‌তে; কিন্তু স্থান কাল বিবেচনা কোরে কাজ করা তোমার কুষ্ঠিতে লেখে না জানি। তবু অল্পে অল্পে রইয়ে সইয়ে আমাদের মত প্রচার কর্‌লে ভালো হত।

নবকিশোর জোর দিয়া বলিয়া উঠিল—কক্‌খনো না। ভগবানের স্বরূপের মধ্যে প্রথমেই ঋষিরা নির্দ্দেশ করেছেন যে তিনি সত্যং। এই সত্যকে জীবনে স্বীকার কর্‌তে না পার্‌লে কিছুই হল না। যা সত্য তা চিরকাল খাঁটি, খোলাখুলি সাদাসিধে; তার সঙ্গে আধাআধি রফা করা চলে না। যে রফা কোরে সকল দিকে বাঁচিয়ে চল্‌তে চায় সে কথনো সত্যকে ত পায়ই না, অধিকন্তু যে-অসত্যের খাতিরে সত্যের সঙ্গে রফা করে সেই অসত্য তাকেই আশ্রয় কোরে বেঁচে থাকে কেবল তাকেই লজ্জা আর ধিক্কার দেবার জন্যে।

নবকিশোরের বজ্রনিনাদ শুনিয়া বিপিন ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া বলিল—তা ঠিক। জ্যাঠা-মশায়ের মধ্যে যে এতখানি উদারতা প্রচ্ছন্ন ছিল তা আজ তোমার দ্বারা উদ্‌ঘাটিত হল।

নবকিশোর হা হা করিয়া হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ আমি যে একটুও উদার হতে পেরেছি, তার আদি কারণ আজ আবিষ্কার হল।

বিপিন বলিল—বাবা তোমাদের একঘরে করেছেন; কিন্তু আমি ত তোমাদের ত্যাগ কর্‌তে পারব না; আমি ত তোমারই দোসর! আমি তোমার সঙ্গে এসেই একঘরে হয়ে থাক্‌ব।

নবকিশোর বিপিনের কাঁধের উপর হাত দিয়া বলিল—দূর পাগল! এত নিষ্ক্রিয়ভাবে একঘরে হবার সাধ কেন? যে ব্রত গ্রহণ করেছ কোরে যাও। আপনিই একঘরে হবে, কিছু চেষ্টা কর্‌তে হবে না।—বলিয়া নবকিশোর উচ্চরবে হাসিতে লাগিল।

বিপিন বলিল—চল একবার জ্যাঠামশায় জেঠিমাকে প্রণাম কোরে যাই!

—যেয়ো, এত তাড়াতাড়ি কেন? একঘরের ঘরে বেশীক্ষণ থাকতে ভয় হচ্ছে?—বলিয়া নব কশোর আবার জোরে হাসিয়া উঠিল।

বিপিন লজ্জিত হইয়া বলিল—ন্যাংটার আবার বাটপাড়ের ভয় কি! কিন্তু মালতী তোমার খবর পাবার জন্যে বড় উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। সে সত্যি তোমায় খুব ভালোবাসে।

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—সে আমায় ভালোবাসে কি না জানিনা, তবে তুমি যে তাকে এরই মধ্যে ভালোবেসেছ তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে বটে।

—কক্‌খনো না! এখনো আলাপই হয় নি। সেই আজ আগে কথা কয়েছে শুধু তোমার খবর জান্‌বার জন্যে ব্যস্ত হয়ে।

—তা তুমি যে রকম লাজুক, এক বাড়ীতে থেকেও এ জন্মে ত আলাপ কর্‌তে পার্‌তে না। ভালোই হয়েছে এই সূত্রে আলাপটা হয়ে যাবে। বরফ একবার ভাঙ্‌লে গল্‌তে আরম্ভ করে। তবে বিনা আলাপেই এই, আলাপ হলে আর বাঁচ্‌বে না দেখ্‌ছি।—নবকিশোর আবার হাসিয়া উঠিল।

বিপিন লজ্জিত হইয়া বলিল—ছিঃ! পরনারীর সম্বন্ধে এরকম আলাপ তোমার ভারি অন্যায়।

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—হুঁ! এর মধ্যেই এত দরদ হয়েছে! তা নিজনারী কোরে নেবে বোলেই ত এই কথা বলা হচ্ছে।

—না না, কি যে বলো তুমি তার ঠিক নেই।

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—প্রণয়-রোগের স্পষ্ট লক্ষণ দেখা দিয়েছে। আশীর্ব্বাদ করি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক।

নবকিশোরের পুনঃ পুনঃ হাসিতে বিপিন লজ্জিত হইয়া বলিল—যাও, কি যে ঠাট্টা করো! চলো জ্যাঠামশায়কে প্রণাম কোরে আসি।

ভট্টাচার্য্য সন্ধ্যাহ্নিক করিবার জন্ত হাত মুখ ধুইতেছিলেন। বিপিন গিয়া প্রণাম করিল। ভট্টাচার্য্য হাসিয়া বলিলেন—আমরা একঘরে হয়েছি বাবা, শুনেছ?

—জ্যাঠামশায় আমাকেও শিগ্গীর আপনাদেরই পরিবারভুক্ত হতে হবে।

—না বাবা, কোনো রকম উদ্ধত ব্যবহার কোরে বাপ-মার মনে কষ্ট দিয়ো না।

—না, আমি কোনো উদ্ধত ব্যবহার করব না। তাঁরা আপনারাই আমায় ত্যাগ করবেন।

—তা কি হয় বাবা, আত্মজকে ত্যাগ করা কি সহজ?

—দেখ্বেন তখন।

বিপিনের গলার আওয়াজ শুনিয়া নবকিশোরের মা বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন—কে বাবা বিপিন এসেছ?

বিপিন প্রণাম করিয়া বলিল—হ্যাঁ জেঠিমা, দেখ্তে এলাম কিশোর গুণ্ডাটা কি হাঙ্গামা বাধিয়ে বসেছে।

নবকিশোর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাতে সকলেই হাসিতে লাগিলেন।

বিপিন হাসিতে হাসিতে বলিল—আচ্ছা জেঠিমা, কিশোর একি কাণ্ডটা করলে বলো দেখি? তোমার রাগ হচ্ছে না?

—রাগ হবে কেন বাবা? কিশোর ত কোনো অন্যায় কাজ করেনি। থালায় কোরে খাবার ত আমিই দিয়েছিলাম।

—তোমার মোছলমানকে ঘেন্না করল না?

—নিজেও ত এমন শুচি নই বাবা যে পরকে ঘেন্না করব। অশুচিতার জন্যে ত্যাগ করতে হলে অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ বাদ পড়েন না; তবে মোছলমানেরই কি যত দোষ হল বাবা?

বিপিন বলিল—জেঠিমা, তোমার মতন আমাদের দেশের সব মেয়েদের জ্ঞান থাক্‌লে আমাদের দেশের অনেক গণ্ডগোল সোজা হয়ে যেত।

নবকিশোরের মা একটু হাসিলেন।

বিপিন বলিল—তবে এখন আসি জেঠিমা।

নবকিশোরের মা বলিলেন—এস বাবা।

২০

বিপিন ফিরিয়া আসিয়াই খুড়িমার ঘরের দ্বারে গিয়া ডাকলি—খুড়িমা।

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। ঘরের মধ্যে একটি প্রদীপ মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছিল। বিপিনের ডাক শুনিয়া সম্মুখে দীর্ঘ ছায়া ফেলিয়া মালতী অগ্রসর হইয়া বলিল— মাসিমা নেই।

বিপিন থতমত খাইয়া বলিল—কোথায় তিনি?

—ঠাকুরঘরে জপ কর্‌ছেন।

বিপিন ইতস্তত করিতেছিল, এই শীতের বিজন সন্ধ্যার অন্ধকারে দাঁড়াইয়া মালতীর সঙ্গে অধিকক্ষণ কথা বলা যুক্তিসঙ্গত হইবে কি না। কিন্তু মালতীই তার দ্বিধা ঘুচাইয়া প্রশ্ন করিল—ভট্‌চায্যি-মশায়দের বাড়ী গিছলেন?

বিপিন লজ্জায় জড়োসড়ো হইয়া বলিল— গিছলাম।

মালতী কৌতূহলী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বিপিনের মুখের দিকে চাহিল। বিপিন তার প্রশ্ন বুঝিয়া বলিতে লাগিল—ব্যাপার বিশেষ কিছুই নয়, কিশোর নিজের ঘরে মুসলমানকে বসিয়ে থালায় কোরে খেতে দিয়েছিল এই জন্যে তারা একঘরে হয়েছে।

মালতী আশ্বস্ত হইয়া বলিল—আপনিও কি বন্ধুকে ত্যাগ কর্‌বেন?

বিপিন জোরের সহিত বলিল—অসম্ভব! আমার শিক্ষা দীক্ষা চরিত্রের মধ্যেই যতটুকু ভালো সে কিশোরের কাছেই আমার ধার-করা। আমি তাকে ত্যাগ ত কর্‌তেই পারি না; অধিকন্তু আমি যে-মতলবে এই পাঠসভা দিয়ে সংস্কারের গোড়াপত্তন কর্‌তে চেষ্টা করছি, তাইতে আমাকেও শিগ্‌গির কিশোরের দলে ভিড়তে হবে। আর এসব অনুষ্ঠানও কিশোরেরই উদ্ভাবন, আমি শুধু তার হুকুম তামিল করছি মাত্র।

বিপিনের এই অকপট বন্ধুঋণ স্বীকার দেখিয়া মালতী শ্রদ্ধায় প্রীতিতে চোখ দুটিকে ভরিয়া একজোড়া আরত্রি-প্রদীপের মতন বিপিনের মুখের উপর তুলিয়া ধরিল। মুগ্ধ বিপিন আত্মবিস্মৃত হইয়া সেইদিকে চাহিয়া রহিল।

বিপিন পরিপূর্ণ হৃদয়ে প্রস্থানের জন্য যখন ফিরিল তখন একটা ছায়া তার সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল। বিপিন তখন তাহা দেখিয়াও দেখিল না।

বিপিন চলিয়া গেলে মালতী গিয়া বিছানায় শুইয়া চিন্তা করিতে লাগিল—

—বেশ এই দুটি লোকের বন্ধুত্ব, কেমন অকপট, কেমন মহৎ! লোক দুটিও বেশ মজার। একজন যেন দেবদারু, সরল উন্নত সুন্দর; আর একজন যেন দ্রাক্ষা-লতা, আপনার ঐশ্বর্য্য আপনি জানে না, পরের উপর নির্ভর করিয়া জগতে সুধা বিতরণ করিতেছে!

এই দ্রাক্ষার উপমার কথাটা মনে হইতেই মালতীর মুখে ক্ষীণ হাসির আভা ফুটিল। দ্রাক্ষারসের মধুরতার অন্তরালে যে মাদকতা আছে তাই মালতীর মনে পড়িল। কিন্তু সে ইহা স্পষ্ট করিয়া চিন্তা করিতে চাহিল না, চাপা দিবার জন্য অন্য চিন্তা আনিয়া ফেলিল—আঃ বেঁচেছি, ইনি আসাতে তবু দুপুর বেলাটা একরকম ভালোই কেটে যাচ্ছে; কেউ আর যা-তা বোলে বিরক্ত কর্‌বার অবসর পায় না……

হঠাৎ তার চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটাইয়া খুড়িমা হনহন করিয়া ঘরে আসিয়া চাপা গলায় তর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—পোড়ারমুখী, করেছিস কি? দুদিন কি তুই নিজেকে সাম্‌লে রাখতে পারিস নে? একটু গণ্ডগোল কমেছিল, আর চুপ কোরে থাকা সইল না, আবার আগুন উস্কে তোলা হল? শতেকখোয়ারী তোর কি মরণ হয় না। হয় তুই মর্, নয় আমি মরি!

মালতী এই আকস্মিক আক্রমণে বিমূঢ় হইয়া শয্যায় উঠিয়া বসিয়া বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে বলিল—কেন, কি, হয়েছে কি?

খুড়িমার তার মুখের সাম্‌নে দুই হাত নাড়িয়া বলিলেন—হয়েছে আমার মাথা আর তোমার মুণ্ডু! মর্‌তে মাথা খেতে বিপিনের সঙ্গে কথা কইছিলি কেন লা শতেকখোয়ারী। তোর কিছুতে কি হায়া হবে না! তোর জন্যে আমার মাথামুড় খুঁড়ে রক্তগঙ্গায় ডুবে মর্‌তে ইচ্ছে হয়।

খুড়িমা চক্ষে অঞ্চল দিয়া রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে মালতী হাসিবে কি কাঁদিবে ঠিক করিতে না পারিয়া বিছানার উপর শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল।

বিপিন যে-ছায়াটি সরিয়া যাইতে দেখিয়াছিল সেটি শ্রীমতী রোহিণীর। রোহিণী অন্ধকারে বিপিন ও মালতীকে দাঁড়াইয়া কথা কহিতে দেখিয়াই মনে করিল সে একটা খুব বড়-রকমের কৌতুক আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। যে ঘরে নবীনা পুরস্ত্রীগণ জটলা করিয়া কেউ পান সাজিতেছিল, কেউ সুপারী কাটিতেছিল, কেউ জলের ঘটীর মুখে চুল বাঁধিয়া দড়ি বিনাইতেছিল, কেউ পা ছড়াইয়া বসিয়া সলিতা পাকাইতেছিল, কেউ বা নিষ্কর্ম্মা বসিয়া বসিয়া অনর্গল বকিতেছিল, রোহিণী ছুটিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া মেঝেয় এলায়িত ভাবে বসিয়া

পড়িয়া বেদম হাসিতে লাগিল। হাসিতে হাসিতে সে একবার করিয়া পেট চাপিয়া ধরিতে লাগিল, আবার হাসিয়া উল্টিপাল্টি খাইতে লাগিল।

পাঁচুর মা জিজ্ঞাসা করিল—কি রোহিণী, তোর হল কি, পাগল হলি, না ভূতে পেলে, যে, এত হাস্‌ছিস্?

রোহিণী হাসির ধমকে সর্ব্বশরীর মোচ্ড়াইয়া মোচ্ড়াইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগিল—বাপরে! আমি আর এ বাড়ীতে চাক্‌রি কর্‌বনি···আমি মাইনে বুঝিয়ে নিয়ে চোলে যাব! বাপরে! আর হাস্‌তে পারিনি······পেটে খিল ধোরে গেল······সত্যি বলেছ বৌদি, এ বাড়ীতে থাক্‌লে সত্ত পাগল হয়ে যাব·········আজ একেবারে আস্ত সন্ধ্যেভূত দেখিছি।

ক্ষমা বলিল—ব্যাপার কি মাগী খুলেই বল্ না।

—রোসো রোসো, পেটে খিল ধোরে গেছে, হাস্‌তে হাস্‌তে চোখের জল বেরিয়ে গেছে।

—আ মর মাগী, এক ঘন্টা ধোরে ন্যাক্‌রামিই কর্‌তে লাগ্‌ল, বল্ না কি হয়েছে?

রোহিণী অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া একটু সম্বৃত হইয়া বসিয়া ফিসফিস করিয়া বলিল—ওগো তোমাদের মালতী গো মালতী! বলিয়াই আবার সে হাসিতে লুটিতে লাগিল।

পাঁচুর মা পরম উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—মালতী কি? মালতী কি করেছে রে?

মালতীর নামে সকলের মন ঔৎসুক্যে ছটফট করিয়া উঠিয়াছিল। সকলে হাতের কাজ ফেলিয়া রোহিণীকে আসিয়া ঘিরিয়া বসিল।

রোহিণী বলিল—মালতী-ঠাক্‌রুণ ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে দাঁড়িইয়ে দাদাবাবুর

সঙ্গে ফিসফিস কোরে কথা কচ্ছিল।······কাউকে বলোনি যেন তোমরা, মাথা খাও বোলোনি·········

ক্ষমা বলিল—অ্যাঁ! এমন! আমরা মনে করি মালতী বুঝি বিপিনদার সঙ্গে কথা কয় না। ওমা! এ যে ডুবে ডুবে জল খাওয়া!

পাঁচুর মা হাসিয়া চোখ মট্‌কাইয়া বলিল—ওলো লোকের সাম্‌নে কয়না। কিন্তু আড়ালে আবডালে কইতে দোষ কি?

ঘরের মধ্যে হাসি বিদ্রূপ ও কুৎসার বান ডাকিয়া উঠিল।

রোহিণী এইরূপে এই কথাটি বাড়ীময় রটাইয়া বেড়াইল। এবং যার কাছে একথা বলিল তাকেই মাথার দিব্য দিয়া বারণ করিয়া দিল, একথা যেন কিছুতেই প্রচার না হয়।

বাড়ীময় যখন ফিসফিস শব্দে আলোচনা হইতেছে তখন খুড়িমা ঠাকুরঘর হইতে বাহির হইয়া দেখিলেন স্থানে স্থানে এক-একটি মণ্ডল একই কথা যেন আলোচনা করিতেছে; এবং তাঁকে দেখিয়া টেপাটিপি করিতেছে। খুড়িমাকে উৎসুক দেখিয়া রোহিণী গম্ভীরভাবে খুড়িমাকে অতিক্রম করিয়া কার্য্যান্তরে যেন চলিয়া যাইতেছিল। খুড়িমা বলিলেন —কি রে রোহিণী, কি হয়েছে?

রোহিণী উদাসীন ভাবে মুখ ঘুরাইয়া বলিল—কি জানি বাবু, আমি অতশত কাণ দিইনি কি সব বল্‌ছে···মালতী-দিদি নাকি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে চুপিচুপি দাদাবাবুর সঙ্গে কথা কইছিল,···না কি, ঠিক জানিনে মা আমি।

রোহিণী যেন কিছুই বলিতে পারিল না এবং বলিবার তার ইচ্ছা ও অবসর নাই এইভাবে তাড়াতাড়ি খুড়িমার কাছ হইতে চলিয়া গেল।

রোহিণী আগুনটি ধরাইয়া দিয়াই যখন প্রস্থান করিল তখন ফুঁ

দিবার লোকের অসদ্ভাব ঘটিল না। খুড়িমা লজ্জায় অপমানে ব্যথিত হইয়া মালতীর উপর মনের ঝাল ঝাড়িতে প্রস্থান করিলেন।

ক্রমে ক্রমে একথা গিন্নি ও বিপিনের কাণেও গেল। গিন্নি বলিলেন,—বিপিন আমার তেমন ছেলে নয়; ঐ নচ্ছার ছুঁড়িরই সমস্ত দোষ। ছুঁড়ির চোখ নয় ত যেন চর্‌কিবাজি!

বিপিন অনুসন্ধান করিয়া জানিল এ কাজ রোহিণীর। তার একবার ইচ্ছা হইল রোহিণীকে তখনই তাড়াইয়া দিবে; কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল যে-সৌধের ভিত্তিই কুসংস্কার ও অজ্ঞানের কত স্তরসম্বদ্ধ পাহাড়ের উপরে, সেখানকার একটুক্‌রা জমাট খসাইয়া কতটুকু লাভ হইবে।

বিপিন কৃতসঙ্কল্প হইল যেমন করিয়া হোক অজ্ঞানে আবদ্ধ কুসংস্কারের আবর্জ্জনা দূর করিতে হইবে এবং সকল সঙ্কোচ ঠেলিয়া প্রকাশ্যে মালতীর সঙ্গে আলাপ করিতে হইবে।

কর্ত্তব্য যখন স্থির হইয়া গেল তখন বিপিন এও স্থির করিল রফা করিয়া কাজ করিলে আর চলিবে না, তাতে শুধু সময় নষ্ট; যাহা উচিত বলিয়া মনে হইবে তাহা জোর করিয়াই করিতে হইবে। তার আদর্শ ও তার বন্ধু নবকিশোর ত এই জন্যই তার শ্রদ্ধাভাজন। সেই কি শুধু আদর্শকে শ্রদ্ধামাত্র দিয়া কাজের বেলা রফা করিয়া করিয়া চলিবে? না। যদি তার মতে ও কাজে এক না হয় তবে সে কখনো তার মতকে শ্রদ্ধা করে না, সে অমানুষ।

২১

কাল হইতে যে কুৎসার কালি বিপিনের চারিদিকে ছড়াছড়ি হইতে-ছিল তাহা গ্রাহ্য না করিয়াই বিপিন নিত্যকার মতো স্বাভাবিক ভাবেই নিজের পাঠসভায় আসিয়া দেখিল আজ কেউ পাঠসভার আয়োজন করিয়া

রাখে নাই। তখনো বিছানা পাড়া হয় নাই, তখনো কোনো শ্রোত্রী আসিয়া জুটে নাই। শুধু তরুণীরা পাঠস্থানের আশে পাশে টেপামুখে হাসি চাপিয়া ঘুরঘুর করিতেছিল; তারা কৌতূহলী হইয়া দেখিতেছিল এত কাণ্ডের পরও বিপিন নিয়মমত পড়িতে আসে কি না আর সেই বেহায়া মেয়েটা তার কালামুখ দেখাইতে বাহির হইবে কি না। বিপিনকে আসিতে দেখিয়া সকলের ভারি কৌতুক বোধ হইল, একবার সকলের চোখে চোখে হাসি খেলিয়া গেল।

বিপিন বেশ সপ্রতিভ ভাব ধারণ করিয়া ক্ষমাকে জিজ্ঞাসা করিল—হাঁরে ক্ষমা, তোরা কী কোরে বেড়াচ্ছিস্? পড়্বার জোগাড় করিস্‌নি যে এখনো? যা বিছানা-টিছানা পাড়তে বল্। আমি মাকে ডেকে আনি।

বিপিন মায়ের সন্ধানে প্রস্থান করিল। তরুণীরা পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া কলহাস্যে ঘরখানিকে ধ্বনিত করিয়া পাঠসভার আয়োজন করিতে লাগিল।

বিপিন মায়ের ঘরের কাছে গিয়া ডাকিল—মা!

গিন্নি বলিলেন—কেন রে?

—তুমি আজ আমাদের পাঠসভায় যাওনি যে বড়—বলিয়া বিপিন ঘরে ঢুকিল।

গিন্নি গম্ভীর হইয়া বলিলেন—না, আর রোজ রোজ পড়া শুন্‌তে ভালো লাগে না।

বিনি তাড়াতাড়ি আসিয়া বিপিনের হাঁটু দুটি দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া মুখ তুলিয়া বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—দাদা, আমি পল্‌ব। আমি ভালো মেয়ে, মা দুত্তু।

বিপিন নত হইয়া বিনিকে চুম খাইয়া বলিল—না, মাকেও দুষ্টু হতে দেওয়া হবে না; মাকে ধোরে নিয়ে পড়তে চলো।

বিনি গিয়া গিন্নির দুই হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিতে লাগিল—দুত্তু মেয়ে কোথাকাল্! পল্‌তে যেতে হবে না? পল্‌তে তল্।

এই স্নেহের কৌতুকে গিন্নির গাম্ভীর্য্য নষ্ট হইয়া গেল। তিনি পুত্র-কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন—যা তোরা, আমি পরে যাচ্ছি।

বিপিন হাসিতে হাসিতে বিনিকে কোলে করিয়াই পাঠসভায় আসিয়া দেখিল, সকলে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। কিন্তু মালতী ও খুড়িমা আসেন নাই। বিপিনের লজ্জায় বাধো-বাধো ঠেকিলেও জোর করিয়া বলিল—মালতী আসেনি? চ বিনি তোর মালতী-দিদিকে ডেকে আনি।

বিনি বিপিনের গলা জড়াইয়া বলিল—না বল্‌দা! মা বক্‌বে!

বিপিন বিনির নিষেধ সত্ত্বেও তাকে কোলে করিয়া যখন মালতীকে ডাকিতে চলিল তখন তাতে বিনির আনন্দ ছাড়া আপত্তি দেখা গেল না।

বিপিন খুড়িমার ঘরের কাছে গিয়া ডাকিল—খুড়িমা।

খুড়িমা বলিলেন—এস বাবা।

বিপিন ঘরের মধ্যে গেল। খুড়িমা বসিয়া মালাজপ করিতেছেন, মালতী চুপ করিয়া পাশে বসিয়া আছে। মালতী একবার চকিতে বিপিনের দিকে চাহিয়া মাথা নত করিল, তার গাল দুটি লাল হইয়া উঠিল।

সেই চকিত দৃষ্টিতে বিপিনের চোখে মালতীর লজ্জা ধরা পড়িল; বিপিনেরও মুখ লজ্জায় অপ্রতিভ হইয়া গেল। বিপিন ঢোক গিলিয়া বলিল—খুড়িমা, আজ যে বড় আমার পড়া শুন্‌তে যাওনি? ভালো লাগে না বুঝি?

—ভালো খুবই লাগে, বাবা। একে মহাভারত, তায় তোমার মুখে শোনা, ভালো লাগবে না? কিন্তু বাবা, আমি আর কিছুর মধ্যে থাক্‌ব না; তুমি দয়া কোরে আশ্রয় দিয়েছ; তোমায় প্রাতঃবাক্যে আশীর্ব্বাদ কোরে একবেলা দুটি হবিষ্যি কর্‌তে পেলেই যথেষ্ট মনে কর্‌ব।

খুড়িমার চোখ ছলছল করিতে লাগিল।

বিপিন হাসিয়া বলিল—খুড়িমা, তোমায় আশ্রয় দিয়েছি আমি? আগে তুমি, না, আগে আমি। আগে তুমি এক বাড়ীতে ছিলে, একলাটি; সেখান থেকে এসে তোমার ছেলের কাছে আছ। এই প্রভেদ। এ বাড়ীও ত তোমারই খুড়িমা। এখানেও এসে একলাটি থাক্‌বে? তা হবে না। চলো।

খুড়িমা সজল স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে বিপিনের দিকে চাহিয়া বলিলেন—আমি যাব না বাবা; আমি জপ কর্‌তে বসেছি।

—আচ্ছা, তুমি জপ সেরে যেয়ো। কিন্তু মালতীর ত মালাজপে তেমন অনুরাগ দেখছিনে। মালতী তুমি চল।

মালতী নিরুত্তরে নতমুখে বসিয়া রহিল। খুড়িমা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে বিপিনের মুখের দিকে চাহিলেন। বিপিন লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল, তথাপি জোর করিয়া সহজ ভাবেই বলিল—সেই জন্যেই ত আরো যাওয়া উচিত খুড়িমা। প্রকাশকে ভয় করে পাপ; নির্দ্দোষ যে সে অপবাদকে গ্রাহ্য করবে কেন।...চলো মালতী, তোমায় যেতে হবে।

মালতীর মুখখানি অরুণোদয়ে শতদল পদ্মের মতো সলজ্জস্মিতহাস্যে বিকশিত হইয়া উঠিল। সে চোখের উপর দীর্ঘপক্ষ্মরাজির অবগুণ্ঠন টানিয়া মৃদুকম্পিত কণ্ঠে বলিল—আপনি চলুন, আমি যাচ্ছি।

বিনি বিপিনের কোল হইতে নামিয়া মালতীর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল—মাতী-দিদি, বল্‌দা দাকে, তলো।

মালতী বিনিকে কোলে করিয়া বিপিনের পশ্চাতে ঘর হইতে বাহির হইল। খুড়িমা নিস্পন্দ নির্ব্বাক বসিয়া মালাজপ করিতে লাগিলেন।

বিপিন ফিরিয়া আসিয়া দেখিল সকলেই অপেক্ষা করিতেছে। গিন্নিও আসিয়াছেন। বিপিন নিজের আসনে বসিয়া বলিল—কাল থেকে আমিই শুধু পড়্ব না, তোমাদেরকেও পড়াব। তোমাদের পড়্তে হবে।

গিন্নি বলিলেন—ছিঃ মেয়েমানুষের কি পড়্তে আছে? মেয়েমানুষে পড়লে বিধবা হয়, কলঙ্কিনী হয়।

এই বলিয়া তিনি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মালতীর দিকে চাহিলেন। এবং গিন্নির দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া সকলেই মালতীর দিকে চাহিল। মালতী চকিতে একবার বিপিনের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া মাথা নত করিয়া বিনির হাত দুখানি নিজের মুঠির মধ্যে চাপিয়া ধরিল।

বিপিন মায়ের দিকে অনুযোগের দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—মেয়েমানুষ লেখাপড়া শিখলেই বিধবা হয়, খারাপ হয়, এ কথা তোমাদের কে বল্লে? এই যে কল্‌কাতার সব মেয়েরাই লেখাপড়া শিখছে, পুরুষেরাই ত শেখাচ্ছে? পুরুষেরা কি তাহলে আত্মহত্যা কর্‌বার অস্ত্র তৈরি কর্‌চে?

জয়া বলিল—যারা মানে না তাদের হয় না। যারা মানে তাদের হয়।

বিপিন হাসিয়া বলিল—তবে ত সোজা উপায়ই রয়েছে, তোমারও মেনো না।

গিন্নি বলিলেন—না না, ওসব অনাচর আমাদের হিঁদুদের সয় না। —ঐ ত ছোট্ ঠাকুরপো কিছু মান্‌তেন না, ছোট বৌকে ত লেখাপড়া শেখাচ্ছিলেন। তাতে ছোট-বৌয়ের ভালোটা কি হল? লেখাপড়া শিখে কর্‌বেই বা কি? জমিদারীও দেখতে হবে না, চাকরীও কর্‌তে হবে

না। আরো, লেখাপড়া শিখে অনেক মেয়েই খৃষ্টান বিবি হয়ে যায়, চেয়ারে বসে, বই মুখে দিয়ে কাজ কর্ম্ম ভুলে যায়, রান্নাবান্না ঘরকন্না তখন ভাড়াকরা দাসদাসীর হাতে ওঠে, আর এদিকে ভিটেয় ঘুঘু চর্‌বার জোগাড় হয়। যারা ঘরকন্না কর্‌বে, দুবেলা হাঁড়ি ঠেল্‌বে, তাদের লেখাপড়ার দর্‌কার কি ?

বিপিন বলিল—হাঁ, রান্নাবান্না ঘরকন্না করাই মেয়েদের প্রধান কাজ বটে, কিন্তু লেখাপড়া জেনে ঐসব কর্‌লে আরো ভালো কোরে কর্‌তে পারে; ছেলেপুলেদের সুপথে সুভাবে পালন কর্‌তে পারে। তুমি বল্‌ছ লেখাপড়া শিখলে কেউ ঘরকন্নার কাজ করে না; কিন্তু এটা কি ঠিক কথা হল? যারা করে না তারা না-শিখেও করে না। বড়লোকের ঘরের মেয়েরা লেখাপড়াও শেখে না, কাজকর্ম্মও করে না। তোমার বাড়ীতে ত এতগুলি মেয়ে আছে, কে কত কাজ কর্‌ছে? রাতদিন লোকের কুৎসাই আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু লেখাপড়া শিখলে তবু একটা ভালো অবলম্বন ত পায়। আর শুধু কি তাই, মনটা বড় হয়, কত দিকে চোখ খুলে যায়, এখন যেসব ব্যাপারের কোনো মানে বোঝে না, লেখাপড়া শিখলে তার মধ্যে কত আশ্চর্য্য অর্থ দেখতে পায়; লেখাপড়া শিখলে মন চিন্তা কর্‌তে শেখে; আসল ধর্ম্ম কি, মঙ্গল কিসে তা চিনে নিতে পারে; মন পবিত্র হয়, উন্নত হয়; আর কত বল্‌ব। আর জমিদারী দেখা, চাকুরি করা?—দর্‌কার হলে তাও স্বচ্ছন্দে কর্‌তে পারে। এই ধরো মালতীর মতন যার কেউ নেই, তার পরের বাড়ীতে উঠতে বসতে গঞ্জনা সহার চেয়ে স্বাধীন ভাবে নিজের অন্ন নিজে উপার্জ্জন করা কি ভালো মনে হয় না: আর খুড়িমা যদি লেখাপড়া জান্‌তেন তা হলে তাঁর জমিদারী তিনি নিজেই দেখতেন, অন্য কাউকে কষ্ট কর্‌তে হত না।

মালতী ও খুড়িমার প্রতি তাঁদের দুর্ব্যবহারের কথা প্রকারান্তরে স্মরণ করাইয়া দেওয়াতে গিন্নি বিপিনের প্রতি বিরক্ত হইয়া বলিলেন—তোর ত রাতদিন শুধু খুড়িমার আর মালতীরই চিন্তা। সকল তাতেই তাদেরই তুলনা! তুই তাদেরই লেখাপড়া শেখা! আমাদের নিয়ে টানাটানি করিস্ কেন?—বলিয়া গিন্নি মুখ ভার করিয়া বসিলেন।

বিপিন হাসিয়া বলিল—ওঁদের ত শেখাবই, কিন্তু তোমাদেরও টানাটানি কর্‌তে ছাড়ব নাকি। আমি তোমারই ত ছেলে, জানো ত তোমারই মতন একগুঁয়ে।

বিপিনের একটু স্নেহের স্পর্শে গিন্নি আবার প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—তুই কি চিরকাল ছেলেমানুষই থাক্‌বি?

জয়া গিন্নিকে প্রসন্ন দেখিয়া বিপিনের প্রসন্নতা লাভ করিবার জন্য বলিল—আচ্ছা বিপিন, আমি ত বিধবা মানুষ, আমি তোমার কাছে পড়ব, আমার ত কোনো ভয় নেই।

বিপিন ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে শুধু একবার তার দিকে তাকাইয়া মুখ অন্য দিকে ফিরাইয়া লইয়া বলিল—ক্ষমা, তোদের পড়তে হবে। বুঝলি? কাল থেকেই। তোরা কে কতদূর পড়েছিলি, একটু আধটু কিছু জানিস্, না একেবারে ক খ থেকে আরম্ভ কর্‌তে হবে?

বিপিনের উপেক্ষা গ্রাহ্য না করিয়া জয়া বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বলিল—আমি আর দিদি পের্‌থম ভাগ থেকেই আরম্ভ কর্‌ব। আর-সবাই একটু আধটু তবু জানে।

বিপিন বলিল—কাল থেকে আমাদের পাঠশালা খোলা যাবে। বৌরা যদি আমার কাছে পড়তে লজ্জা করে তবে তাদের মালতী পড়াবে।........ মালতী, তুমি কি পড়বে? তোমার যে-বই দর্‌কার হবে যখন খুসি আমার ঘর থেকে নিয়ে এসে পড়বে।

এমনি জোর করিয়া বিপিন মালতীর সহিত আপনার পরিচয়টা সহজ করিয়া তুলিতে চাহিতেছে বুঝিয়া মালতী ঈষৎ ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল। বিপিন তখন উৎফুল্ল ভাবে মহাভারত পাঠ আরম্ভ করিল।

এমন সময় রোহিণী আসিয়া বলিল—মা, দুবেজি বল্‌লে মাইজীকো বলো ঘরামি এসেছে।

—হাঁ, ঐ গোয়ালঘরের পাশে একখানা চালা তৈরি কোরে দিতে বল্‌গে।

বিপিন জিজ্ঞাসা করিল—ওখানে চালা কি হবে, মা?

—আঁতুড় হবে। পাঁচুর মার ছেলে হবে কিনা তাই।

পাঁচুর মা আর-একটু ঘোমটা টানিয়া মাথা নত করিল।

বিপিন বলিল—কি সর্ব্বনাশ! এই আজ বাদে কাল ছেলে হবে, ঐ স্যাঁতা কুঁড়েঘরে, গোয়ালের পাশে, পুকুর-পাড়ে, বাড়ীর বড় নর্দ্দমাটার ধারে! এ যে একেবারে মেরে ফেল্‌বার ব্যবস্থা!

গিন্নি বিস্মিত হইয়া বলিলেন—কেন? মেরে ফেল্‌বার ব্যবস্থা কেমন কোরে হল? তুই কোথায় ভূমিষ্ঠি হয়েছিলি?—তারপর নিজের মৃত পুত্রটিকে স্মরণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গিন্নি বলিলেন—সেই হতভাগা পুলিন, আর বিনোদ, বিনি, সবাই ত ঐখানেই হয়েছে।

—হবে না কেন? কিন্তু তার ফল কি হয়েছে দেখ দেখি। আমাকে প্রসব কোরে আমার মা তিনদিন পরেই মারা গেলেন। ভাগ্যিস্ তুমি আমায় আঁতুড় থেকে বাড়ীতে এনেছিলে, তাই এখনও তোমার সঙ্গে তর্ক কর্‌ছি, নইলে আমারই নজিরের নথি বেড়ে যেত—

গিন্নি বলিলেন—ষাট ষাট! ও কি কথা বিপিন!

—না, তোমার ভয় নেই, আমার মর্‌বার জন্যে আপাতত তত আগ্রহ নেই। আমি তোমার কোল জোড়া কোরে অনেক দিন এখনো বাঁচব আর জ্বালাব।……

গিন্নি সস্নেহে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে বিপিনের দিকে চাহিয়া বলিলেন—তা জ্বালাস, বেঁচে থেকেই জ্বালাস্। যমের জ্বালা ত আমার জান্‌তে বাকি নেই…… তেমন জ্বালা যেন শত্রুরও না হয়।

গিন্নি উদাসভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলেন।

বিপিন হাসিয়া বলিল—যম-রাজাকে ত নিমন্ত্রণ কোরে নিয়ে আস তোমরা নিজেরা, তার পরে হা-হুতাশ কোরে সারা হও। জগতের নূতন অতিথিদের অভ্যর্থনা কর্‌বার ঘর যে পরিপাটি কোরে তৈরি কর, তা দেখে তাদের আত্মাপুরুষ পালাই-পালাই ডাক ছাড়তে থাকে! আমি এ বাড়ীর প্রথম অতিথি, আমার ভাগ্য ভালো যে মা হারিয়েও মা পেলাম, আবার ফাঁকতালে বেঁচেও গেলাম। কিন্তু আমার পরে যারা এসেছে তাদের দেখ দেখি—পুলিনের সেই যে আঁতুড়ঘরে অসুখ হয়ে শরীর খারাপ হয়ে গেল তা আর শোধরাতে পার্‌লে না। বারো বছর কোনো রকম কোরে টিকে ছিল, কিন্তু সেও ত বেঁচে মোরে থাকা। তারপর বিনো আর বিনিও ত তালপাতার সেপাই।

বিনি মালতীর কোল হইতে উঠিয়া বিপিনের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল—বল্‌দা, আমি সেপাই না, আমি বিনি।

বিপিন তাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—এই-সব আনন্দের পুতুলের আরো কত স্ফূর্তি হতে পার্‌ত, যদি এরা সৌন্দর্য্যের মধ্যে, স্বস্থ আব-হাওয়ার মধ্যে বাড়তে পেত।

গিন্নি বলিলেন—আঁতুড়-ঘর ত চিরকাল সকলেরই অম্‌নি জায়গায় হয়।

—যাদের হয় তাদের হয়, আর তার ফলও তেম্‌নি হয়। কিন্তু তোমার কি ঘরের অভাব আছে যে একটা স্যাঁতা জায়গায় চালা তুলে তবে ছেলে হবে? যাদের বুকে কোরে রাখতে ইচ্ছে করে, তাদের অভ্যর্থনা হবে কিনা নর্দ্দমার পাড়ে সারকুড়ের গন্ধে! ছি!

গিন্নি বিরক্ত হইয়া বলিলেন—তবে তোর কি মত যে ঠাকুরঘরে ছেলে হবে?

বিপিন স্থির শান্ত ভাবেই উত্তর দিল—হ্যাঁ, ঠাকুরঘরে না হোক্ ঠাকুরঘরের মতন ভালো ঘরেই হওয়া উচিত।

—ওসব ম্লেচ্ছপনা আমরা থাকতে ত হবে না। আমরা মোরে গেলে তোর যা খুসি করিস্।

—না মা, তা হবে না, তোমরা বেঁচে থাক্‌তেই আমার যা খুসি তাই তোমাদের কর্‌তে হবে। ওরকম আঁতুড়ঘরে আমি কিছুতেই কারো ছেলে হতে দেবো না।

—আমার বাড়ীতে ত একপাশে এমন খালি ঘর নেই যেখানে ছেলে হতে পারে। ঠাকুর-দেবতার বাড়ী, ওসব অনাচার আমি দেখতে পার্‌ব না। ওসব সইবে না।

—মা, ঠাকুর-দেবতাই ত ছেলে দেন, এ আশীর্ব্বাদ ত মা তাঁরই। তুমি ঘর ছেড়ে দিতে না পারো, আমি ঘর ছেড়ে দেবো। আমার শোবার ঘরে ছেলে হবে।

গিন্নি অতিমাত্র বিরক্ত ও বিস্মিত হইয়া বলিলেন—বিপিন, তোর সব ঘেনাছিষ্টি আবদার! তুই ক্ষ্যাপা না পাগল! শোবার ঘরে ছেলে হবে কি? তুই শুবি কোথায় শুনি?

—আমি আমার পড়বার ঘরে শোব।

—সেখানে তোর বইয়ের জায়গা হয় না, খাট ধর্‌বে?

—খাটের দরকার নেই, আমি কৌচের উপর শুতে পারব।

গিন্নি পরাস্ত হইয়া বলিলেন—এই ঘরে দাই আস্‌বে, হাড়িবৌ এসে সব একাকার ঘণ্টমঙ্গলা করবে ?

—হাড়িবৌ ত রোজ ওপরে আসে তোমার পাইখানা ধুতে, তাতে দোষ হয় না ?

—সে ত একবারটি আসে, চোলে গেলে গোবরজল ছড়া দিয়ে শুদ্ধ করা হয়।

এও একবারটি এসে চোলে যাবে। তারপর ইচ্ছে হয় গোবরজল ছড়া দিয়ে শুদ্ধ কোরে নিয়ো।

—একবারটি এলেই হল ? আঁতুড়ঘরে থাক্‌বে কে ? ঝাল, পাচন, জল, খাবার দেবে কে ?

—ঐ নোংরা হাড়ি বুঝি আঁতুরঘরে থাক্‌বে আর খেতে দেবে ? আরে রাম ! তার সঙ্গে এক ঘরে থাক্‌লে জাত যাবে না ? ছোঁয়া খেলে জাত যাবে না ?

আঁতুড়ঘর শুদ্ধ, তখন জাত যায় না।

—তোমাদের শাস্তরের মহিমা বুঝে ওঠা ভার। লোকের মনগড়া শাস্তর, যখন যেমনটি চাই তখন তেমনি বিধান প্রস্তুত। কিন্তু শাস্তর যাই বলুন, চোখে ত দেখ্‌ছ যে হাড়ি ডোমেরা কত অপরিষ্কার। আর ওরা অপরিষ্কার বোলেই ত ওরা অস্পৃশ্য হয়েছে। তার চেয়ে তোমাদের একজন থেকো না কেন ? এই ত মোক্ষদা, ক্ষমা, জয়া-ঠাক্‌রুণ কত লোক নিষ্কর্ম্মা রয়েছে—আর দাসীও ত আছে গণ্ডা পাঁচেক। তবু ঐ হাড়িবৌটি না থাক্‌লে চল্‌বে না ?

—আঁতুড়ঘরে কেউ ত থাক্‌তে পার্‌বে না ; অশুদ্ধ হয়ে যাবে যে ; গঙ্গা না নাইলে শুদ্ধ হবে না।

—আমি না হয় গঙ্গা নাইয়ে আন্‌বার ভার নিচ্ছি! কে থাক্‌বে আঁতুড়ে বলো। ক্ষমা থাক্‌বি ?···মোক্ষদা তুই থাক্‌বি ?

সকলে নিরুত্তর।

তখন মালতী তার বড় বড় চোখ তুলিয়া শান্ত স্বরে বলিল—আমায় থাকৃতে দিলে আমি থাকৃতে পারি।

বিপিন নিরাশার মধ্যে আশ্বাস পাইয়া আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় মালতীর দিকে একবার চাহিয়া মাকে উৎফুল্ল ভাবে বলিল—এই দেখ মা, আমি লোক পেয়েছি, আর তোমার ওজর খাট্‌বে না···যা রোহিণী, দুবেজীকে বল্‌গে ঘরামি আর চাইনে।

—তোদের যা খুসি কর্‌গে যা—বলিয়া গিন্নি ক্রোধভরে সেস্থান হইতে চলিয়া গেলেন; বিপিনকে তিনি হয় ত কাবু করিতে পারিতেন, কিন্তু গায়ে-পড়া মালতী ছুঁড়ির জন্য যে তাঁর পরাজয় ঘটিল এতে গিন্নির মন মালতীর প্রতি অতিরিক্ত বিরূপ হইয়া উঠিল।

সেদিন আর বিপিনের পাঠসভা জমিল না। বিপিন মালতীকে বলিল—এস মালতী, তোমাকে আমার বইয়ের ঘর দেখাইগে।

মালতীর চারিদিকে সংঘাতের আবর্ত্ত যতই ফেনাইয়া উঠিতেছিল বিপিন সেই ঘূর্ণাবেগে ততই তার দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল। আজ মালতীর সহিত মতের একতায় বিপিনের অনুরাগ-পক্ষপাতী চিত্ত মালতীকে পরমাত্মীয় মনে করিতে লাগিল, এবং বিপিনের সৎসাহস ও সদনুষ্ঠানের প্রবৃত্তি দেখিয়া মালতীরও অন্তর বিপিনের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতিতে আকৃষ্ট হইতেছিল। মালতী বিপিনের সহিত প্রস্থান করিলে পুরাঙ্গনাদিগের বিদ্রূপহাস্য তাদের পশ্চাতে ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া নিবারণ মুখুয্যে একটি থেলো হুঁকোয় তামাক খাইতেছিল। তার পাশে একটি মাটির তামাকদানিতে কয়লা, তামাক, টিকে, চকমকি, সোলা এবং একটা কাঠের ছোট পিঁড়িতে দুসারে আটটা গোল গোল ফুটোর উপর আটটি সাজা কল্কে মুখ-অগ্নির প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। মুখুয্যে মুহুর্মুহু পোড়া কল্কে নামাইয়া সাজা কল্কেতে আগুন দিয়া হুঁকার মাথায় চড়াইতেছে।

শীতের সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। গোয়ালঘর পাকশালা হইতে ধূমরাশি কুণ্ডলি পাকাইয়া উঠিতেছে; কিন্তু হিমমন্থর অলস বাতাস তাহা বহন করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিতেছে না, উঠানের পাশের কুঙ্কচূড়ার চূড়ায় দীর্ঘ ধূসর পাগড়ী পাকাইয়া জড়াইয়া দিতেছে। ঘাসের মধ্যে একটা ঝিঁঝি সন্ধ্যার নিস্তব্ধতাকে করাত দিয়া চিরিতেছিল, একটা কাঠঠোক্‌রা থাকিয়া থাকিয়া ঠক্‌ঠক্‌ঠর্‌র্‌ করিয়া মৌন সন্ধ্যার ধ্যান ভঙ্গ করিতেছিল।

নিবারণ ডাকিল—ওরে গোব্‌রা, গোব্‌রা!

অন্তঃপুর হইতে বিরক্তিকর্কশ কণ্ঠে উত্তর হইল—কি? কেন চেঁচাচ্ছ? কেবলই গোব্‌রা গোব্‌রা!

নিবারণও বিরক্ত হইয়া বলিল—ওরে সন্ধ্যে হয়ে গেল, আরতি কর্‌তে যাবি কখন্‌?

শ্রীমান্‌ গোবর্দ্ধন গাঁজা টিপিতে টিপিতে বাহিরে আসিয়া বলিল—রোজ রোজ আমি যেতে পার্‌ব না। তুমি যাওনা কেন? আজ মুচি-পাড়ায় ঝুমুর নাচ হবে; আমি দেখতে যাচ্ছি।

নিবারণ মিনতির স্বরে বলিল—ওরে ঝুমুর নাচ ত সারারাত হবে; একবার ঘণ্টাটা নেড়ে পঞ্চপ্রদীপটা ঘুরিয়ে নৈবিদ্যি শেতল জলখাবার-

গুলো বাড়ীতে এনে ফেলে তারপর তোর যেখানে খুসি সেখানে মর্‌গে না।

—আমি রোজ রোজ যাই, তুমি একদিন যাওনা কেন?

—আরে আমি কি ছাই আরতি-টারতি কর্‌তে জানি?

—আমিই বড় জানি কিনা?

—তবু তোদের কচি হাড়, ইচ্ছে-মতন ঘোরে-টোরে। আমাদের হাড় আড়ষ্ট হয়ে গেছে, ঘণ্টা নড়ে ত প্রদীপ নড়ে না, প্রদীপ নড়ে ত ঘণ্টা চুপ করে।

—ন্যাও! অতশত কেউ দেখবে কিনা? ঘণ্টাটা নেড়ে দুটো ফুল ছড়িয়ে দিয়ে চোলে এসগে।

—তুই ত বল্‌লি চোলে এসগে। কিন্তু সত্যি কথা বলি শোন্‌। ঐ কিশ্‌রে আর বিপ্‌নেকে দেখলে আমার হৃৎকম্প হয়; ওদের চাউনি দেখলে বুকের রক্ত জল হয়ে আসে। তাতে আবার ভট্‌চায্যিকে একঘরে করেছি বোলে বিপ্‌নে আমার ওপর তিরিখখি হয়ে আছে। কি জানি বাবা ঠাকুরঘরে একলা পেয়ে ঠুকে-মুকে দেবে!

—তোমায় ঠুক্‌তে পারে আর আমায় বুঝি ঠুক্‌তে পারে না।

—খুব পারে। কিন্তু তোদের হাড় ভাঙলে জোড়া লাগবে, আমার বুড়ো হাড় জন্মের মতন যাবে।

—না, আমার হাড় ভেঙেও কাজ নেই, জোড়া লেগেও কাজ নেই। ভট্‌চায্যিকে একঘরে কর্‌লে কি শেষে আমার হাড় ভাঙবার জন্যে। এত ভয়ে-ভয়েই যদি থাক্‌তে হল তবে ওদের একঘরে কোরে লাভ হল কি?

—লাভ আবার হয়নি? এক ঢিলে দুটো পাখী মরেছে দেখছিস্‌নে? ভট্‌চায্যি জব্দ হয়েছে; আর লক্ষ্মীজনার্দ্দনের আশীর্ব্বাদে সেদিন থেকে তোর গর্ভধারিণীকে উননে হাঁড়ি চড়াতে হয়নি। প্রসাদ, নৈবিদ্যি,

শেতল, জলপানি, রোজ যা আসে খেতে খেতে পেটের অসুখ হয়ে গেল; তবু বলিস্ লাভ হয়নি ?

—তা যাই বলো, আমি আজ কিছুতেই যেতে পারব না। তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে বক্‌বক্ করছি, এতক্ষণ হয় ত ওদিকে ঝুমুর আরম্ভ হয়ে গেল। জানো, এ ঝুমুর ভাগলপুর থেকে এসেছে !

আর কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া শ্রীমান গোবর্দ্ধন প্রস্থান করিলেন। নিবারণ—অকালকুষ্মাণ্ড, পাজি, প্রভৃতি বিবিধ উপযুক্ত ও সম্পর্কবিরুদ্ধ বিশেষণে পুত্রকে অভিহিত করিতে করিতে হুঁকা রাখিয়া উঠিল। বাঁশের আন্‌লা হইতে গাম্‌ছা ও নামাবলি এবং ঘরের কোণে ঠেসানো একগাছি বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া ডাকিল—ওরে ছিরে, ছিরে রে !

এজ্ঞে—বলিয়া হাতে সানি মাখা ও পায়ে গোবর লেপটানো অবস্থায় ছিরে গোয়ালঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

নিবারণ তাকে বলিল—ওরে একবার লণ্ঠনটা জ্বেলে দে ত, বাবুদের বাড়ী আরতি করতে যেতে হবে।

ছিরে লণ্ঠন জ্বালিতে চলিয়া গেল। নিবারণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল—দোহাই মা কালী, জয় বাবা লক্ষ্মীজনার্দ্দন, বিপিনের সাম্‌নে যেন না পড়ি। দোহাই বাবা ! জয় মা ! ভালোয় ভালোয় প্রাণে প্রাণে বেরিয়ে আসতে পার্‌লে একপয়সার হরির লুট দেবো বাবা। শ্রীহরি শ্রীহরি ! বিপত্তে মধুসূদন ! দুর্গা দুর্গতিহারিণী !···সাধে কি ঠাকুর-দেবতার ধার ধারিনে ! ঠাকুর-দেবতার কথা মনে কর্‌লে মনের ভেতরটা কেমন ছমছম কর্‌তে থাকে, কোনো কাজই নির্ভয়ে করবার জো থাকে না। রামঃ !···না না, এখন ও-কথাটা ভাবা ভালো হচ্ছে না। দুর্গা দুর্গা ! মধুসূদন মধুসূদন !

ছিরে একটি চৌকোণা লণ্ঠনের মধ্যে একটা কেরোসিনের ডিবে জ্বালিয়া আনিল। লণ্ঠনটির একপাশের কাচ নাই, সে দিকটায় ছেঁড়া হিন্দুহিতৈষী আঠা দিয়া লাগানো; তার পাশের কাচখানার উপরদিকটা টিনের জোড় হইতে খুলিয়া ভিতর দিকে ঝুলিয়া পড়িয়া নড়নড় করিতেছে; তার পাশের কাচখানা ফাটা; একখানা মাত্র কাচ আস্ত আছে। লণ্ঠনের ভিতরটায় গলা বাতির উপর রেড়ি ও কেরোসিন-তেল পড়িয়া থকথক করিতেছে। কেরোসিনের ডিবে হইতে আলোক অপেক্ষা ধূমই অধিক নির্গত হইতেছিল। ছিরে লণ্ঠনটি আনিয়া নিবারণের হাতে দিল। নিবারণ লণ্ঠন হাতে করিয়াই বলিল—এঃ! কি লাগিয়েছিস্? গোবর নাকি?

ছিরে দাঁত বাহির করিয়া বলিল—এঁ! গোবর ক্যানে? খোল-পচা! আমি সানি দিতেছিনু কিনা!

নিবারণ বলিল—এঃ এঃ! আহম্মক বেটা। হাতটা ধুয়ে মুছে নিতে পারিস্‌নি? দে দে এখন একটু ন্যাকড়া কি কাগজ দে। রামঃ! হাতময় লেগে গেল।

ছিরে একটু কাগজ আনিয়া দিল। তাতে হাত ও লণ্ঠন কথঞ্চিৎ মুছিয়া নিবারণ ঠাকুরের আরতি করিতে যাত্রা করিল—দুর্গা দুর্গা! মধুসূদন মধুসূদন!

বাড়ীর বাহির হইতেই বেড়ার পাশে শুক্‌নো পাতার উপর কি খড়খড় করিয়া উঠিল; একটা শেয়াল রাস্তার একদিক হইতে অন্য দিকে ছুটিয়া গেল; একটা বাদুড় তার কালো দীর্ঘ ডানা মেলিয়া মুখুয্যের সাম্‌নে ছায়া ফেলিয়া উড়িয়া গেল; একটা হুতুম-পেঁচা তেঁতুল-গাছের ঘন কুঞ্জ হইতে গম্ভীর রবে ডাকিয়া উঠিল—ধুতু-ধুতু-ধুতুরুম্!

নিবারণ মনে মনে বলিতে লাগিল—রাম রাম! সব অলক্ষণ!

খড়খড় কর্‌লে ওটা নিশ্চয় সাপ! বামে সর্প, দক্ষিণে শৃগাল, সম্মুখে বাদুড়, ঊর্দ্ধে কালপেঁচা! একেবারে চারপোয়া অলক্ষণ পরিপূর্ণ! মধুসূদন মধুসূদন! আজ নির্ঘাত লাঞ্ছনা আছে বিপ্‌নের হাতে! দুর্গা! দুর্গা! জমিদারের ছেলে হবে নাদুসনুদুস গোবরগণেশ গোচের। তা না, যেন রঘো ডাকাতের চেলা! জমিদারের ছেলে বিছানায় শুয়ে ভুঁড়িতে হাত বুলুতে বুলুতে তামাক খাবি, বড়জোর এক চক্কর গাড়ীতে চোড়ে মেঠো হাওয়া খেয়ে আস্‌বি! তা না, সব অনাছিষ্টি! খেল্‌বেন কিনা ব্যাটবল, ভাঁজবেন কিনা ডম্বল! আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ!·· দূর করো ছাই, আবার বাজে চিন্তা কর্‌ছি। কেমন অনভ্যেস, কিছুতেই ঠাকুর দেবতার নাম জপ কর্‌তে পারিনে। দুর্গা দুর্গা! শ্রীহরি শ্রীহরি! মধুসূদন মধুসূদন!

অন্দরের দেউড়িতে আসিয়া নিবারণ দেখিল অন্দরের বৃদ্ধ দ্বারবান দুবেজি দুই হাতে তার সুশুভ্র শ্মশ্রুরাজি চিবুকের মধ্যস্থলে বিভক্ত করিয়া উপর দিকে তুলিয়া দিতে দিতে সুর করিয়া গাহিতেছে—

সুমিরত রামহি ভজহি জন তৃণসম বিষয়বিলাসু।
রামপ্রিয়া জগজননি সিয় কছু ন আচরজু তাসু॥

নিবারণ আসিয়া ভয়জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—নমস্কার দুবেজি! ছোট-বাবু কাঁহা ?

—নমস্কার মুখুয্যা মাহাশে। ছোটবাবু ত আভি বাহার গিলো। ভট্‌চায-মাহাশের বাড়ী গিয়ে উয়ে হোবে।

নিবারণ আশ্বস্ত হইয়া অন্দরে প্রবেশ করিয়া ডাকিল—রোহিণী।

রোহিণী দুধ জ্বাল দিতেছিল। উচ্ছ্বসিত দুগ্ধ আলোড়ন করিতে করিতে বলিল—কে গা ?

—আমি নিবারণ। ঠাকুরের আরতি কর্‌তে এসেছি।

রোহিণীর নিকটেই একজন দাসী বাটনা বাটিতেছিল ও দুজন কুটনো কুটিতেছিল। রোহিণী ব্যস্ত হইয়া বলিল—সারি, সারি, দুধটা একটু নড়না ভাই। আমি মুখুয্যে-মশায়কে ঠাকুরঘরে দিয়ে আসি····· বাবা! সবারই মুখে শুধু রোহিণী আর রোহিণী! রোহিণী ছাড়া যেন বাড়ীতে আর নোক নেই।

রোহিণী মুখুয্যের আহ্বানের প্রথম আনন্দ-উল্লাস চাপা দিয়া যেন কত অনিচ্ছায় বিরক্ত হইয়া দুধের হাতা সারদার হাতে দিয়া প্রস্থান করিল।

নিবারণ উঠানে দাঁড়াইয়া ছিল। রোহিণী আসিয়া বলিল—এস্থন।

রোহিণীকে অনুসরণ করিয়া যাইতে যাইতে মুখুয্যে বলিল—কি,—রোহিণী, তোমাদের রাজবাড়ীর খবর কি? নতুন খবর-টবর কিছু আছে?

—আমাদের তো নিত্যি নতুন খবর। দাদাবাবু মেয়েদের সব বই পড়াচ্চে; শোবার ঘরে আঁতুড় কর্‌ছে,···দেখছ কি অবাক হয়ে মুখুয্যে-মশায়, সত্যি মাইরি বল্‌ছি এই তোমার গা ছুঁয়ে, এই সব হচ্ছে!

আঁ্যা বলিস্‌ কি? গিন্নি কিছু বলেন না?

—রাণীমা আমাদের মাটির মানুষ। নইলে আর সতীনপুতের এত আবদার সয়! তুমি একবার রাজাবাবুকে বলো না?

—হঁ্যা হঁ্যা তা ত বল্‌তে হবে। এমন সব অনাচার! তারপর শুন্‌চি, বিপ্‌নে নাকি একঘরেদের বাড়ী যায়?

—তা যায় বৈকি! কিশোর হল গিয়ে দাদাবাবুর প্রাণের ইয়ার।

নিবারণ গম্ভীর চিন্তিতভাবেই বলিল—হুঁ!···আচ্ছা বল্‌তে পারো রোহিণী, কার আঁতুড় বাবুর শোবার ঘরে হবে। ঐ মালতী ছুঁড়ির নাকি?

—না, না, এখনো অতদূর হয়নি; তবে হতে বিলম্বও নেই। আপাতত পাঁচুর মার পালা।

—ও! তা ওর ওপর অত দরদ কেন?

—কি জানি বাবু, ওর ভেতরে কি আছে !

—হরি হে মধুসূদন! তোমার ইচ্ছা !—বলিয়া নিবারণ পা ধুইয়া ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিল।

রোহিণী বলিল—আপনি ততক্ষণ আরতি করুন, আমি জয়া-পিসিকে বোলে আসি ঠাকুরের শেতল আন্‌তে।

ঠাকুরঘরে কাউকে না দেখিয়া নিবারণ পরম আরাম বোধ করিল। সে তাড়াতাড়ি পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়া খুব জোরে ঘণ্টা নাড়িতে লাগিল এবং শাঁখের জল ছড়াইয়া এখানকার জিনিস সেখানে রাখিয়া চটপট আরতি সম্পন্ন করিল।

ঠাকুরের জলপানি লইয়া জয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া ডাকিল—রোহিণী, এখানটা একটু হাত মার্জ্জনা কোরে দে।

রোহিণী হাত মার্জ্জনা করিতেছে, জয়া জলখাবার হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, মুখুয্যে আসনের উপর দাঁড়াইয়া দুই হাতে ধরিয়া প্রাণপণ শক্তিতে শাঁখে ফুঁ পাড়িতেছে, এমন সময় বিপিন ঘরে আসিয়া হা হা করিয়া উচ্চরবে হাসিয়া উঠিল।

তার অট্টহাস্যে চমকিত হইয়া রোহিণীর হাত হইতে জলের ঘটী, জয়ার হাত হইতে জলখাবার, মুখুয্যের হাত হইতে শাঁখ ঝন ঝন ঝন ঝন শব্দ করিয়া পড়িয়া গেল।

বিপিন হাসিতে হাসিতে বলিল—বাঃ বাঃ! ঠাকুরের অদৃষ্ট ভালো! নন্দকিশোর স্মৃতিরত্নের বদলে নিবারণ মুখুয্যে, খুড়িমার বদলে জয়াঠাকরুণ ঠাকুর-সেবার ভার পেয়েছেন; আর তার ওপর রোহিণী এসে জুটেছেন! একেবারে ত্রি-অস্পর্শ!

বিপিন আবার হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ঝন ঝন শব্দ শুনিয়া গিন্নি "কি হল, অ্যাঁ কি হল?" বলিতে বলিতে

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন সকলে হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর বিপিন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসিতেছে।

ঘোম্‌টা টানিয়া ফিসফিস করিয়া গিন্নি উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন —এঁ জয়াঠাকুরঝি, ফেল্‌লে কেমন কোরে? এখন কি হবে? কি দিয়ে ঠাকুরের শেতল হবে বলো ত? ওলো রোহিণী, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিস কি, জল থৈ থৈ কর্‌ছে, মুছে নে।

কেউ একটু নড়িতেও পারিল না। ওদের কাণে বিপিনের বিদ্রূপের হাসি প্রলয়কালের ভৈরব-বিষানের প্রতিধ্বনির মতন বাজিতেছিল হা হা হা।

বিপিন হাসিতে হাসিতে বলিল—মা, ঠাকুর এমন শুদ্ধ আচারের লোকেদের হাতে কিছু খাবেন না বোলে খাবার উল্টে ফেলে দিয়েছেন। যেখানে নিবারণ মুখুয্যে পূজারী, জয়াঠাকুরুণ জোগাড়ী, আর রোহিণী পাটকরণী, সেখানে মানুষেরই খেতে প্রবৃত্তি হয় না, ত ঠাকুরের! নিজেরা যদি সেবা কর্‌তে পার্‌বে না তবে পাপের বোঝা বাড়াতে বাড়ীতে ঠাকুরের ল্যাঠা রেখেছ কেন? ঠাকুর কি তোমার জমিদারী সেরেস্তার গোমস্তা যে তোমার হুকুম শুন্‌বে আর তোমার হাততোলা প্রসাদ পেয়ে কৃতার্থ হয়ে যাবে?

গিন্নি ফিসফিস করিয়া বলিলেন—আঃ কি অলক্ষুণে কথা বলিস্‌ বিপিন, ঠাকুর-দেবতাও তোরা মানিস্‌ নে?

বিপিন উচ্চ কণ্ঠে বলিল—মানি বোলেই ত এই-সব ভণ্ডামি আর অনাচার সহ্য হয় না। যাদের মুখ দেখলে পাপ হয়……

—আঃ কি করিস্‌! যা যা তুই এখান থেকে যা—বলিয়া গিন্নি বিপিনকে ঠেলিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন। বিপিন হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

গিন্নি বলিলেন—যাও জয়াঠাকুরঝি, আলাদা দুধ সন্দেশ নিয়ে এসে ঠাকুরের জলপানি দাও।...মুখুয্যে-মশায়কে বলো একটু যেন থাকেন, আমি এক্ষুণি লুচি ভাজিয়ে দিচ্ছি।

নিবারণ এদিক ওদিক চাহিয়া বিপিন আছে কি না দেখিয়া বলিল—আমার বিশেষ কাজ আছে মা, আমি আর বিলম্ব কর্‌তে পার্‌ব না, এক্ষুণি যাব···মধুসূদন মধুসূদন!

সে এই যমপুরী হইতে পলাইতে পারিলে বাঁচে, তার আর লুচি খাইয়া কাজ নাই। তার মনে হইতেছিল এখনি হয়ত কোনো দেয়াল বজ্রহাস্যে বিদীর্ণ করিয়া নৃসিংহ-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া বিপিন তাকে নখে করিয়াই ছিঁড়িয়া ফেলিবে।

গিন্নি বলিলেন—তবে আমি দুবেজিকে দিয়ে আপনার খাবার পাঠিয়ে দেবো।

গিন্নির সঙ্গে-সঙ্গে জয়া রোহিণী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মুখুয্যে শূন্য ঘরে একাকী বসিয়া আড়ষ্ট হইয়া জপ করিতে লাগিল—মধুসূদন মধুসূদন!

২৩

অন্দরের দেউড়ী পার হইয়া তবে নিবারণের চিন্তা-শক্তি ফিরিয়া আসিল। সে বিপিনের শ্লেষ ও অট্টহাস্য মনে করিয়া দাঁতের উপর দাঁত রাখিয়া চোখ পাকাইয়া বলিল—হুঁ! এর শোধ আমি না তুলি ত·········কি বলেছি।—নিবারণ শপথটা সাম্‌লাইয়া লইল। কারণ, সে ভাবিল, জমিদারের ছেলে বিপিনকে জব্দ করা খুব সহজ কাজ না হওয়াই সম্ভব।

নিবারণ ভাঙা লণ্ঠন হাতে লইয়া ফাটা লাঠি ঠর্‌র্‌-ঠর্‌র্‌ করিতে করিতে হরিবিহারী-বাবুর বৈঠকখানায় গিয়া উপস্থিত হইল। তখন

হরিবিহারী আহারে যাইবার উপক্রমণিকা-স্বরূপ বোতল ও গেলাস লইয়া হজমি আরক পান করিতেছিলেন।

হরিবিহারী তাকে দেখিয়া বলিলেন—কি খুড়ো! এত রাত্রে কি মনে কোরে?...বড় শীত! হবে?

হরিবিহারী স্ফটিকপাত্রে শোণিতলোহিত তারল্য নিবারণের সম্মুখে নাচাইলেন। নিবারণের মনটা প্রসন্ন ছিল না। সে অমন লোভনীয় আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিয়া বলিল—না বাপু, অত আদরে আমার আর কাজ নেই। অন্দর থেকে অপমান হয়ে এসে সদরের আদর ভেঙচানো মনে হচ্চে। আমি বল্‌তে এসেছি, কাল থেকে ঠাকুরপূজোর জন্যে অন্য লোক দেখো। আমা হতে ও কাজ হবেনা।

—কেন?—হয়েছে কি?

—বুড়ো বয়সে শেষে কি মার খাব? তোমরা বড়লোক, তোমরা সব পারো বাবাজী। তোমাদের বেলা লীলা খেলা, পাপ লিখেছে আমাদের বেলা!

হরিবিহারী নিতান্ত একান্তবাসী, সংসারের কোনো খোঁজ খবরই রাখেন না, কারো সহিত বড় একটা মেশেনও না। খাইতে শুইতে দুটবার অন্দরে যান, আর সমস্তদিন একলাটি বৈঠকখানায় তাকিয়া ঠেসান দিয়া তামাক টানেন; সুখদুঃখের সঙ্গী তাঁর রামধন খান্‌সামা; জমিদারীর কাজ কর্ম্ম সব দেওয়ানজীই দেখেন: যখন দেওয়ানজীর নিতান্ত দর্‌কার বোধ হয় তখন তিনিই প্রভুর পরামর্শ লইতে আসেন। অন্যথা অলসপ্রকৃতির সঙ্গবিরক্ত প্রভুটি কোনো কর্ম্মেই কখনো নিজে হইতে হস্তক্ষেপ করিতেন না; তাঁর ভয় পাছে তাঁকে নিজে কোনো চেষ্টা করিয়া নূতন আয়োজনের ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করিতে হয়। এই ভয়েই কোনো প্রচলিত ব্যবস্থার ব্যতিক্রম করিতে তাঁর প্রবৃত্তি ও সাহস হইত

না। ভট্টাচার্য্যকে একঘরে করিয়া কোনো অসুবিধা হয় নাই নিবারণের জন্য। এখন সেই নিবারণ কাজে ইস্তফা দিতে উদ্যত হওয়ায় চিন্তিত হইয়া বলিলেন—আরে হয়েইছে কি তাই আগে বলো শুনি।

নিবারণ বলিল—তোমার পুত্তুর, বাবাজী, গুণধর পুত্তুর! পাঁচটা পাশ করেছেন, জমিদারের ব্যাটা, তা আর অহঙ্কার ধরে না। আমার ওপর একেবারে মারমুখো! ক্যান্ রে বাপু—অপরাধের মধ্যে ত তোদেরই ঠাকুরের পূজো হয় না, দয়া কোরে পূজো কোরে দিতে এসেছি! তা অত কেন? না হয় আস্‌ব না!

হরিবিহারী স্তিমিত নেত্রে বলিলেন—না না, বিপিন কি তোমার অপমান কর্‌তে পারে? যদি কিছু অন্যায় কোরে থাকে আমি ধম্‌কে দেবো।

নিবারণ সাহস পাইয়া বলিল—হয় না-হয় জিজ্ঞাসা কোরে দেখো, সেখানে গিন্নি ছিলেন, জয়াঠাক্‌রুণ ছিল, রোহিণী ছিল। সকলের সাম্‌নে আমায় সে কী অপমান! না ভূত না ভবিষ্যতি! এই মারে ত এই মারে! গিন্নি এসে যাই হাঁ হাঁ কোরে পড়লেন তাই রক্ষে! নইলে আজ তোমার বাড়ীতে ব্রহ্মহত্যা হয়ে যেত!

—না খুড়ো, তুমি কিছু ভেব না, আমি খুব কোরে তাকে ধম্‌কে দেবো। তোমরা যেমন পূজো কর্‌ছ কোরো। বিপিন তোমায় আর কখনো কিছু বল্‌বে না।

—বিপিন না বল্‌লেও ত তোমার বাড়ী আর আমাদের আসা হবে না। তুমি গাঁয়ের জমিদার, আমাদের মাথার মণি! কিন্তু বাবাজী, সকলের ওপর ধর্ম্ম ত আছেন! তুমি খুসি হবে কি রাগ কর্‌বে বোলে ত আর জাত ধর্ম্ম ছাড়তে পারিনে।

—কেন, আবার কি হয়েছে?

—হয় নিই বা কি? তোমার বাড়ীতে মেয়ে স্কুল বসেছে; বাড়ীর ভেতরে আঁতুরঘর হচ্ছে; একঘরেদের ঘরে যাতায়াত চল্‌ছে; ম্লেচ্ছপনার আর বাকি কি? তোমাদের পেয়ারের ভট্‌চায্যিকে একঘরে কোরে ভালো করিনি দেখ্‌ছি আমাদেরই একঘরে হয়ে থাকা উচিত ছিল।

—এঁ! এতসব কাণ্ড হয়েছে? রামধন, ডাক্‌ত একবার বিপিনকে!

নিবারণ শশব্যস্ত হইয়া বলিল—না না বাবাজী, করো কি সর্ব্বনাশ! আজ রাত্তিরে কিচ্ছু বলো না, বলো না, সাত দোহাই বাবা। তাহলেই সে ঠিক বুঝতে পার্‌বে আমি তোমার কাছে লাগিয়েছি। আর সে যে গোঁয়ার-গোবিন্দ, অম্‌নি ছুটে গিয়ে আমার ঠ্যাং খোঁড়া কোরে দিয়ে ছাড়বে। দোহাই বাবাজী! ধর্ম্ম সাক্ষী, আমি তোমায় কিচ্ছু বলিনি। আমি শুধু তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছিলাম, নিজেই আমি একঘরে হয়ে থাক্‌ব তাই বল্‌তে এসেছিলাম। মধুসূদন মধুসূদন!

হরিবিহারী বলিলেন—আচ্ছা থাক্‌, আমি পরেই বল্‌ব।

নিবারণ তাড়াতাড়ি আপনার ফাটা লাঠিগাছটি লইয়া উঠিল। হরিবিহারী বলিল—তোমরা যেমন পূজো করতে আস্‌ছিলে তেমনি আসবে কিন্তু।

নিবারণ এ কথার কোনো জবাব না দিয়া মধুসূদন-নাম উচ্চারণ করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

হরিবিহারীর তোষাখানার একতলায় সাধারণ-বৈঠকখানা। সেখানে জমিদারপরিবারের আশ্রিত আত্মীয় অনাত্মীয় সকলে জটল্লা করিত, তাস পাশা খেলিত, গাঁজা গুলি মদ খাইত। নিবারণ আস্তে আস্তে একটি ঘরের দ্বারে গিয়া ডাকিল—শিবচরণ আছ?

শিবচরণ গিন্নির বোনপো, পাঁচুর বাবা। শিবচরণ তাড়াতাড়ি মদের

বোতল লুকাইয়া হাতের উল্টা পিঠটা ফস করিয়া গোঁপের উপর রগড়াইয়া লইয়া বলিল—ক্যা ?

মুখুয্যে বলিল—আমি হে আমি !

—কে মুখুয্যে-মশায় ? এত রাত্রে কি মনে কোরে ?—বলিতে বলিতে শিবচরণ দুইহাতে কাছা গুঁজিতে গুঁজিতে বাহির হইয়া আসিল।

নিবারণ তার কাঁধে হাত দিয়া একান্তে টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বলিল—একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে। তোমরা ত আমাদের বুড়ো-হাবড়া বোলে একটুও মানো না ; কিন্তু আমাদের কেমন দয়ার শরীর, কারুর বিপদ দেখলে ধৈর্য্য ধোরে থাক্‌তে পারিনে, বুক দিয়ে এসে পড়ি। আহা তুমি নিতান্ত ভালোমানুষ, কোনো কিছুরই খোঁজ রাখ না, তোমার এমন বিপদ দেখে আমি শতকার্য্য ফেলে এই দারুণ শীতের রাতে হিহি কর্‌তে কর্‌তে ছুটে এসেছি, তাতে আজকে আবার হাঁপানিটা চাগিয়েছে···!—বলিয়া নিবারণ হাঁই সাঁই শব্দ করিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

শিবচরণ ত ভূমিকা শুনিয়াই চক্ষু স্থির! কি বিপদ রে বাবা! সেদিন সে একজন প্রজার খাজনা বাবদ পাঁচ টাকা তেরো আনা সর্‌কারি বাক্সে না ফেলিয়া নিজের ট্যাকে গুঁজিয়াছিল। সেই অবধি বেচারার মনে শান্তি ছিল না, প্রাণ ধুকপুক করিতেছিল। তাই সে মদের বোতল লইয়া বসিয়া গিয়াছিল। সেই চুরি কি ধরা পড়িয়াছে ? সে কোনো কথাই বলিতে পারিল না। ভয়কাতর দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করিয়া মুখুয্যের দিকে তাকাইয়া রহিল।

মুখুয্যে বলিল—ভায়া, শুনেছ কি তোমার ব্রাহ্মণীর আঁতুড় হচ্ছে দোতালার ওপর বিপিন-বাবুর শোবার ঘরে ?

শিবচরণ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। যাক্‌ তবে টাকা চুরির কথা নয়।

কিন্তু আঁতুড়ঘরে আবার বিপদ কি? কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া বলিল—হ্যাঁ শুন্‌ছিলাম বটে আজ ঐরকম কি একটা কথা হয়েছে।

—হঠাৎ তোমার ব্রাহ্মণীর ওপর বিপিন-বাবুর এত মমতা কেন হল কিছু বুঝতে পার্‌ছ কি? যদি জাত ধর্ম্ম বাঁচাতে চাও ত পালাও বৌকে নিয়ে দেশে। আজই রাজাবাবুকে গিয়ে বলোগে, গিন্নিরাণীকে গিয়ে কেঁদে ধরোগে, নইলে সর্ব্বনাশ!

মুখুয্যের কথায় শঙ্কিত হইয়া শিবচরণ বলিল—এ যে ভরা দশমাস, কেমন কোরে যাব?

মুখুয্যে একটু চিন্তা করিয়া বলিল—আচ্ছা, নাইবা গেলে, কিন্তু কর্ত্তাকে আর গিন্নিকে গিয়ে বলোগে বিপিনের ঘরে কিছুতেই ছেলে হতে পারে না; আর তোমার ব্রাহ্মণীকেও শিখিয়ে দিয়ো, সে যেন কিছুতেই রাজি না হয়।...যাও এখুনি যাও একবার কর্ত্তার কাছে, সেখানে এখন কেউ নেই।

নিবারণ শিবচরণকে টানিয়া লইয়া গিয়া সিঁড়িতে ঠেলিয়া তুলিয়া দিল। শিবচরণ ইতস্তত করিতে করিতে উপরে উঠিয়া গেল দেখিয়া নিবারণ গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

শিবচরণ গিয়া দেখিল হরিবিহারী খাইতে অন্দরে যাইবার জন্য উঠিয়াছেন, দুইহাতে কোমরে কাপড়ের খুঁট গুঁজিতে গুঁজিতে চটির মধ্যে পা দিতেছেন। শিবচরণ ডাকিল—পিশেমশায়!

হরিবিহারী বলিলেন—কেন রে?

শিবচরণ ভয়ে-ভয়ে আম্‌তা-আম্‌তা করিতে করিতে বলিতে লাগিল—বিপিন তার ঘরে আঁতুর কর্‌বে বল্‌ছে। সে কি রকম কোরে হবে?

—যা যা সে আমি ঠিক কোরে দেবো। যেখানে চিরকাল আঁতুড় হয়ে আসছে সেখানেই হবে।

শিবচরণের আর কোনো কথা জোগাইল না। সে আস্তে আস্তে নামিয়া গেল।

হরিবিহারী অন্দরে যাইতেছেন। পশ্চাতে রামধন গুড়গুড়ি ও পানের ডিবা লইয়া আসিতেছে। তোষাখানা ও অনন্দের মধ্যপথে জয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে ধীরস্বরে ডাকিল—শোনো!

হরিবিহারী হাসিয়া কাছে গিয়া বলিল—কে জয়ী! কিরে? অনেক কাল পরে আজ দেখা! কিছু বল্বি?

—আমি আর তোমার বাড়ীতে থাক্‌তে পার্‌ব না। আমায় কাশী পাঠিয়ে দাও। বিপিন উঠতে বস্‌তে আমায় অপমান কর্‌ছে, টিট্‌কারি দিচ্ছে। আমি এবাড়ীতে আর এক দিনও থাক্‌তে পার্‌ব না।

—যা যা পাগ্‌লি, আর কাশী যেতে হবে না। আমি বিপিনকে শাসন কোরে দেবো।

তারপর একটি দৃষ্টিতে অনেকখানি অতীত ইতিহাসের ছায়া ফেলিয়া উভয়ে সরিয়া গেল।

বারংবার বিপিনের নামে নালিশ শুনিতে শুনিতে বিরক্তমনে হরিবিহারী অন্দরে আসিয়া শয়নকক্ষে পালঙ্কের উপর বসিলেন। গিন্নি আসিয়া একপাশে বসিলেন। হরিবিহারী বলিলেন—বিপিন নাকি মেয়েদের পাঠশালা কর্‌ছে, দোতলায় আঁতুড় কর্‌ছে?

গিন্নি মুখ ভার করিয়া বলিলেন—হঁ্যা! বিপিন এবার কল্‌কেতা থেকে এসে অবধি কেমন উদাস-উদাস, সদাই অন্যমনস্ক হয়ে থাকে। যেমন খিটখিটে তেম্‌নি একগুঁয়ে হয়েছে, নিত্যি নতুন খেয়াল নিয়েই আছে। তারপর ঐ যে ঘরজ্বালানি ছুঁড়ি মালতী এসেছে, ঐটে এসে অবধি ত বাড়ীতে একদিনের তরে শাস্তি নেই। একবার নবকিশোরকে নিয়ে কত কাণ্ডটাই কর্‌লে! এখন আবার বিপিনকে পেয়ে বসেছে!

সোমত্থ সব ছেলে, বিয়ে থা হয়নি, এতে ওদের মন চঞ্চল হতেই ত পারে। কিন্তু তুই বিধবা মানুষ, তোর কি অমন পুরুষ-ঘঁ্যাসা হওয়া উচিত ?

হরিবিহারী স্তিমিতনেত্রে চিবাইয়া চিবাইয়া বলিলেন—তা ঝাড়ে মূলে সব দূর কোরে দিলেই ত সব ল্যাঠা চুকে যায়।

—বাপরে! তা কি বিপিনের প্রাণে সইবে? তার ত খুড়িমা-অন্ত প্রাণ! তারপর ত আজকাল খুড়িমার খুঁটির জোর হয়েছে, বোনঝি অম্‌নি বিপিনের চোখে চোখে ফির্‌ছে।

—আচ্ছা, আমি বিপিনকে দিয়েই ওদের তাড়াব।

—কিন্তু বিপিনের একটি বিয়ে দেওয়া দর্‌কার হয়েছে। ঘেটের কোলে অতবড়টি হয়েছে, আর বিয়ে না হলে কি ভালো দেখায়?

—হুঁ! আচ্ছা কালই আমি সব ঠিক কোরে ফেল্‌ব। ঝিনুকপোঁতার জমিদার হরিশ-চাটুয্যে তার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে আমায় চিঠি লিখেছে।

হরিবিহারীর স্বভাব যেমন একদিকে বিষম নিষ্ক্রিয় ছিল, অন্য দিকে আবার তেমনি একবার উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিলে বিলম্ব করিতে জানিত না। বিপিনের বিয়ে দেওয়া দর্‌কার, তা কালই ঠিক হইয়া যাইবে—হরিশ-চাটুয্যের মেয়ে প্রস্তুত আছে।

গিন্নি উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—তা হলে ত বেশ হয়!

২৪

প্রাতঃকালে বিপিন লাইব্রেরীতে বসিয়া পড়িতেছে। গিন্নি আসিয়া ডাকিলেন—বিপিন!

বিপিন তাড়াতাড়ি বই রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—কেন মা?

গিন্নি হাসিয়া বলিলেন—সকাল বেলাই তোকে একটা সুখবর দিতে এসেছি। তোর বিয়ের সম্বন্ধ কর্‌ছি। আজকে উনি সব পাকা কোরে চিঠি লিখবেন।

বিপিন চিন্তিত হইয়া বলিল—কোথায় মা এ শুভকর্ম্ম স্থির কর্‌চ? খুকিটি এসে বিনির খেলুড়ে হতে পার্‌বে ত?

না না, তোর সকল তাতেই ঠাট্টা! তুই যেটের কোলে ডাগরটি হয়েছিস, তোর সঙ্গে কচি মেয়ের বিয়ে দেবো কেন? এ বেশ ডাগর সোমত্থ মেয়ে। ঝিনুকপোঁতার জমিদার হরিশ-বাবুর মেয়ে! ওরা নিজেরাই যখন লিখেছে বয়েস ন বছর, তখন দশ এগারো বচ্ছরের কম কিছুতেই হবে না!

বিপিন গম্ভীরভাবে বলিল—উঃ! তবে ত অরক্ষণীয়া হয়ে উঠেছে! কিন্তু মা আমার ত এখন বিবাহে তেমন আগ্রহ বোধ হচ্ছে না।

—আরে আগে শোনই সব কথা, তারপর আগ্রহ হয় কি না দেখব।......মেয়েটি বাপের একমাত্র সন্তান; যদি পুষ্যিপুত্ত্‌র না নেয় ত সব জমিদারী তোরই হবে; মেয়েটি রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী; বেশ বিদ্বান; বিদ্যেসাগরের কি বলে কথামালা না কি তাই পড়ে; তুই যেমনটি চাস ঠিক তেম্‌নি!

বিপিন হাসিতে হাসিতে বলিল—এত শুনেও ত বিশেষ আগ্রহ বোধ হচ্ছে না মা। তুমি বাবাকে বোলো আমি এখন বিয়ে কর্‌তে পার্‌ব না।

—তুই যে অবাক করলি বিপিন! সময়ে তোর বিয়ে হলে আজ যে তোর কাচ্চাবাচ্চায় ঘর ভোরে যেত! আমাদের কি তুই কোনো সাধ আহ্লাদ কর্‌তে দিবিনে? কি রকম কনে তুই চাস তাই বল্‌? তোদের এখন মস্ত ধাড়ি মেয়ে পছন্দ, কিন্তু আমাদের হিঁদুর ঘরে তা ত আর

পাওয়া যাবে না; ওরই মধ্যে দেখে শুনে একটু বড়সড় দেখে বিয়ে ত করতে হবে ?

বিপিন হাস্যমুখেই বলিল—বিয়েটা যে করতেই হবে এমন কি কথা আছে ? আমি ঐ প্যান্‌পেনে কচিখুকিদের কিছুতেই বিয়ে করব না।·········আর কাজ কি মা বিয়ে কোরে। আমরা মায়েপোয়ে বেশ আছি, ঝগ্‌ড়াঝাটি, আদর-আবদার করছি; এরমধ্যে আবার আর-একজন শরিক জোটানো কেন ? সেই অচেনা অজানা লোকটির মেজাজ মৎলব কেমন হবে তা ত বলা যায় না, শেষকালে কি আমাদের মাঝখানে দেয়াল তুলে দাঁড়াবে।

গিন্নি বিপিনের কথায় প্রীত হইয়া বলিলেন—তা ত বটে, কিন্তু তোর মন যদি খাঁটি থাকে তবে বৌ-বেটি যেমনই হোক না, আমাদের সে কি করতে পারবে ?

বিপিন হাসিয়া বলিল—কিন্তু তুমিই ত বলো মা, মন না মতি, যদি বিগ্‌ড়ে যায়।·········আমরা ত বেশ আছি মা, আর কোনো উৎপাত জুটিয়ো না।

—না না, তা কি হয়, যখনকার যা তখন সেটি নইলে মানাবে কেন ? মায়ের খোকা হয়েই কি চিরকাল থাকবি। তুই বিয়ে করতে চাস্‌নে, লোকে বলে—তাহা মা নেই, কে বা গা কোরে বিয়ের জোগাড় করবে ? মা যদি থাকত·········এসব কথা শুনলে কি আমার কষ্ট হয় না। তুই-ই বল্‌ত ত।

—এতে আর কষ্ট কি মা ? তুমিও জান যে তুমিই আমার মা, আমিও জানি যে তুমিই আমার মা। তবে যার যা খুসি বলুক না ?

—না না লোকনিন্দে বড় ভয়ানক, স্বয়ং রামচন্দ্র ভগবান হয়ে সতীলক্ষ্মী সতীকে ত্যাগ করেছিলেন।·········তুই এই বিয়েয় মত দে বাবা, লক্ষ্মীটি।

—না মা, সে কিছুতেই হতে পারবে না। তোমাদের যেখানে পছন্দ হবে আমার সেখানে হবে না, আর আমার যেখানে হবে তোমাদের সেখানে হবে না। তাই ত বলছিলাম যে এমন অশুভ বিয়ের কথাটা না তোলাই ভালো। সবাই ত বিয়ে করে, আমি না হয় নাই করলাম।

গিন্নি বড় সাধে বাধা পাইয়া বিরক্ত হইয়া—যা খুসি তাই কর; আমি তোর কোনো কথার মধ্যে যদি থাকি। বলব ওঁয়াকে, তিনি যা ভালো বোঝেন তা করবেন। বলিয়া উঠিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় পঞ্চা-খানসামা এক বস্তা সেমিজ ও বডিস্ আনিয়া উপস্থিত হইল।

গিন্নি বলিলেন—ওতে কি রে?

বিপিন বলিল—এই-সব সেমিজ তৈরি কোরে আনিয়েছি মা। এক-একজনের বারোটা কোরে; যতবার কাপড় ছাড়বে ততবার সেমিজও ছাড়বে; কাচা সেমিজ পরলে ত আর কোনো দোষ থাকবে না।

—এই-সব সেলাই-করা কাপড় পোরে ঠাকুর-দেবতার কাজ করবে? তুই কি সবাইকে মালতী পেয়েছিস নাকি? সেই শতেকখোয়ারি এসেই ত তোর মাথা বিগড়ে দিয়েছে। তুই কেন বিয়ে করতে চাচ্ছিসনে এখন আমি বুঝতে পারছি। যাই দিকিন্ একবার ছোট বৌয়ের কাছে; ঝাঁটা মেরে শতেকখোয়ারিদের বাড়ীর বার না কোরে ত আমি জল খাব না।

গিন্নি ক্রোধভরে উঠিলেন। বিপিন কাতর দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া কাতরকণ্ঠে বলিল—মা, আশ্রিত নিরাশ্রয়কে অপমান করায় পাপ হয়। তাদের যদি তুমি বাড়ী থেকে তাড়াও, তোমার অকল্যাণ হবে; তাদের সঙ্গে আমিও তোমার বাড়ী থেকে চোলে যাব।

গিন্নি চীৎকার করিয়া বলিলেন—কী? তুই আমাকে গাল দিলি—আমার পাপ হবে, আমার অকল্যাণ হবে! আমি তোর মা হলে কখনো এমন কথা মুখে আন্‌তে পার্‌তিস্‌নে!

এর উত্তরে বিপিন কোনো কথা বলিতে পারিল না। শুধু অশ্রু-বিগলিত নয়নে গিন্নির দিকে চাহিয়া করুণ স্বরে ডাকিল—মা!

গিন্নি সে আহ্বানের অর্থ বুঝিলেন না; বিপিনের অশ্রুম্লান মুখের দিকে ফিরিয়া দেখিলেন না। তিনি নিতান্ত বিরাগভরে চলিয়া গেলেন।

ভাবপ্রবণ ও আবেগশীল বিপিনের অভিমানী কোমল অন্তর মাতার তিরস্কারে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল, সে সোফার উপর মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে সকল তিরস্কার অগ্রাহ্য করিতে পারে, কিন্তু তার মাতা যে তার ভালোবাসা ও ভক্তির প্রতি সন্দেহের আঘাত দিয়া গেলেন ইহা মিথ্যা বলিয়াই সে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল।

কাঁদিতে কাঁদিতে তার মনে হইল মা এতক্ষণ হয় ত খুড়িমা ও মালতীকে না জানি কত লাঞ্ছনা করিতেছেন। বিপিন তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া খুড়িমার ঘরের উদ্দেশে ছুটিল।

বিপিন যাইবার পূর্ব্বেই গিন্নি গিয়া খুড়িমাকে তর্জ্জন করিয়া শুধু "ছোটবৌ, বোনঝিকে নিয়ে এ বাড়ীতে থাকা তোমার আর পোষাবে না। তোমরা আপনার আপনার জায়গা দেখ।"—বলিয়াই প্রস্থান করিয়াছেন। খুড়িমা কারণ জিজ্ঞাসা করিবারও অবসর পান নাই।

বিপিন যখন গেল তখন খুড়িমা ও মালতী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে। বিপিনকে দেখিয়া খুড়িমার দুই চোখ দিয়া জলধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। মালতীও নতমুখে অশ্রুদমন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বিপিনেরও সদ্যসংরুদ্ধ অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া বাহির হইবার জন্য তার মনের মধ্যে জড়ো হইয়া আকুলিবিকুলি করিতে লাগিল।

সকলেই নির্বাক। পরের গলগ্রহ যারা তাদের বিদায় হইবার আদেশ হইয়াছে, এতে কারো বিরুদ্ধে অভিযোগের ত কিছু নাই। সুতরাং খুড়িমার বিপিনকে বলিবার কিছু ছিল না। মা কি বলিয়াছেন, না বলিয়াছেন, তাহা না জানিয়া বিপিনেরও কিছু বলা শক্ত ঠেকিতেছিল। বিপিন অনেক কষ্টে অশ্রুরোধ করিয়া বলিল—খুড়িমা, মা কি কিছু বোলে গেলেন ?

—হাঁ বাবা, আমাদের অন্যত্র যেতে বোলে গেলেন···আমরা কাশী যাব বাবা, শুনেছি মা অন্নপূর্ণার রাজ্যে কারো অন্নের অভাব হয় না।

এবার আর বিপিনের চোখের জল বাধা মানিল না, গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। বিপিন তাড়াতাড়ি রুমালে চোখ মুছিয়া বলিল—খুড়িমা, তুমি ঢের সয়েছ, আরও একমাস আমার জন্যে সহ্য করো। এই একমাসে হয় তোমার জমিদারী তোমায় আমি ফিরিয়ে দেওয়াব, নয়ত তোমাদের সঙ্গে আমিও এ বাড়ী ছেড়ে বেরুব।

খুড়িমা অশ্রু মুছিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন—ছি বাবা, আমার জন্যে তুমি বাপ-মার সঙ্গে কোনো রকম বিরোধ কর্‌লে আমি সুখী হব না। লক্ষ্মী বাবা আমার, বাপ-মাকে তুমি অসুখী কোরো না। আমার জন্যে তুমি ঢের করেছ! ভগবান এই হতভাগীর ওপর বিরূপ! তাকে রক্ষা কর্‌তে গিয়ে বাপ-মার অসন্তোষ ডেকে এনো না; আমার জন্যে তোমার এতটুকু অকল্যাণ হলে আমার বুকে শেলের মতন বাজবে যে বাবা।

বিপিন এবার দৃঢ়স্বরে বলিল—এ ত তোমার জন্যে কিছু নয় খুড়িমা, ধর্ম্মের জন্যে আমি এ কর্‌ছি। এতে কাউকে দুঃখ সইতে হয় সইতে হবে! তুমি আর একটি মাস চুপ কোরে থাক; তারপর দর্‌কার হয় আমিই তোমায় কাশীতে নিয়ে যাব। লেখাপড়া শিখেছি খুড়িমা, তোমাদের দুজনকে রোজগার কোরে খাওয়াতে পারব, সে ভরসা আছে।

বাবা যে পাপ করেছেন তার প্রায়শ্চিত্ত আমাকে কর্‌তেই হবে ; বাবাকে আমি কখনো ঋণী রাখ্‌তে পার্‌ব না।

খুড়িমার চিত্ত স্নেহরসে আর্দ্র হইয়া উঠিল। তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভগবানের কাছে বিপিনের কল্যাণ প্রার্থনা করিলেন। কোনো কথা তাঁর মুখ হইতে নিঃসৃত হইল না।

বিপিনের বীরের মতো দৃঢ়তা ও নারীর মতো কোমলতা দেখিয়া মালতীরও অন্তর প্রীতিসরস কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মালতী স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া নীরব ভাষায় বিপিনকে অভিনন্দন করিল।

২৫

গিন্নি কর্তাকে পুত্রের প্রতিকূলতার সংবাদ দিবার জন্য যখন অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া ঘর আর বাহির করিতেছেন এবং কর্তাকে খাইতে আসিবার জন্য তাগাদা করিয়া ডাকিতে যখন লোকের উপর লোক পাঠাইতেছেন, ঠিক তখনই বিপিনের আনন্দচঞ্চল চটিজুতার ফটর ফটর শব্দ তাঁর কানে গেল। বিপিন ডাকিল—মা!

গিন্নি কোনো উত্তর না দিয়া মুখখানি তোলো হাঁড়ির মতো ফুলাইয়া জানালার পারে পুকুরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিপিন ঘরে আসিয়া মাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইল। গিন্নি বিরক্ত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিতেই বিপিন হাসিতে হাসিতে বলিল—মা, আমি পাশ হয়েছি। খুব ভালো পাশ হয়েছি।

গিন্নির মনের মেঘ তৎক্ষণাৎ কাটিয়া গেল। মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অভিমানের উপর মাতৃত্ব প্রবল হইয়া উঠিল। পুত্রের সকল অনাচার আতিশয্য তিনি ভুলিয়া গেলেন, উদ্যত অভিযোগ শান্ত হইয়া গেল, চারিদিক আবার প্রশান্ত প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিল। তিনি চীৎকার করিয়া

বলিল—ওলো ও ক্ষ্যামা, সকলকে ডেকে বল্ আমার বিপিন পাশ হয়েছে। রোহিণী, রোহিণী, দুবেজিকে দশ টাকার বাতাসা আর পচিশ টাকার নাড়ু আনিয়ে দিতে বল্; ঠাকুরের ভোগ দিয়ে হরির লুট হবে। ওলো ও হাবার মা, ঠাকুরঘরে গিয়ে গোবর্দ্ধনকে বল্‌গে যেন চোলে না যায়···আজকে ঠাকুরের ডবল ভোগ দিতে হবে।

বাড়ীময় আনন্দ-কলরবের হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সবাই চেঁচায়, সবাই সবাইকে খবর দেয়, সবাই একটা-না-একটা ফর্‌মাস করে।

বিপিন হাসিতে হাসিতে বলিল—মা, গোবরা পূজো কর্‌লে আমার কল্যাণ না হয়ে অকল্যাণই হবে।

—চুপ চুপ! অমন কথা বল্‌তে আছে! বেরাম্ভন!···

—অমন ব্রাহ্মণের চেয়ে অট্‌লামুচি ঢের ভালো মা। গোবরা আবার ব্রাহ্মণ!

—চুপ চুপ! শুন্‌তে পেলে ওর মনে কষ্ট হবে। আজকে আনন্দের দিনে কারো মনে কষ্ট দিতে নেই।

—তবে মা, আজকে বাবাকে বলো ভট্‌চায্যি-জ্যাঠা এসে পূজো করুন; খুড়িমাকে ঠাকুরঘরের ভার ফিরিয়ে দাও। উৎসব যদি করতে হয়, এম্‌নি কোরে প্রসন্ন আশীর্ব্বাদ দিয়ে উৎসব আরম্ভ হোক। সকল দিককার কালি ধুয়ে মুছে দাও।

গিন্নি বলিলেন—ওরে কে আছিস্ যা ত ছোট-বৌকে ডেকে আন্ ত। মালতীকেও ডেকে আনিস্।

বিপিন বলিল—খুড়িমাকে আমি ডেকে আন্‌চি মা!

বিপিন খুড়িমাকে ডাকিতে গেল। কিন্তু খুড়িমা বিপিনের পাশের সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া আপনিই ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সকলের আনন্দের মধ্যে নিজেরও একটু স্থান করিয়া লইবার

সঙ্কোচকুণ্ঠিত চেষ্টা করিতেছিলেন। বিপিন ঘরে গিয়া দেখিল, মালতী একাকিনী মেঝেতে আঁচল বিছাইয়া শুইয়া আছে। তখন তার অবগুণ্ঠন নাই, বেশবাস শ্লথ, দীর্ঘ কেশরাশি মেঝের উপর লুণ্ঠিত। এই অনাবরণ সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ লজ্জিত বিপিন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। মালতী তাড়াতাড়ি উঠিয়া আপনাকে সম্বৃত করিল।

এক মুহূর্ত্ত উভয়েই নীরব। লজ্জিত স্মিত হাস্যে মালতীর দিকে চাহিয়া বিপিন বলিল—খুড়িমা কোথায়?

মালতী চকিতে একবার বিপিনের দিকে অপাঙ্গে চাহিয়া নতমুখে ধীরস্বরে বলিল—ঐদিকে গেছেন।

—আমি পাশ হয়েছি।

—শুনেছি।

বিপিন বলিল—মা তোমাকে ডাকছেন, তুমি এস।

মালতী স্মিতপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া বলিল—আপনি চলুন, আমি যাচ্ছি।

বিপিন আনন্দাতিশয্যে বিহ্বল হইয়া ঘর হইতে বিদায় লইতে ইতস্তত করিতেছে, এমন সময় নবকিশোর ঝড়ের মতন ঘরে প্রবেশ করিয়া বজ্রকণ্ঠে বলিল—বিপিন, বিপিন, শুনেছ, কি অত্যাচার হয়ে গেছে!

নবকিশোরের রোষঘূর্ণিত চক্ষু, বিস্ফারিত নাসা, উদ্ধত ভাব দেখিয়া মালতী ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া রহিল; বিপিনের মুখ শুকাইয়া গেল। বিপিন শুষ্ক ওষ্ঠ জিহ্বা দ্বারা ভিজাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েছে?

নবকিশোর তেম্‌নি আকাশভেদী রবে বলিল—তোমার কাকা, কাকা!...নিবারণ-মুখুয্যের কথা শুনে কালীতারাকে পথে তাড়িয়ে দিয়েছে!

বিপিন স্তম্ভিত নির্ব্বাক। নবকিশোর তেম্‌নিভাবেই বলিতে লাগিল—

ভাবছ কি? তোমার জ্ঞাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে করতে হবে। কালীতারার প্রসববেদনা হয়েছে শুনে নিবারণ-মুখুয্যে গিয়ে মেজবাবুকে বললে—'ওকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে না দিলে তোমাকে আমরা একঘরে করব।' আর মেজবাবুও অমনি সুবোধ শিশুর মতন সেই অসহায়কে দ্বারোয়ান দিয়ে বাড়ী থেকে দূর কোরে দিলেন। এই-সব ধর্ম্ম! এঁরা সব সমাজপতি! ধন্য তোমাদের নিবারণের ভয়, যে, সে অন্যায় করতে বললেও প্রতিবাদ করবার শক্তি কারো নেই। নাও, বিলম্ব করবার সময় নেই, তুমি কালীতারাকে খুঁজে নিয়ে এস, নিজের বাড়ীতে আনতে সাহস না হয় আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যেয়ো। আমাকে এখুনি নবিনগরে যেতে হচ্ছে, সেখানকার পুলিশ-দারোগা স্বদেশী পাঠশালায় রাজদ্রোহ শিক্ষা দেওয়া হয়, বোমা তৈরি করা হয় বোলে পাঠশালা থেকে আসমতকে ধোরে নিয়ে গেছে। গাঁয়ের লোকেরা ভয়ে পাঠশালায় ছেলে পাঠানো বন্ধ করেছে; আমায় একবার সেখানে এখনই যেতে হচ্ছে। কালীতারার ভার তোমার ওপর, দেখো যেন কর্ত্তব্য অবহেলা কোরো না।

নবকিশোর বিপিনের হাত ধরিয়া বেগে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। মালতী স্তম্ভিত নির্ব্বাক একাকী দাঁড়াইয়া রহিল।

মালতী কিছুক্ষণ পরে বাহির হইয়া আসিয়া দেখিল, বাড়ীময় একটা কি যেন অমঙ্গল-আশঙ্কার ছায়া পড়িয়াছে। সকলেরই মুখ বিষণ্ণ, দৃষ্টি চকিত, বাক্য স্তব্ধ। আনন্দ-উৎসবের সূত্রপাতেই সমস্ত পণ্ড হইয়া গেল। রাঁধুনি রাঁধিতে রাঁধিতে রান্না নামাইয়া বসিয়া আছে; যে তরকারি কুটিতেছিল সে বঁটি কাত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে; জয়া পূজার জোগাড় করিতে করিতে চন্দনমাখা হাতেই দৌড়িয়া আসিয়া গিন্নিকে বলিতেছে—বৌ বৌ, গোবর্দ্ধন ত পূজো করতে করতে কিশোরের

মুখে বাপের নাম শুনেই দৌড় দিয়েছে, ঠাকুর টাটের ওপর বসানোই আছেন! পূজো কর্বার, ভোগ দেবার কি হবে?

গিন্নি শুনিয়াও কাঠের মতন শক্ত হইয়া নিরুপায়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সমস্ত লোকের প্রাণচেষ্টা যেন মন্ত্রপ্রভাবে সংরুদ্ধ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে!

বিনিও আজ অনর্গল বকিতেছে না; সে একলাটি এককোণে পা ছড়াইয়া বসিয়া তার রং-ওঠা গা-ফাটা কাঠের পুতুলটিকে আস্তে আস্তে চাপড়াইয়া ঘুম পাড়াইতেছে, কিন্তু ঘুমপাড়ানিয়া গান আজ মুখে সরিতেছে না।

বিনোদও আজ অকারণে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে লাফাইয়া বেড়াইতেছে না। সেও বিনির কাছে চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

মালতী আসিয়া বিনিকে কোলে করিল। বিনি তার গলা জড়াইয়া চুপিচুপি বলিল—মাতী দিদি, তুপ তুপ, দাদাথাকুল আগ কলেছে, মালবে।

মালতী বিনোদের হাত ধরিয়া তুলিয়া মৃদুস্বরে বলিল—চলো তোমরা আমার ঘরে, আমরা খেলা করিগে।

বিনি জোর করিয়া মালতীর গলা জড়াইয়া তাকে গমনে বাধা দিয়া বলিল—না না, মাতী দিদি, আবাল দাদাঠাকুল আছবে।

মালতী তাদের লইয়া সেইখানেই বসিল। গিন্নি অর্থহীন উদাস দৃষ্টিতে তাদের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

২৬

বিপিন কালীতারার সন্ধানে যাইতে যাইতে শুনিল কালীতারাকে কাল সন্ধ্যার পর তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন বেলা প্রায় বারোটা। এই দুঃসহ শীতজর্জ্জর পৌষরাত্রি সেই আসন্নপ্রসবা অনাথা না জানি

কোথায় কাটাইয়াছে। কাল হইতে অনাহারে না জানি সে কোথায় পড়িয়া আছে। কোমলপ্রাণ বিপিনের হৃদয় করুণায় লজ্জায় ঘৃণায় ক্রোধে ছাপাইয়া উঠিল; তার চক্ষু দিয়া দরদর ধারে জল পড়িতে লাগিল।

তার ইচ্ছা হইতে লাগিল তার খুড়াকে গিয়া দশ কথা শুনাইয়া দিয়া আসে; নিবারণ-মুখুয্যের মাথাটাকে দুই হাতের মধ্যে চাপিয়া গুড়া করিয়া ফেলে। কিন্তু সময় নাই সময় নাই! আগে সেই হতভাগিনীকে অনুসন্ধান করিতে হইবে। নিষ্ঠুর সব লোক! একসঙ্গে দুটি প্রাণীকে হত্যা করিতে মমতা হইল না!

জমিদারের ছেলে বিপিন অস্নাত অভুক্ত দুপ্রহরের রৌদ্র মাথায় বহিয়া পথে পথে সেই অভাগিনীকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে যে সমাজের কাছে নিন্দিতা, যে সমাজের ত্যজনীয়া।

বিপিনকে ব্যাকুলভাবে পথে পথে পর্য্যটন করিতে দেখিয়া তার সহিত অনেক লোক জুটিয়া গেল; চাকর পেয়াদা পাইক বরকন্দাজ চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কিন্তু কেউই কোনো সন্ধান পাইল না।

রাত্রে আসন্নপ্রসবা কালীতারাকে একবস্ত্রা অবস্থায় দূর করিয়া দিলে সে আপনার মাতৃত্ব-সম্ভাবনার গুরু বেদনায় কাতর ও ভীত হইয়া বাবুদের মঠবাড়ীতে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। সেখানকার দ্বারোয়ান প্রভাতে উঠিয়া কালীতারাকে মঠবাড়ীর মন্দিরচত্বরে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাকে অতি রূঢ়ভাবে সেখান হইতে দূর করিয়া দ্যায়: বেচারার এতে কোনো দোষ নাই, সে মনে করিয়াছিল যাকে তার মনিবেরা গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে, তাকে তাদেরই মঠবাড়ীতে থাকিতে দেওয়া তার পক্ষে নিতান্ত গর্হিত কার্য্য হইবে। কিন্তু এখন

বিপিনকে এমন ব্যাকুলভাবে অন্বেষণ করিতে দেখিয়া সে বুঝিল যে সে সেই অসহায়াকে মৃত্যুর মুখে তাড়াইয়া দিয়া অন্যায় করিয়াছে। ভয়ে ও পরিতাপে তার মুখ শুকাইয়া গেল। বিপিন কিছুমাত্র সংবাদ না পাইয়া এই দুপ্রহর রৌদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ইহা দেখিয়া সে যতটুকু জানে তাহা বলিতে তার ইচ্ছা হইতেছিল; আবার নিজের অমানুষ ব্যবহারের জবাবদিহি বিপিনের কাছে কি বলিয়া করিবে তাহা ভাবিয়া না পাইয়া বলিতেও তার সাহস হইতেছিল না।

অনেকক্ষণ নিজের দ্বিধার সঙ্গে তর্ক করিয়া সে স্থির করিল যে, সে যাহা জানে তাহা অকপটে স্বীকার করিবে।

ভগবানদীন সুকুল জনতা ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া বিপিনকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। বিপিন অন্যমনস্ক উদাসভাবে যন্ত্রচালিতের মতো তাকে প্রতিনমস্কার করিল, কিন্তু আজ স্বাভাবিক মধুর হাস্যে তার কুশল জিজ্ঞাসা করিল না।

ভগবান হাতজোড় করিয়া বলিল—হুজুর, আমার একটা কসুর হয়েছে······

বিপিন জিজ্ঞাসু নীরব দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চাহিল।

ভগবান বলিতে লাগিল—কাল রাতে কালীতারা মঠবাড়ীতে কখন ঢুকে মন্দিরের চাতালে শুয়ে ছিল; পাছে মঠ অশুচি হয়ে যায়, কি আপনারা রাগ করেন, এই ভেবে আমি তাকে ভোর বেলা তাড়িয়ে দিয়েছি······এখন দেখ্‌ছি আমি ভারি অন্যায় করেছি······

বিপিন ঔৎসুক্যে উত্তেজিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুমি দেখেছিলে কি সে কোন্ দিকে গিছল ?···

—সে ঐ আম-বাগানের ভিতর দিয়ে ঐ বনের দিকে গিছল মনে হয়।

বিপিন ব্যগ্রভাবে—যাও যাও কেউ একখানা পাল্কী নিয়ে এসগে।—বলিয়া আম-বাগানের ভিতর দিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

শেঁয়াফুলের বনে কাপড় জড়াইয়া যাইতে লাগিল, বেতের বন নত হইয়া দুলিয়া দুলিয়া তার জামা আটকাইয়া ধরিতে লাগিল······বিপিনের ভ্রূক্ষেপ নাই; কাপড় জামা ছিঁড়িয়া গেল, পায়ে কাঁটা ফুটিল, গায়ে বিছুটি লাগিল, সংজ্ঞা নাই। এই বনের মধ্যেই কালীতারা আছে কি না কেউ নিশ্চয় জানে না, তবু অনুসন্ধানের বিরাম নাই।

অকস্মাৎ বিপিনের অনুচরবর্গ চীৎকার করিয়া উঠিল—আছে আছে আছে এইখানে আছে।

বিপিন ঝোপ ঝাড় ডিঙাইয়া অগ্রসর হইয়া দেখিল বনের মধ্যে একটু পরিষ্কার শষ্পাবৃত স্থানে একটি গাছের ছায়ায় রক্তাপ্লুত অর্দ্ধমূর্চ্ছিত কালীতারা পড়িয়া আছে, আর তার বুকের কাছে রক্তচন্দনলিপ্ত প্রফুল্ল শতদলের মতো একটি শিশু রৌদ্রতাপে অবসন্ন হইয়া পড়িয়া আছে; স্থানটি ছোট বড় লাল কালো বিবিধ পিপীলিকায় ভরিয়া উঠিয়াছে—শৃগাল কুক্কুর শকুনির রক্তলোলুপ দৃষ্টি এখনো এখানে পড়ে নাই, তাই রক্ষা।

বিপিন তাড়াতাড়ি আপনার জামা খুলিয়া তাতেই শিশুটিকে জড়াইয়া বুকে তুলিয়া লইল। তাকে জামা খুলিয়া শিশুকে জড়াইতে দেখিয়া পেয়াদার পাগ্‌ড়ী পাইকের গাম্‌ছা বিপিনের সম্মুখে উপস্থাপিত হইতে লাগিল। বিপিন ভগবানকে ইঙ্গিত করিল, ভগবান আপনার পাগ্‌ড়ী দিয়া কালীতারাকে ঢাকিয়া দিল।

দেখিতে দেখিতে পাল্কী আসিয়া পৌছিল। বিপিন শিশুটিকে ভগবানের কোলে দিল; কোলের গরম ও নাড়া পাইয়া শিশুটি এতক্ষণে তারস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

বিপিন একবার শিশুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কালীতারার পাশে মাটিতে হাঁটু পাতিয়া বসিয়া ডাকিল—খুড়িমা।

এমন সম্মান ও করুণার সহিত কালীতারাকে কেউ কখনো ডাকে নাই। সে ক্ষীণস্বরে বলিল—কেন বাবা? তুমি কে?—তার চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

বিপিন বলিল—খুড়িমা, আমি বিপিন। পাল্কী এনেছি, বাড়ী চলো।

কালীতারা কষ্টে চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিল—বাড়ী?

—হাঁ খুড়িমা বাড়ী, আমার বাড়ীতে চলো।

—আর কেন বাবা, অল্পক্ষণ পরেই ত মরণ আমার সকল জ্বালা জুড়িয়ে দিত, তুমি কষ্ট কোরে কেন এসেছ বাবা? এ পোড়ামুখ আমি লোকালয়ে কেমন কোরে দেখাব?

বিপিন ভগবানের কোল হইতে শিশুটিকে লইয়া কালীতারাকে দেখাইয়া বলিল—খুড়িমা, এই নিরপরাধ অসহায়টির জন্যে তোমায় বাঁচ্‌তে হবে।

কালীতারার মাতৃহৃদয় সন্তানকে দেখিবামাত্র স্নেহে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে ব্যাকুল হইয়া বলিল—দাও বাবা দাও ওকে আমার বুকে। ও আমার বড় লজ্জার বড় দুঃখের বড় সুখের ধন।

বিপিন শিশুটিকে তার মাতৃবক্ষে শোয়াইয়া দিল। কালীতারা তাকে বুকের উপরে চাপিয়া ধরিয়া নিমীলিত নয়নে সুখাবেশের অলসভাবে জিজ্ঞাসা করিল—বাবা বিপিন, কি হয়েছে?

বিপিন বলিল—ছেলে হয়েছে খুড়িমা পদ্মফুলটির মতন সুন্দর।

কালীতারা নিমীলিত নয়নে অস্ফুটস্বরে আপন মনেই বলিতে লাগিল—তোকে আমি বধ করতে পারিনি বোলে আজ আমার এই লাঞ্ছনা।

হতভাগা, এসেছিস্ যদি ত হতভাগিনীর কোল শূন্য কোরে পালাস্ নে। তোর জন্যেই আমি বাঁচব, সকল লজ্জা, সকল নিন্দা, সকল গ্লানি মাথায় কোরে নিয়ে বাঁচব!

এই স্নেহকরুণ দৃশ্য দেখিয়া বিপিনের চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। সে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—খুড়িমা, ওঠ, চলো বাড়ী যাই।

বিপিনের ইঙ্গিতে পাল্কী কালীতারার পাশে রাখা হইল। কালীতারা উঠিতে চেষ্টা করিয়া পারিল না, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। বিপিন তাড়াতাড়ি শিশুটিকে তুলিয়া একজন চাকরের হাতে দিল এবং চার পাঁচজনে ধরাধরি করিয়া মূর্চ্ছিতা কালীতারাকে পাল্কীতে তুলিল। পাল্কী ছুটিয়া চলিল, বিপিনও সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতেছে। গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়া বিপিন বলিল—ভগবানদীন, ডাক্তারবাবুকে খবর দাও, তাঁকে বড় তরফের অন্দরে নিয়ে এস।

গ্রামের পথ লোকে লোকারণ্য। স্ত্রীপুরুষ ছেলে বুড়ো কেউই আজ ঘরে নাই; পথে পথে পুরুষেরা জনতা করিয়া কোলাহল করিতেছে, অন্তঃপুরিকারা দরজার ফাঁকে ফাঁকে চোখ দিয়া কৌতূহলী দৃষ্টি পথে পাঠাইতেছে। কেউ বিপিনের প্রশংসা করিতেছে, কেউ নিন্দা করিতেছে, কেউ উভয়ই করিতেছে; ফলে তর্কের অন্ত নাই, বিতণ্ডার বিরাম নাই।

নিবারণ ও গোবর্দ্ধনের মন কৌতূহলে ছটফট করিতেছিল, কিন্তু সাহস করিয়া তারা পথে বাহির হইতে পারে নাই, কি জানি যদি বিপিন বা নবকিশোরের সম্মুখে পড়িয়া যায়; তারাও কপাটের আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া রঙ্গ দেখিতেছিল।

বিপিনকে তাদের বাড়ীর দিকে তাকাইতে দেখিয়া নিবারণ

তাড়াতাড়ি দরজার কপাট বন্ধ করিয়া দিল, কিন্তু তখন বিপিনের কোনো দিকে লক্ষ্য ছিল না, মনে অন্য কোনো চিন্তা ছিল না।

পাল্কী অন্দরের দেউড়ীতে উপস্থিত হইতেই দ্বারবান দুবেজী অগ্রসর হইয়া জোড় হাত করিয়া বলিল—হুজুর, মহারাজ কিসিকে ভিতর লিয়ে যাতে মানা করিয়েসেন। হামাকে হুকুম দিয়েসেন রোক্‌তে, আপনাকে বোল্‌তে।

বিপিন বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া বলিল—তুমি মহারাজকে গিয়ে বলগে যে ছোটবাবু মানা শুন্‌লেন না।

তারপর সকল অনুচরের দিকে ফিরিয়া বিপিন দেখিল তারা মহারাজের অসম্মতি বুঝিতে পারিয়া সেখান হইতে পলায়ন করিবার উপক্রম করিতেছে। বিপিন চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া উগ্রভাবে হুকুমের স্বরে বলিল—ধরো তোমরা, একে ওপরে নিয়ে যেতে হবে।

তখন সকলে ভয়ে ভয়ে শুষ্ক মুখে আসিয়া ধরিল। বিপিন পঞ্চা খান্‌সামাকে সম্মুখে দেখিয়া বলিল—পঞ্চাদা, যা যা দৌড়ে আমার বিছানা থেকে একখানা তোষক তুলি নিয়ে আয়।

পঞ্চা তোষক আনিয়া বিছাইয়া দিল। বিপিন ও অন্যান্য সকলে ধরাধরি করিয়া শিশু ও মাতাকে পাল্কী হইতে বাহির করিল, এবং তোষকের উপর শোয়াইয়া সকলে সন্তর্পণে ধরিয়া কালীতারাকে অন্দরে লইয়া চলিল।

অন্দরে সকলে পুত্তলিকার মতন আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া আছে। আজ ঠাকুরের পূজা হয় নাই, ভোগ হয় নাই, রান্না হয় নাই, কারো খাওয়া হয় নাই। শিশুগুলি ক্ষুধায় নেতাইয়া পড়িয়াছে, কেউ কেউ বা মাটিতেই শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। যেন এ রূপকথার রাক্ষসপুরী, সমস্ত উপকরণ সজ্জিত আছে, নাই শুধু কারো প্রাণ! এখানে কৈ সে সোনার

কাঠি যার স্পর্শে এই প্রাণহীন পুরীর জীবনলীলা জাগ্রত হইয়া উঠিতে পারিবে ?

বিপিনকে উঠানে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই গিন্নি বলিলেন—বিপিন বিপিন, করিস্ কি ? তোর কি আক্কেল বল্ দেখি, কোথাকার পাপ কোথায় এনে জোটাচ্ছিস্ ? উনি শুনে ভারি রাগ কচ্ছিলেন···কথা শোন্ ও বিপিন, বিপিন,···যা খুসি কর্‌গে যা, ভালো বিপদেই পড়েছি বাপু !···ওরে ওরে ওকে ও কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস ? ওপরে ! ওমা কি ঘেন্নার কথা ! ঐ নোংরা কাপড়-চোপড় নিয়ে ওকে তোরা ওপরে তুল্‌ছিস্। রাম রাম ! জাত ধর্ম্ম আর রইল না।···ওরে ওরে ও রোহিণী, যা যা ওঁকে বল্‌গে যা, শিগ্‌গির যা, দৌড়ে যা, বিপিনের কাণ্ডখানা একবার দেখুন এসে······

বিপিন কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কালীতারাকে একেবারে নিজের শয়নকক্ষে লইয়া গেল। তখন ক্রমশ বাড়ীর সকলে একে একে আসিয়া দ্বারপ্রান্তে ভিড় করিতে লাগিল। বিপিন দেরাজ খুলিয়া একটা এনামেলের গামলা, স্পঞ্জ, তোয়ালে বাহির করিল। তারপর ষ্টোভ জ্বালিয়া নিজেই একটা কেটলি হাতে করিয়া জল আনিতে বাহির হইল—সে সকলের প্রতি এমন বিরক্ত হইয়াছিল যে কাকেও কোনো সাহায্য করিতে বলিতে তার প্রবৃত্তি হইতেছিল না। তাকে কেটলি হাতে করিয়া যাইতে দেখিয়া পঞ্চা কেটলি কাড়িয়া লইয়া জল আনিয়া গরম করিতে দিল।

বিপিন পঞ্চাকে বলিল—পঞ্চাদা, তোর দেখ্‌ছি আমার ওপর একটু দয়া আছে।···জল খানিকটা গরম কোরে এই গাম্‌লায় দে, আর খানিকটা চা কোরে ফেল্। আর খানিকটে দুধ গরম কর্···বাড়ীতে দুধ না দেয়, কাউকে পাঠিয়ে দে, গোয়াল-বাড়ী থেকে শিগগির কিনে

আন্‌বে,···বাড়ীর দুধ দেবে না-ই বা কেন, না দেয় আমি জোর কোরে নেব।

বিপিনের অভিমানী অথচ একগুঁয়ে তেজস্বী মন একবার অভিমানে সকলকে ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে কাজ করিবার জন্য উৎসুক হইতেছিল, আবার পরক্ষণেই সকলকে দমন করিয়া নিজে জয়ী হইবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিতেছিল। বিপিন দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিল ক্ষমা মোক্ষদা জয়া পাঁচুর মা প্রভৃতি সকলে ঘরের মধ্যে উঁকি মারিবার জন্য পরস্পরকে ঠেলাঠেলি করিতেছে অথচ বিপিনের ভয়ে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। বিপিন তীব্র কণ্ঠে বলিল—ক্ষমা, উটের মতন গলা বাড়িয়ে কি উঁকিঝুঁকি মার্‌ছিস। অত কৌতূহল হয়ে থাকে ঘরের মধ্যে আয়, এসে সেবা কর্। ··মোক্ষদা, যা খানিকটে দুধ গরম কোরে চট কোরে নিয়ে আয়।

মোক্ষদা সেথান হইতে পলায়ন করিবার সুবিধা পাইয়া তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল। কিন্তু আর সকলে না পারিতেছিল পলায়ন করিতে, আর না পারিতেছিল বিপিনের আহ্বান স্বীকার করিতে; তারা বিবর্ণ মুখে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়াই রহিল।

পঞ্চা গরম জল গাম্‌লায় ঢালিয়া দিল। তখন বিপিন বলিল—এঁকে পরিষ্কার কর্‌ব কি আমরা পুরুষেরাই? স্ত্রীলোকের লজ্জা এতগুলি স্ত্রীলোক তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে?

সকলে আড়ষ্ট; কেউ একটু নড়িলও না; তখন সকলের পশ্চাৎ হইতে মালতী অগ্রসর হইয়া আসিয়া বিপিনকে বলিল—আপনারা বাইরে যান, আমি সব কর্‌ছি।

বিপিন সপ্রশংস স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে মালতীর মুখের দিকে চাহিল, দেখিল এই বিষম বিক্ষেপের মধ্যেও তার মুখ স্থির গম্ভীর, সে প্রবীণার মতো

আত্মস্থ। বিপিন তাড়াতাড়ি ট্রাঙ্ক খুলিয়া নিজের নূতন পুরাতন কতকগুলা কাপড় বাহির করিয়া ফ্যাশ ফ্যাশ করিয়া ছিঁড়িয়া একটা ব্যাণ্ডেজ তৈরি করিল। কাঁচি, সেফ্‌টি পিন, সূঁচসূতা, সাবান প্রভৃতি গুছাইয়া দিয়া সে পঞ্চাকে ডাকিয়া লইয়া বাহির হইয়া আসিল। মালতী ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

বিপিন বলিল—পঞ্চাদা, দেখ একবার ডাক্তার এল কি না।

গিন্নি বলিলেন—পোড়া কপাল! আর ডাক্তার ডাক্‌তে হবে না; অমন লোকের মরাই ভালো!

জয়া বলিল—হ্যাঁ, তা ত বটেই, মলেই ওর লজ্জা ঢাকে।

বিপিন শুধু একবার জয়ার দিকে চাহিল, কাকেও কিছু বলিল না। আজ তর্ক করিবার মতো মনের অবস্থা তার ছিল না। অল্পক্ষণ পরেই ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া পঞ্চা আসিল। তখন সকল অন্তঃপুরিকা অন্তরালে সরিয়া গেল! বিপিন ডাকিল,—মালতী, হয়েছে? ডাক্তারবাবু এসেছেন।

মালতী ঘর হইতে বলিল—এই হল বোলে। জ্ঞান হয়েছে। আপনি একবার ঘরে আসুন, বিছানাটা বদ্‌লে দিতে হবে।

বিপিন ও ডাক্তার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল মালতী মাতা ও শিশু উভয়কেই ধোয়াইয়া মুছাইয়া পরিষ্কার কাপড় পরাইয়া ফিট‌ফাট করিয়া ফেলিয়াছে, ময়লা কাপড়-চোপড় পাশে জড়ো করা আছে।

বিপিন, ডাক্তার, পঞ্চা ও মালতী ধরাধরি করিয়া কালীতারাকে নূতন একটি বিছানায় শোয়াইয়া দিল। বিপিন বলিল—পঞ্চাদা, দেখ দেখ দুধ।

পঞ্চা দুধ আনিতে গেল, ডাক্তার রোগী পরীক্ষায় নিযুক্ত হইল।

ডাক্তার দেখিয়া শুনিয়া বলিল—রোগী বড় দুর্ব্বল। একে খুব কোরে তাপ দিন, আর অল্প অল্প কোরে খেতে দিন। এই ওষুধটা আনিয়ে ঘণ্টা অন্তর চার দাগ পর্য্যন্ত দেবেন। সন্ধ্যার সময় আমায় আর-একবার খবর দেবেন।

ডাক্তার বিদায় লইয়া বাহিরে আসিয়া ইঙ্গিত করিয়া বিপিনকে ডাকিল। বিপিন বাহিরে আসিলে ডাক্তার চুপিচুপি বলিল—বড় খারাপ অবস্থা। মনের উদ্বেগ, শীত, অনাহার, রক্তহানি সমস্ত মিলে ওঁর সমস্ত দেহযন্ত্রটাকে ভেঙে চুরে দিয়েছে—সন্ধ্যা পর্য্যন্ত টিকবেন কিনা সন্দেহ। শিগগির ওষুধটা আনিয়ে খাইয়ে দিন। সন্ধ্যার সময় আমায় আবার খবর দেবেন।

বিপিন ডাক্তারের সঙ্গে পঞ্চাকে ঔষধ আনিতে পাঠাইল, এবং যাইবার সময় বলিয়া দিল—পঞ্চাদা, দুবেজীকে বোলে যাস্ বিদেশিয়ার বৌকে ডেকে দেবে, এই ময়লা কাপড়-চোপড়গুলো নিয়ে এখানটা সাফ কোরে দেবে।

বিপিন মালতীকে বলিল—তুমি ওঁকে একটু একটু কোরে দুধ খাওয়াও। আমি আগুন নিয়ে আসি।

বিপিন বাহির হইয়া দেখিল হাবার মা দাঁড়াইয়া আছে। তাকে বলিল—হাবার মা, যা দৌড়ে লোহার আঙঠায় কোরে রান্নাঘর থেকে আগুন নিয়ে আয়, আর রামধনকে গিয়ে বল্ আমার এইখানে কতকগুলো কয়লা কি গুল আনিয়ে দেবে।

গিন্নি আসিয়া বলিলেন—বিপিন, নাওয়া খাওয়া করবি, না সমস্ত দিন এই নিয়েই মেতে থাকবি? লোকদের খেতেটেতে দিবি?

বিপিন নরম সুরে বলিল—তোমরা খাওগে মা, আমার এখন খাবার অবসর নেই।

—তুই খাবিনে আর আমরা খেয়ে বোসে থাক্‌ব, কারো পেটে ত তেমন আগুন ধরেনি। খেয়ে এসে যা হয় করিস্। আয়, আয়!

—না মা, একজন লোক অনাহারে অযত্নে মর্‌ছে, আর আমি তাকে ফেলে খেতে যাব, তোমার ছেলেকে এমন পাষণ্ড ভেবো না মা।

মালতী ধীরস্বরে বলিল—এখন আমি ত আছি। আপনি খেয়ে আসুন।

বিপিন প্রতিবাদের স্বরে বলিল—না না, খাবার সময় ঢের পাব, সেবার ত্রুটি হলে যে প্রাণটি যাবে তা আর ফিরে পাওয়া যাবে না।

হাবার মা আগুন আনিয়া দূর হইতে কাপড়-চোপড় গুটাইয়া চৌকাঠের বাহির হইতে আড়ষ্ট হইয়া ঝুঁকিয়া আল্‌গোছে আগুনের আঙঠা ঘরের মধ্যে ধপাস করিয়া রাখিয়া দিল। বিপিন আগুন সরাইয়া দিল, মালতী তাপ দিতে লাগিল।

আহার ও তাপ পাইয়া কালীতারা একটু সুস্থ বোধ করিল। তখন তার মনে হইতে লাগিল সকলকার দৃষ্টি যেন তার বুকের ভিতরকার লুকানো লজ্জা উদ্‌ঘাটন করিয়া করিয়া বড় নির্ম্মম উপহাসের সঙ্গে দেখিতেছে। তার মুখ দিয়া কোনো বাক্য নিঃসৃত হইতেছিল না।

পঞ্চা ঔষধ আনিয়া দিল, বিদেশিয়ার বৌ আসিয়া ঘর পরিষ্কার করিয়া ফেনাইল দিয়া ধুইয়া দিয়া গেল। রামধন এক কেনেস্তারা গুল আনিয়া রাখিল। পঞ্চা আগুন করিতে বসিল। চারিদিকে শৃঙ্খলা দেখিয়া বিপিনের সরল মন আবার প্রসন্নতায় ভরিয়া আসিতেছিল। এমন সময় হরিবিহারীর খড়মের শব্দ শোনা গেল। হরিবিহারী ডাকিলেন—বিপিন!

বিপিন বাহিরে গিয়া বলিল—আজ্ঞে।

হরিবিহারী ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—এসব কি? ওদের দূর কোরে দাও।

বিপিন ধীর ভাবেই বলিল—বোধহয় দূর করতে হবে না; আপনিই দূর হবে।

—না, না, আমার বাড়ীতে ও-সব মরাটরার হাঙ্গামা চল্‌বে না।

বিপিনের ইচ্ছা হইল বলে—আপনারা তা হলে মর্‌বেন কোথায়?—কিন্তু সে-ইচ্ছা দমন করিয়া সে বলিল—এ অবস্থায় ওঁকে কোথায় নিয়ে যাব?

—রাস্তায় ফেলে দিয়ে এস। তোমার যেমন আক্কেল! পরের বোঝা নিজের ঘাড়ে তুলে আন্‌লে।

—পরের বোঝা ত ঠিক নয়, আমার খুড়োমশায়ের ছেলে, তাকে রক্ষা করতে আমি লোকত ধর্ম্মত বাধ্য।

হরিবিহারী বিরক্তির স্বরে বলিলেন—এঁঃ লোকত ধর্ম্মত বাধ্য!··· দুপাতা ইংরিজি পোড়ে ভারি তর্কবাগীশ হয়েছ দেখ্‌ছি?···না না, আমার বাড়ীতে ওসব খাট্‌বে না।

বিপিন ধীরভাবে বলিল—এ বাড়ীতে আমার যেটুকু অধিকার আছে, সেইটুকুতেই খাটবে।

—এঁ-এ? আমি থাক্‌তে তোমার আবার অধিকার কি? তুমি কথা না শোনো, আমি ওদের দ্বারোয়ান দিয়ে বার কোরে দেবো।

বিপিন স্তব্ধ হইয়া পিতার মুখের দিকে তাকাইয়া অবাক হইয়া রহিল। অবশেষে বলিল—আজকের রাতটা থাক্‌তে দিন। কাল ওঁর মৃত-দেহের সঙ্গে আমিও আপনার বাড়ী ছেড়ে যাব। আর যদি ভালো থাকেন তবুও আমি ওঁকে নিয়ে অন্য কোথাও যাব। আজ রাত্রে আমাদের তাড়াবেন না।

বিপিনের চোখ দিয়া জল ঝরিতে লাগিল। এইসব দেখিয়া শুনিয়া হরিবিহারী দমিয়া গেলেন। থতমত খাইয়া বলিলেন—তো-তো-

তোমাকে কে কি বল্লে যে তুমি কাঁদ্‌ছ?···যা খুসি তোমাদের করো, আমি—আমি আর পারিনে।

হরিবিহারী খড়মের চটপট শব্দ তুলিয়া প্রস্থান করিলেন। গিন্নি বড় আশা করিয়াছিলেন যে হরিবিহারী আসিলেই এইসব অনাসৃষ্টি অনাচারের একটা সুমীমাংসা হইয়া যাইবে। কিন্তু যুদ্ধপ্রারম্ভেই তাঁর যোদ্ধাকে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে দেখিয়া গিন্নি হতাশ হইয়া সেইখানে বসিয়া পড়িলেন।

বিপিন ঘরের মধ্যে গিয়া কালীতারার মুখের কাছে ঝুঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—খুড়িমা, কেমন আছ? কেমন বোধ হচ্ছে?

কালীতারার চোখের কোণ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। চক্ষু ঈষৎ উন্মীলন করিয়া বলিল—আমার আর থাকাথাকি কি বাবা? আমার সময় হয়ে আস্‌ছে। খোকাকে আমার বুকের ওপর দাও।

মালতী খোকাকে তার বুকের উপর শোয়াইয়া দিল। কালীতারা —আঃ বলিয়া একদণ্ড চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পুত্রস্পর্শ অনুভব করিতে লাগিল। তারপর চোখ মেলিয়া মালতীর দিকে চাহিয়া বলিল—তুমি কে মা জানিনে। যেই হও তুমি, তুমি আরজন্মে আমার মা ছিলে।···বাবা বিপিন, তুমি আমার খোকাকে দেখো; ওর মায়ের পাপে নিষ্পাপ ও যেন কষ্ট না পায়।

বিপিন চোক মুছিতে মুছিতে বলিল—খুড়িমা, তোমার ছেলে তুমি দেখ্‌বে। অমন কথা বল্‌ছ কেন?

কালীতারার চক্ষু বিস্ফারিত, মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে বলিল—উঃ বুকের মধ্যে যে কী করছে! নিশ্বাস যে বন্ধ হয়ে আস্‌ছে!

বিপিন তাড়াতাড়ি এক দাগ ঔষধ ঢালিয়া কালীতারাকে খাওয়াইল। তখন সে আবার একটু চুপ করিল। বিপিন বলিল—পঞ্চাদা, যা, ডাক্তারকে ডেকে আন্!

কালীতারা তৈলহীন প্রদীপের মতো ক্রমশই নিষ্প্রভ হইয়া পড়িতে লাগিল। আস্তে আস্তে তার চোখ মুদ্রিত হইয়া আসিল, দেহ একবার হঠাৎ স্পন্দিত হইয়া উঠিল, তারপর নিশ্বাস বন্ধ হইয়া গেল।

মালতী তাড়াতাড়ি খোকাকে কালীতারার বুক হইতে নিজের বুকে তুলিয়া লইল। তার অশ্রুধারা গণ্ড বহিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। বিপিনও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—ভগবান!

বিপিন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

২৭

কিছুক্ষণ পরে শিশুটি কাঁদিয়া উঠিল। তখন বিপিনের চমক ভাঙিল। অশ্রু মুছিয়া সে সকল পুরস্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিল—এই অসহায় জীবটির মা ত ওকে ছেড়ে গেল। এখন তোমাদের মধ্যে কে দয়ালু আছ কে ওর মা হবে?

সকলে নিস্তব্ধ। নিশ্বাস পর্যান্ত যেন কেহ ফেলিতেছে না। বিপিন আবার বলিল—বলো বলো, কে এই অনাথ শিশুর ভার নিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করবে?

তখন গিন্নি বলিলেন—কে আবার ঐ ল্যাঠা সাধে সুখে ঘাড়ে করতে যাবে? ওকে বষ্টমদের আখ্‌ড়ায় পাঠিয়ে দেবো এখন।

বিপিন একটু বেদনামিশ্র অভিমান ও তিরস্কারের স্বরে বলিল—মা, এমন নিষ্ঠুর কথা বলা তোমার সাজে না। আমার মা যেদিন মরেছিলেন সেদিন ত মা তুমিই আমাকে বুকে তুলে নিয়েছিলে, বষ্টমদের আখ্‌ড়ায় ত পাঠাওনি!

বিপিনের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। গিন্নিও আহত হইয়া বলিলেন—ষাট ষাট! শোনো একবার পাগ্‌লামি কথা! তোকে কোন্ দুঃখে

বষ্টমদের আখ্ড়ায় দিতে যাব? তুই যে আমাদের বংশের দুলাল! বড় দুঃখের প্রথম ছেলে! তোতে আর এতে সমান হল?

—তফাৎ বড় বেশী নয় মা। এ আমার খুড়োর ছেলে। তোমরা কেউ না স্বীকার করো, আমি স্বীকার করব এ আমার ভাই; আমার শরীরে যে-বংশের রক্ত, এর শরীরেও তাই। আমি ওকে কিছুতেই ত্যাগ করতে পারব না। ওর মা মৃত্যুকালে আমার হাতে ওকে দিয়ে গেছেন। আমার প্রাণ দিয়েও ওকে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু আমার প্রাণ দিলেও ত ওর মায়ের অভাব আমি পূর্ণ করতে পারব না। কে তোমরা দয়া করবে বলো?

আবার সকলে নিস্তব্ধ। বিপিন একে একে সকলের মুখের দিকে চাহিল; তার দৃষ্টির সম্মুখে কারো দৃষ্টি অসঙ্কোচে স্থির থাকিতে পারিল না; কেউই স্বীকৃত হইল না। তখন বিপিন ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল—এখানে কি তবে এমন একজনও নেই, যার হৃদয় এই অসহায় নিরপরাধকে আপনার স্নেহ দিয়ে রক্ষা করতে পারে? আমাকে কি শেষে মাইনে করা দাসীর সাহায্য নিতে হবে?

তখন মালতী ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া বিপিনের দিকে চাহিল। সে-দৃষ্টিতে স্নেহ যেন রক্ষিত হইতেছিল, করুণা যেন মাখানো ছিল, অভয় উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পাইতেছিল; কিন্তু তারই সঙ্গে সে-দৃষ্টিতে কি সঙ্কোচ, কি বিনয়, কি আত্মবিলোপের চেষ্টা! সেখানে করুণার আগ্রহ আছে, বাহাদুরী লইবার ব্যগ্রতা নাই। বিপিনের মন আশ্বস্ত হইয়া উঠিল। সে আশাভরে মালতীর দিকে চাহিয়া রহিল।

মালতী একবার সকলের দিকে চকিতে চাহিয়া লইল; দেখিল কারো মুখে কিছু বলিবার মতো ব্যগ্রতা নাই। তখন সে নতমুখে ধীরস্বরে

বলিতে লাগিল—আমি এ-কে মানুষ কর্‌ব। কিন্তু দুধের সংস্থান ত আমার নেই, সে ভার আপনাকে নিতে হবে।

বিপিন উৎসাহিত হইয়া বলিল—তার জন্যে ভাব্‌না কি? সে আমি ঠিক বন্দোবস্ত করে দেবো। আজ থেকে তবে এ শিশু তোমার।

মালতী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল—হইল ভালো, যেমন সকলের ঘৃণিত আমি, আমার সম্বলও জুটিল তেমনি সকলের ঘৃণিত এই শিশু।

মালতীর মনের এই ভাব আলোচনাব্যগ্রা পুরস্ত্রীদের মনেও সংক্রমিত হইল। তারা এই বিষয় লইয়া কতবিধ আন্দোলন কতবিধ শ্লেষ ও বিদ্রূপ করিতে লাগিল।

শিশুর বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া বিপিন শব-সংকারের জন্য ব্যস্ত হইল। কে এই শব লইয়া যাইবে? এই পতিতার শব কোনো সুব্রাহ্মণ স্পর্শ করিবে কিনা সন্দেহ। হায় হায়! এমন দিনে আজ নবকিশোর গ্রামে নাই! সে থাকিলে তারা দুজনেই সংকার করিয়া আসিতে পারিত।

বিপিন পঞ্চাকে বলিল—পঞ্চাদা, যা ত দেউড়িতে আর ঠাকুর-বাড়ীতে; সবাইকে বল্‌গে শ্মশানে যেতে হবে। কাউকে ডাকিস্‌নে, যে আপনি আস্‌বে, আস্‌বে। আর একবার ভট্‌চায্যি জ্যাঠামশায়কে খবর দিস্ গিয়ে।

পঞ্চা চলিয়া গেল। বিপিন সেই শব আগ্‌লাইয়া বসিয়া আছে। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। এখনো তার স্নানাহার হয় নাই, বাড়ীরও কেউ তার জন্য খাইতে পায় নাই। বিপিনের অনাসৃষ্টি কাণ্ডের জন্য সকলেই তার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সব চেয়ে অসন্তোষ মালতীর উপর। বিপিনের প্রিয় হইবার জন্যই যে সবাইকে টেক্কা দিয়া

মালতী বিপিনের গায়ে পড়িয়া সকল কাজ করিতেছে এ বিষয়ে কারো বিন্দু-মাত্র সন্দেহ নাই। সকলেই ঢের ঢের মেয়ে দেখিয়াছে, কিন্তু এমন পুরু-ষের গায়ে-পড়া মেয়ে তারা বাপের জন্মেও দেখে নাই।

ঘর অন্ধকার হইয়া আসিল। গিন্নি বলিলেন—জয়া-ঠাকুরঝি, সন্ধে জ্বালোগে, একে ত ঠাকুর আজ উপুষী আছেন, আবার বাড়ীতে সন্ধ্যে উৎরে যাবে···চারিদিকেই ত অলক্ষণ। যে অবধি মালতী অলক্ষী বাড়ীতে পা দিয়েছে সে অবধি সংসার যেন পুড়ে-ঝুড়ে যাচ্ছে।

বিপিন অনুযোগের স্বরে বলিল—মা!

গিন্নি বলিলেন—আমি অমন কারো মুখ চেয়ে কথা বল্‌তে জানিনে; সত্যি কথা বল্‌ব, তার আবার ঢাকঢাক-গুড়গুড় কি? যা ক্ষমা, মোক্ষদা যা, ঘরে ঘরে সন্ধ্যে দেখিয়ে চৌকাঠে জল দিগে। শাঁক বাজাস্‌নে যেন, বাড়ীতে মড়া রয়েছে। ভালো আপদ বাপু, বাড়ীতে এক মড়া আগ্‌লে বোসে থাকা। কোথাকার ঝঞ্ঝাট কোথায় এসে পড়ল দেখদেখি!

জয়া, ক্ষমা, মোক্ষদা, পাঁচুর মা উঠিয়া গেল। পাঁচুর মাকে যাইতে দেখিয়া গিন্নি বলিলেন—বৌমা, একটা কুটো ভেঙ্গে খোঁপায় গুঁজে রাখগে; পোয়াতি-মানুষ তুমি, সাবধানে থেকো। মড়া নিয়ে যাবার সময় তুমি দেখোনা যেন। তুমি ঠাকুরঘরে বোসে থাকগে; একলাটি থাক্‌তে ভয় করে ত মোক্ষদাকে বোলো কাছে বস্‌বে।

একটু অগ্রসর হইয়াই জয়া বলিল—দেখ্‌লি তোরা মালতীর কাণ্ডখানা! কি গায়ে-পড়া মেয়ে রে বাবা! বিপিনের যারপরনাই মা রয়েছে, আমরাও ত মায়েরই মতন, আমরা রয়েছি, ঐ ওর নিজের খুড়ি রয়েছে, কেউ কি আর আমরা ঐ কচিছেলের ভার নিতাম না! একটা প্রাণী যত্ন-আবাদে মারা যাবে এই কি কেউ চক্ষে দেখ্‌তে পারত! কিন্তু ওঁর আর তর সইল

না। অমনি টপ কোরে বল্‌লেন—আমি ছেলে নেব। ভ্যালা রে আমার দরদী! তবু যদি এক পয়সার মুরোদ থাক্‌ত! মার চেয়ে যে দরদী তাকে বলে ডান!

ক্ষমা বলিল—সত্যি বাপু, মালতীর সবই বাড়াবাড়ি। কি কোরে বিপিনদার সঙ্গে যে কথা কইবে সেই ছুতো খুঁজে ছোঁকছোঁক কোরে বেড়ায়।

মোক্ষদা বলিল—ওটা বয়সের দোষ লো বয়সের দোষ!

পাঁচুর মা বলিল—মরণ আর কি! বয়স ত আর কারো ছিল না, রূপসী বিশ্বেধরীরই শুধু বয়েস হয়েছে! আমাদেরও অম্‌নি এককালে বয়সও ছিল, রূপও ছিল। পাঁচু হয়ে অবধি আমার হর্‌তেলের মতন রং একেবারে কালো ঝুল হয়ে গেছে, তোরা ত তা দেখেছিস্‌ ঠাকুরঝি। কিন্তু আমরা কত রূপের গরব কোরে বেড়াচ্ছি। উনি রূপের ঠ্যাকারে আর বাঁচেন না।

মোক্ষদা বলিল—তা যাই বলো বৌ, মালতী সুন্দরী বটে!

ক্ষমা বলিল—ছাই সুন্দরী, চোখ দুটো ড্যাবা-ড্যাবা, নাকটা তিন হাত! ওর চেয়ে কালোতে আমাদের ছিরি আছে।

জয়া বলিল—সর্ব্ব দোষ হরেৎ গোরা—শাস্ত্রেই বলেছে। কটা চাম্‌ড়া দেখেই লোকে ভুলে যায়।

মালতীর শ্রাদ্ধ করিতে করিতে প্রদীপ জ্বালা হইল। জয়া বলিল—যা ত মা ক্ষেমা, সব ঘরগুলোতে সন্ধ্যে দেখিয়ে আয়, আর মোক্ষদা চৌকাঠ-গুলোয় একটু জল দিয়ে আয়।

—না বাপু, আমরা এক্‌লা যেতে পার্‌ব না। বাড়ীতে মড়া পোড়ে রয়েছে, গা কেমন ছমছম কর্‌ছে। তুমিও সঙ্গে এস জয়া মাসি।

তখন চারজনেই রাম রাম বলিতে বলিতে সকল ঘরে প্রদীপ দিতে দিতে আবার বিপিনের ঘরে ফিরিয়া আসিল।

গিন্নি প্রদীপের আলোক দেখিয়াই এক হাতের আঙুলের ফাঁকে উল্টা দিক হইতে অপর হাতের আঙুল শৃঙ্খলিত করিয়া কপালে বারবার ঠেকাইয়া ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন এবং উচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন—দুর্গা দুর্গা! হরিবোল হরিবোল! রাম রাম! রাম রাম!

মোক্ষদা চৌকাঠে জল দিতে যাইতেছিল। গিন্নি বলিলেন—হাঁ হাঁ হাঁ—করিস্ কি? এ চৌকাঠে জল দিস্‌নে মড়া বেরিয়ে গেলে গোবরজল ছড়া দিতে হবে। তেশূন্যে ঘরের মধ্যে মাগী মর্‌ল। ও রকম লোকের ত এম্‌নি মরণই হয়·····ওদের কি আর সদ্গতি হয়! তেশূন্যে মোরে তেশূন্যে ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াবে!

বিপিন বলিল—মা! মানুষ থাক্‌বে ঘরে, মর্‌বে কোথায় গিয়ে, ভাগাড়ে?

গিন্নি বিপিনের সঙ্গে তর্কে সুবিধা করিতে পারিবেন না বুঝিয়া চুপ করিয়া থাকিলেন।

এমন সময় পঞ্চা আসিয়া বলিল—কেউ মড়া ফেল্‌তে আস্‌তে চায় না; সবাই বলে জাত গেছে যার তার মড়া ফেল্‌লে আমাদেরও জাত যাবে। শুধু ভগবান সুকুল আর মহীপত তেওয়ারি এসেছে। ভট্‌চায্যিমশায় পরে আস্‌ছেন।

পশ্চাৎ হইতে ভট্টাচার্য্য-মহাশয় বলিলেন—আমি এসেছি বাবা বিপিন! শব-সৎকারের কি হচ্ছে?

—লোক পাওয়া যাচ্ছে না জ্যাঠামশায়!

গিন্নি বলিলেন—বষ্টমদের আখ্‌ড়ায় খবর দিলেই ত লোক পাওয়া

যাবে। মাল্‌সা-ভোগ দিয়ে তাদের একটা মচ্ছব দিতে হবে···তা খরচ হবে বোলে আর কি করা যাবে। নিজের দরজার ময়লা নিজেকেই ত সাফ কর্‌তে হবে।

বিপিন উত্তেজিত হইয়া বলিল—না, সে কখ্‌খনো হবে না। বষ্টম-ফষ্টমকে ছুঁতে দেবো না।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—কেন বাবা, এতে তোমার আপত্তি কি? শবেরও কি ছুত-বিচার আছে?

—তা নেই জ্যাঠামশায়, কিন্তু এটা যে শবের প্রতি অপমান! এ ত আমি কিছুতেই হতে দিতে পারিনে। এঁকে অপমান কর্‌বার অধিকার কারো নেই। আমি কিছুতেই স্বীকার কর্‌বো না যে ইনি কোনো পাপ করেছিলেন। সন্তানকে রক্ষা কর্‌বার জন্যে কী মনের বলের পরিচয় দিয়েছেন! নিজের প্রাণ দিলেন, তবু অজাত সন্তানের প্রাণ নষ্ট কর্‌তে কিছুতেই স্বীকার হন নি।···পঞ্চাদা, ডাক্‌ তেওয়ারিদের, আমরা তিন জনেই কোনো রকম কোরে সংকার কোরে আস্‌তে পার্‌ব!

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—চলো বাবা, আমি চতুর্থ হব।

—না না, আপনি বুড়ো-মানুষ, আপনার বড় কষ্ট হবে। আমরা তিন জনেই পার্‌ব।

ভট্টাচার্য্য হাসিয়া বলিলেন—আমার কষ্ট হবে কি না সে কথা তোমার চেয়ে আমিই ভালো বুঝি বাবা।···আর এই মহীপত তেওয়ারিটিকে ত আমার চেয়ে নবীন বোধ হচ্ছে না।

বিপিন মহীপতের শুভ্র শ্মশ্রু ও লোল শুভ্র চর্ম্মের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল।

তখন চারজন ধরাধরি করিয়া কালীতারার মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া চলিল। কিন্তু তার চিরবিদায়ের সময় কেউ একবার বিলাপ করিয়া

কাঁদিল না, কারো হৃদয়ে একটু বেদনা বোধ হইল না। শুধু মালতী লুকাইয়া একবার চোখ মুছিয়া শিশুটিকে বুকে চাপিয়া ধরিল, আর খুড়িমা শক্ত হইয়া বসিয়া জপ করিতে লাগিলেন—হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

২৮

বিপিনেরা শব লইয়া বাড়ীর বাহির হইতে-না-হইতে শব বহনের জন্য অসংখ্য লোক আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। গ্রামের জমিদারের ছেলেকে শব বহন করিতে দেখিয়া কারোই উৎকট ধর্ম্মভাব প্রবল হইয়া বাধা দিতে পারিল না। শব-সৎকার বেশ সমারোহের সঙ্গেই হইয়া গেল।

এদিকে অন্দর-মহল হইতে শব বাহির হইয়া গেলে গিন্নি বলিলেন—নে নে রোহিণী, তোতে আর হাবার মাতে মিলে সব পরিষ্কার করে নে।

রোহিণী নাক সিঁটকাইয়া মুখ ঘুরাইয়া বলিল—আমি এই শীতকালে রাত্রে নাইতে-টাইতে পার্‌ব না। হাবার মা পারে করুক।

হাবার মা বলিল—মুইও সে পার্‌ব নি, মোর জাড় কোরে জ্বর এসেছে।

গিন্নি ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন—তোরা কেউ পার্‌বিনে, তবে কি আমি করব?

মালতী বলিল—বড় মাসিমা, আমি সব পরিষ্কার কোরে দিচ্ছি।

গিন্নি তার কথার কোনো উত্তর দিলেন না। মালতী তৎপরতার সহিত সর্ব্বত্র ঝাঁট দিয়া ধুইয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

গিন্নি বলিলেন—ওগো ও মেম-সাহেব! গোবর দিলে কৈ? লক্ষ্মী-চরিত্তিরে আছে—

লক্ষ্মীর বাস আম্‌লকিতে, শঙ্খে, পদ্মে, গোবরে;
আর লক্ষ্মী বিরাজ করেন সাদা ধপধপ কাপড়ে!

তোমরা ত শাস্তর-টাস্তর কিছু মানো না; কিন্তু আমরা ত তোমার মতন মেম্ হইনি……

মালতী অপ্রস্তুত হইয়া তাড়াতাড়ি গোবর আনিয়া গোবরজল ছড়া দিতে লাগিল।

তখন গিন্নি বলিলেন—তুমি ঐ ছেলে নিয়ে কোথায় থাক্‌বে গো? বিপিন যা বল্‌লে তাই কি কর্‌লে? শোবার ঘরখানা আঁতুড়ঘর কর্‌লেই?

মালতী বলিল—এ ঘর যখন আঁতুড়ঘর হয়েছে তখন আমি এই ঘরেই থাক্‌ব।

—বিপিন তাহলে থাক্‌বে কোথায়?

মালতী হাসিয়া বলিল—তা তিনিই জানেন।

মালতীর হাসি দেখিয়া গিন্নির গা জ্বলিয়া গেল। তিনি তীব্রস্বরে বলিলেন—তোমাকে আগ্‌লাবে কে? ছোট বৌ?

খুড়িমা অমনি রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন—হ্যাঃ! ছোট বৌয়ের ত আর কাজ কর্ম্ম নেই যে আঁতুড় আগলাতে যাবে? আমার পূজো আহ্নিক আছে, আমি ত আর আঁতুড় নিয়ে জয়জয়কার কর্‌তে পার্‌ব না।

মালতী বুঝিল সমস্যা জটিল। তাকে কেউ আগলাইবে না, অথচ এক্‌লা থাকিলেও কুৎসার অন্ত থাকিবে না। এই কথা মনে হইতেই তার তেজস্বী মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে বলিল—আমি এখানে এক্‌লাই থাক্‌ব।

সকলে অবাক্ হইয়া এই সাহসিকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রোহিণী বলিল—তা থাক্‌লেই বা, ভয় কি, দাদাবাবু ত ঐ পাশের ঘরেই থাক্‌বে।

জয়া রোহিণীর দিকে চাহিয়া হাসিল। তারপর সকলেরই চোখে চোখে হাসি খেলিয়া গেল।

মালতী সমস্তই বুঝিল এবং বুঝিল বলিয়াই দিব্য নিশ্চিন্ত ও স্বাভাবিক-ভাবে শিশুটির শয়ন ও আহারের ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

মালতীকে এইরূপে লোকাপবাদের ভয় উপেক্ষা করিতে দেখিয়া গিন্নি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁর আর বাক্য-নিঃসরণ হইল না। খুড়িমা তাড়াতাড়ি মালতীকে ঢাকা দিবার জন্য বলিলেন—তা ওকে ত এই ঘরেই থাক্‌তে হবে, আঁতুড় নিয়ে আর কটা ঘর মজাবে। আমি না হয় ঐ পাশের ঘরে এই কদিন থাক্‌ব। আর দিদি, তুমি বোলে দিয়ো, দাসীদের মধ্যে কেউ একজন এই দালানে শোবে।

গিন্নি এ কথার কোনোই উত্তর না দিয়া বলিলেন—দেখিগে ঠাকুরের কি হচ্ছে! কাকে দিয়ে তাঁর গতিমুক্তি হবে তাও জানিনে।

এই কথা শুনিয়া মালতীর এমন হাসি আসিল যে সে হঠাৎ খোকার প্রতি অত্যন্ত মনোযোগ দিতে বাধ্য হইল। ঠাকুরের ভাবনা মানুষ ভাবিয়া অস্থির কে তাঁর গতিমুক্তি করিবে!

গিন্নি বলিলেন—যা রোহিণী, দুবেজীকে বল্‌গে ঠাকুরবাড়ীর হারাধন পূজুরীকে ডেকে দেবে। মুখুয্যেমশায় কি গোবর্দ্ধন এবাড়ীতে ত আর পা দেবে না। ছি ছি! আজকালকার যেমন সব ছেলেপুলে হয়েছে, বামুন-দেবতা মানে না, শাপমন্যির ভয় নেই!...ওলো হাবার মা, বার-দরজার কাছে একটা পূর্ণঘট, আগুন, লোহা, আর দুটি মটর-ডাল রেখে দিগে। আর বংশীকে বল্ দুটো নিমপাতা এনে দেবে; বিপিন এলে

ঐসব ছুঁয়ে তবে ঘরে উঠবে।…সে হয় ত ওসব মান্‌বেই না। তা মানুক আর না-মানুক যা লক্ষণ আমায় ত তা সব কর্‌তে হবে। যা যা, কখন্ সে হুপ কোরে এসে পড়্‌বে আবার।

সমস্ত দিনের বিষম বিক্ষেপের পর বাড়ীতে আবার শান্তি ফিরিয়া আসিল। ঠাকুরঘরে কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। উনন জ্বলিল। ছেলে-মেয়েগুলি আহার-নিদ্রার জন্য জননীদিগকে জড়াইয়া জড়াইয়া ধরিতে লাগিল। বিনি একবার সমস্ত দিনের পর মার কাছে যাইবার জন্য কাঁদিতে লাগিল। গিন্নি বলিলেন—থাম্, থাম্, আমি একবার সব দেখে শুনে আসি, বিপিনের খাবার, ঠাকুরের শেতল তৈরি টৈরি হল কি না!

জয়া বলিল—কচি মেয়ে ভরসন্ধ্যেবেলা মা ছেড়ে কি থাকে? তুমি একে একটু নেও, আমি ওদিকে দেখ্‌ছি।

জয়াকে যাইতে দেখিয়া খুড়িমা সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। গিন্নি বিনিকে কোলে লইয়া বলিলেন—আমার ত তোমায় কোলে কোরে নিয়ে বোসে থাক্‌লে চলবে না। চলো ঠাকুরঘরের দালানে গিয়ে বসিগে, সকল দিকই দেখ্‌তে শুনতে পাব।…মালতী, তুমি একলা থাক্‌তে পার্‌বে? এই আমরা ত সব কাছাকাছি থাক্‌ব।

আজ এই প্রথম একটুখানি সদয় ব্যবহার পাইয়া মালতী যেন কৃতার্থ হইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি বলিল—তা পার্‌ব মাসিমা।

তখন গিন্নি গিয়া ঠাকুরঘরের দালানে বসিলেন।

খানিকক্ষণ পরেই বিপিন ফিরিয়া আসিল। সে বরাবর চলিয়া আসিতেছিল। গিন্নি বলিলেন হাঁ হাঁ হাঁ…ঐখেনে একটু দাঁড়া। ঐ আগুন লোহা ছোঁ। একটা মটরের ডাল আর নিমপাতা দাঁতে কেটে ফেল্, তারপর আয়।

বিপিনের মন তখন এমন ক্লান্ত হইয়া ছিল যে সে বিনা প্রতিবাদে এই অনুষ্ঠান করিল।

গিন্নি বিপিনকে বলিলেন—বোস্ বোস্, এইখানে বোস্।

বিপিন মাতার গা ঘেসিয়া বসিয়া পড়িল।

গিন্নি পুত্রের চুলের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া বলিলেন—একি! মাথা যে একেবারে শপশপ করছে, ভালো কোরে মাথাও পুঁছিসনি বুঝি। রাত্তিরে ভিজে মাথায় থাকলে অসুখ করবে যে……

তিনি নিজের অঞ্চল দিয়া বিপিনেরর মাথা মুছিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিপিন বলিতে লাগিল—থাক্ থাক্ হয়েছে।—কিন্তু কে শুনে তার কথা। ঘসিয়া ঘসিয়া মাথা মুছিয়া গিন্নি বলিলেন—ছোট বৌ, বিপিনের জল-খাবারটা এনে দাও।

—এখন আর জল খাব না মা, একেবারেই খাব।

—একেবারেই খেতে পারবি কেন। সমস্ত দিন এই হটরানি, গলা শুকিয়ে কাট হয়ে আছে। একটু না-হয় সরবৎ খা।……ছোট বৌ, দেখ ত খাবার হল। হয়ে থাকে ত সব একসঙ্গেই এনে দাও, খেয়ে একটু শুক্ গিয়ে।…কোথায় শুবি?

—কেন, আমার ঘরে।

—ও ঘরে ত মালতী ছেলে নিয়ে আছে।

—আমি তাহলে লাইব্রেরী-ঘরে শোব।…এই কে আছিস্।

রোহিণী অগ্রসর হইয়া বলিল—কেন দাদাবাবু?

—যা, পঞ্চাদাকে বল্‌গে লাইব্রেরী-ঘরে বড় কৌচখানার ওপর আমার বিছানা কোরে দেবে।

গিন্নি বলিলেন—তুই ঐ রাইবেরালীর মধ্যে কেমন কোরে থাকবি? চারিদিকে বই ঠাসা—গুম্‌সো গুম্‌সো চাম্‌সে চাম্‌সে গন্ধে ঘুম হবে কেন?

—বেশ হবে। বইয়ের গন্ধ আমাদের কাছে চন্দনের গন্ধের মতন।

গিন্নি তাঁর একগুয়ে ছেলেটিকে ভালো করিয়াই চিনিতেন। তিনি আর কিছু বলিলেন না। বিপিন আহারে প্রবৃত্ত হইল।

আহার সমাপ্ত করিয়া বিপিন শয়ন করিতে চলিল। শয়নকক্ষের সম্মুখে গিয়া দেখিল একাকিনী মালতী বসিয়া আছে। বিপিন বলিল—এক্‌লা আছ মালতী ?

মালতী হাসিয়া বলিল—আর ত আমি এক্‌লা নই। ভগবান ত আমার সঙ্গী জুটিয়ে দিয়েছেন।

কল্যাণময়ী জননীর মতো শিশুটিকে কোলে ধরিয়া মালতী বসিয়া আছে, বিপিন মুগ্ধ নেত্রে তাই দেখিতে লাগিল।

বিপিন একদৃষ্টে তার দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া মালতী কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—রাত হয়েছে, আপনি শুতে যান।

বিপিন ধীরে ধীরে সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

২৯

কালীতারার খোকাকেও বাঁচাইয়া রাখা গেল না।

তার চিকিৎসা সেবা শুশ্রূষা ঔষধ পথ্য প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবার জন্য কয়েকদিন ধরিয়া বিপিনকে অষ্টপ্রহর মালতীর কাছেকাছেই থাকিতে হইতেছিল। খোকা মারা গেলে মালতী অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। বাড়ীতে কেউ তাকে একটি সান্ত্বনাবাক্য বলিবে না জানিয়া বিপিন মালতীর কাছেকাছে থাকিয়া বই জোগাইয়া গল্প করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতেছিল।

গিন্নি বিপিনের এইসব অনাসৃষ্টি কাণ্ড দেখিয়া একদিন হরিবিহারীকে বলিলেন—তুমি ত কিছু দেখবে শুন্‌বে না, বিপিন ত ছোট-বৌএর

বোনঝির কাছছাড়া একদণ্ড হয় না; এখনো তার বিয়ে না দেওয়া ভালো হচ্ছে না।

হরিবিহারী একখানা চিঠি দেখাইয়া বলিলেন—ঝিনুকপোঁতার হরিশ-বাবু এই চিঠি লিখেছেন; মাঘ মাসেই মেয়ের বিয়ে দিতে চান। ৯ই একটা দিন আছে, সেই দিনই বিয়ে হয়ে যাক কি বলো?

—হ্যাঁ, তা আর বল্‌তে, শুভকর্ম্মে আর বিলম্ব করা নয়। ভালো এক আপদ এনে জুটেছে বাড়ীতে।

হরিবিহারী বলিলেন—কতবার ত বল্‌ছি দাও না ঐ আপদ ঝাড়েমূলে দূর কোরে চুকিয়ে।

—বাপরে! তা কি হবার জো আছে, তা হলে ছেলেও দেশত্যাগী হবে।

—হ্যাঁ অমন সব বেটাই দেশত্যাগী হয়।

—না না, তুমি বিপিনকে জানো না। দুরন্ত একগুঁয়ে। ওকে ঘেটিয়ে কাজ নেই। শিগগির বিয়েটা দিয়ে ফেলো, তখন যার জিনিস সে বুঝে নেবে এখন।

—একবার ডাকাও ত বিপিনকে, তাকে একবার সব বলি।

সেইখান দিয়া বিনোদ একটা খরগোশ কোলে করিয়া লাফাইতে লাফাইতে যাইতেছিল। গিন্নি তাকে ডাকিয়া বলিলেন—ওরে ও বিনো, তোর দাদাকে ডেকে দে ত।

বিনোদ খরগোশের মতন তিন লাফে গিয়া বিপিনকে ডাকিয়া আনিল।

বিপিন আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কেউই কোনো কথা বলিলেন না। অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বিপিন বলিল—আমাকে কি ডেকেছিলেন!

তখন হরিবিহারী বলিলেন—হ্যাঁ, বল্‌ছিলাম কি সমস্ত দিন বাড়ীর

মধ্যে বোসে বোসে করো? একটু-আধটু জমিদারীর কাজকর্ম্ম দেখলেও ত হয়।

বিপিন বলিল—আপনি বল্‌লেই দেখ্‌তে পারি। কিন্তু সে কি সুবিধা হবে? আমি কারো অন্যায় সহ্য কোরে চল্‌তে পার্‌বো না। আমায় জমিদারীর ভার দিলে আমি দেওয়ান থেকে মুহুরী পর্য্যন্ত সব চোরগুলোকে জব্দ কোরে তবে ছাড়্‌ব। প্রজাশাসনের নামে যে গরীবের ওপর অত্যাচার সে আমি কিছুতেই হতে দেবো না। এই-সমস্ত ক্ষমতা আমায় দিলে আমি জমিদারী হাতে নিতে পারি।

—সে পরে যখন যেমন হবে বোঝা যাবে। এখন সুরু ত করো। কাল থেকে কাছারিতে যেও।

বিপিন বলিল—যে আজ্ঞে।

বিপিন চলিয়া যাইতেছিল, হরিবিহারী বলিলেন—ঝিনুকপোঁতার হরিশবাবুর মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ের ঠিক করেছি। ৯ই মাঘ একটা দিন আছে, সেই দিনেই বিয়ে হবে। তোমার কি চাই না-চাই দেওয়ান-জিকে একটা ফর্দ্দ কোরে দিয়ো।

বিপিন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—আমার বিয়ে! এত শিগ্‌গির?

—হ্যাঁ তাতে হয়েছে কি? তুমি এমন ভাব দেখালে যেন তোমায় ফাঁশির খবর শোনানো হল।

বিপিন বলিল—আমি ত এখন বিয়ে কর্‌তে পার্‌ব না।

—কেন? এর মধ্যে কঠিন ব্যাপারটা কি? পুরুষানুক্রমে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের লোক যে কাজটা কোরে আস্‌ছে, তুমিই বা সেটা পার্‌বে না কেন? তোমায় বিয়ে কর্‌তে হবে।

—বিয়ে আমি কর্‌ব কিন্তু ঝিনুকপোঁতায় নয়।

—কারণ?

—সে মেয়ে শুনেছি বড় ছোট।

—আরে ও কি চিরকালই ঐ রকম ছোট থাক্‌বে নাকি? ছোট মেয়েই বড় হয়, না, একেবারেই বড় মেয়েই মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়? আমি হরিশ-বাবুকে কথা দিয়েছি। তোমাকে তাঁর মেয়েকেই বিয়ে কর্‌তে হবে।

বিপিন দৃঢ়স্বরে বলিল—তা আমি পার্‌ব না। আমাকে জিজ্ঞাসা না কোরে কাউকে কথা দেওয়া আপনার উচিত হয় নি।

বিপিনের একবার মনে হইল বলিয়া ফেলে যে সে মালতীকে বিবাহ করিবে। কিন্তু তার প্রতি মালতীর মনের ভাব কিরূপ, মালতী তাকে বিবাহ করিতে রাজি হইবে কি না, তাহা ত যাচাই করা হয় নাই। সুতরাং সে সঙ্কল্প তার দমন করিতে হইল এবং সেইসঙ্গে এ সঙ্কল্পও তার মনে উঠিল যে শীঘ্রই মালতীর অভিমত জানিয়া লইতে হইবে। আর কোনো কথা না বলিয়া বিপিন সেখান হইতে প্রস্থান করিল। হরিবিহারী ও গিন্নি বিপিনের আচরণে অবাক্ হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ক্ষণেক পরে গিন্নি বলিলেন—ও পাগলের কথা তুমি শুনো না, সব ঠিক কোরে ফেলগে। ঝকমেরে ওকে বিয়ে কর্‌তে হবে।

হরিবিহারীর আহত অভিমান মনের মধ্যে গর্জ্জন করিতেছিল। তিনি বলিলেন—হাঁ, যাই দেওয়ানজিকে বলিগে সব ঠিকঠাক কর্‌তে।

হরিবিহারী বহির্বাটীতে প্রস্থান করিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে দেশময় রাষ্ট্র হইয়া গেল ৯ই মাঘ বিপিনের বিয়ে।

আর ত সময় নাই। বিয়ের জোগাড়ের তাড়াতাড়ি পড়িয়া গেল। কয় কাঠা চালের লাড়ু হইবে, কয় মণ হলুদ কোটা হইবে, কে পিঁড়িতে

আল্‌পনা দিবে, কে ছিরি গড়িবে, বিয়ের সময় কে কি বক্‌শিশ পাইবে, ইহারই আলোচনায় অন্তঃপুর সর্‌গরম হইয়া উঠিল। গিন্নি চীৎকার করিতে লাগিলেন—ওরে ডাক একবার ভুবন সর্‌কারকে, জিনিসের ফর্দ্দ কোরে নিয়ে যাক। মটরা গয়লার বাড়ী দুধ-দইয়ের বায়না কোরে আসুক। বংশী বাড়ীতে ক্ষীর কর্‌বে। মাছ কোটবার জন্য পাট্‌নী-পাড়ায় লোক ঠিক কোরে আসুক। বিদেশীয়া হাড়ির বৌ যেন সমস্ত দিন ধোরে এই কদিন এইখানে হাজির থাকে। দাতা হাড়িকে পাতার কথা বোলে দে। দেওয়ানজিকে বোলে আয় মহলে মহলে পাতা, লক্‌ড়ি, ডালা টুক্‌রীর চিঠি কোরে দেবে। আর দিন নেই যে, চটপট চটপট। যা যা সব, দাঁড়িয়ে হাঁ কোরে কি শুন্‌ছিস্‌…কিন্তু বিয়ে দেবে কে? ভট্‌চায্যি বট্‌ঠাকুর যে একঘরে। ওঁকে বল্‌তে হবে যদি এখন জাতের ঘোঁট মিটিয়ে ফেল্‌তে পারেন। তিনি বিয়ে না দিলে মন খুঁতমুত করবে। যদি একান্তই না হয় ভাটপাড়া থেকে পুরুত আন্‌তে হবে। সেও ত আর সময় নেই, আজকালের মধ্যেই সব ঠিক কোরে ফেল্‌তে হবে যে। আমি একা যে ক'দিক দেখি তার ঠিক নেই। কেউ যে দেখে শুনে কোরে কম্মে নেবে তা ত হবে না, সবই আমায় দেখ্‌তে হবে।…ও ভাই ছোট বৌ, তুমি ভাই একটু দেখে শুনে কোরে কর্ম্মে নেও, তোমার কি পরের মতন আড়ষ্ট হয়ে থাক্‌লে মানায়? যাও যাও।...এমন দিনে কোথাকার একটা কুড়ুনে ছেলের শোকে মালতী ঘরে বন্ধ হয়ে রইল, সে বাইরের কাজকম্মগুনো ত করতে পার্‌ত।…

গিন্নির বকুনির বিরাম নাই, ব্যস্ততার অন্ত নাই। তিনি দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার ঠাকুরঘরে গিয়া গলবস্ত্র হইয়া ঠাকুরের দিকে গদ্গদভাবে চাহিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—হে ঠাকুর, শুভ কর্ম্মটি সুভালাভালি

হয়ে যাক, তোমাকে ঘৃতপরমান্ন দেবো, হে নক্ষীদনাদ্দন, ডবল ভোগ দেবো।

সকল আনন্দ-কোলাহলের উপর বিনির কোমল কণ্ঠের বাঁশি বড় উচ্চরবে বাজিতেছিল—ওলে বলদার বিয়ে হবে লে, বৌ আচবে লে। মজা হবে, মজা হবে।

বিনোদ লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া মায়ের হাত ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িয়া বলিল—মা, বড়দার বিয়ে হচ্ছে, আমার কবে হবে?

গিন্নি হাসিয়া ববিলেন—এবার তুই মিতবর হবি, তারপর দাদার মতন ডাগর হলে বর হবি।

বিনোদের আনন্দ উপচিয়া পড়িতে লাগিল। সে লাফাইয়া লাফাইয়া চীৎকার করিয়া বেড়াইতে লাগিল—ওরে আমি মিতবর হব রে, বৌদিদিকে বিয়ে কর্‌তে যাব রে।

বিনি মুখ ফুলাইয়া গম্ভীরভাবে বলিল—আমালো বিয়ে হবে, বল আস্‌বে ড্যাংড্যাংশো হেঁইও ড্যাংড্যাংশো হেঁইও।

আজ সকলেই আনন্দ করিতেছে। কিন্তু যার বিবাহ তার মুখ বড় গম্ভীর, বড় কালো, আষাঢ় মাসের অমাবস্যার মতন। শুভবিবাহের আশঙ্কায় তার মুখ এতটুকু হইয়া গিয়াছে। বিপিন পিতার নিকট হইতে চলিয়া আসিয়া লাইব্রেরীতে চলিয়া গেল, মালতীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেও পারিল না। ইজি-চেয়ারে শুইয়া হাতের কাছে যে একখানা বই পাইল তারই মধ্যস্থল খুলিয়া চোখের সম্মুখে ধরিল। সমস্ত বইয়ের পৃষ্ঠাগুলি তার নিজের মনেরই মতনই আগাগোড়া কালো দাগে ভরা, সেখানে কোনো অর্থ সে খুঁজিয়া পাইল না। বইয়ের পাতায় চোখ রাখিয়া এই দুর্দ্দৈব হইতে নিষ্কৃতিলাভের নানাপ্রকার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোনোটাই তার সম্ভবপর বোধ হইতেছিল না। সে চিন্তা করিতে

লাগিল—এখন কর্ত্তব্য কি? জীবন-মরণের সমস্যা যখন উপস্থিত তখন লজ্জা করিলে ত আর চলিবে না, বিলম্ব করিলেও চলিবে না। বলিতে হইবে মালতীকে—সে ছাড়া আমাকে রক্ষা করিবার কেউ নাই। সে যদি স্বীকার করে, উত্তম। না ত? ভবিষ্যতের ব্যবস্থা ভবিষ্যৎ আপনি করিয়া লইবে।...নবকিশোর যদি এখন থাকিত।...লিখি একখানা চিঠি, সে যদি আসিয়া কোনো সদুপায় করিতে পারে।

বিপিন নবকিশোরকে চিঠি লিখিতে বসিল।

দাদাবাবুর বিয়ে—এতবড় সুখবরটা মালতীকে না শুনাইয়া রোহিণী কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছিল না। আহা! সকলেই আনন্দ করিতেছে আর সেই বেচারী পরের একটা ছেলের শোকে এককোণে একলাটি পড়িয়া আছে, ইহা রোহিণীর স্বভাবসদয় হৃদয়ে সহ্য হইতেছিল না। সে তাড়াতাড়ি মালতীর ঘরের কাছে আসিয়া একবার উঁকি মারিয়া দেখিল বিপিন আছে কি না। যখন দেখিল বিপিন নাই, তখন সে হাসিতে হাসিতে মালতীর ঘরের দ্বারদেশে হাত ছড়াইয়া চৌকাঠের দুদিক ধরিয়া বাঁকা হইয়া দাঁড়াইল।

রোহিণীর এই আনন্দাতিশয্য দেখিয়া মালতীর হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল, মুখ শুকাইয়া গেল। রোহিণীর বিকশিত দন্তপংক্তির অন্তরালে কি বিষ অপেক্ষা করিয়া আছে শূন্যদৃষ্টিতে মালতী তাই খুঁজিতে লাগিল।

রোহিণী চাপা গলায় বলিল—শুনেছ দিদিমণি, সুখবর!

মালতী নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া ভয়কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—কি?

রোহিণী চোখ মিটমিট করিয়া ঘাড় দুলাইয়া বলিল—দাদাবাবুর বিয়ে।

মালতীর মুখ একেবারে রক্তহীন শাদা মৃত্যুবিবর্ণ হইয়া গেল।

চেষ্টা করিয়া হাসিয়া উৎসাহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—কবে রে? কোথায়?

—এই নউই। ঝিনুকপোঁতার জমিদারের মেয়ের সঙ্গে। মেয়েটি তোমার চেয়েও সুন্দরী! দাদাবাবুর খুব পছন্দ হয়েছে।

মালতী এ কথার কি উত্তর দিবে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। এই আনন্দসংবাদে তার মন কেন যে ভাঙিয়া পড়িতেছিল, চোখ ফাটিয়া কেন যে জল বাহির হইতে চাহিতেছিল তাহা সে ঠিক বুঝিতে পারিল না। সে জোর করিয়া হাসিয়া বলিল—এমন আনন্দের দিনে আমিই শুধু আমোদ করতে পারব না। বিধাতা আমায় একলা থাকতেই পাঠিয়েছেন।

মালতীর গলা ধরিয়া আসিল। চোখ ফাটিয়া জল পড়িবার উপক্রম করিতে লাগিল। তখন তার মনে হইতে লাগিল—দূর হোক রোহিণী এখান থেকে, আমি একটু কাঁদিয়া বাঁচি।

এমন সময় বিপিনের পদশব্দ শোনা গেল। রোহিণী ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। মালতী চোখ মুছিয়া সংবৃত হইয়া বসিয়া তাড়াতাড়ি একখানা বই খুলিয়া তারই উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

বিপিন ঘরের মধ্যে আসিল। তবু মালতী মাথা তুলিল না। বিপিন ডাকিল—মালতী!

আর রোধ মানিল না। মালতী উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বিপিন ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—মালতী, তুমি কাঁদ্‌ছ কেন?

এ কথার উত্তর সে কি দিবে? সে কাঁদে কেন সেই যে ঠিক বুঝিতে পারিতেছে না।

বিপিন মনে করিল কেউ বোধ হয় মালতীকে কোনো কটু কথা কহিয়াছে। তাই স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া সে বলিল—দেখ মালতী,

তোমায় যে লোকে বাক্যযন্ত্রণা দেয় তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পারছি। কিন্তু এ নিবারণ করবার একটি মাত্র উপায় আছে। সে উপায় তোমারই হাতে।

মালতী অশ্রুজালের মধ্য দিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চাহিল। বিপিন বলিতে লাগিল—আমি যা বল্‌তে যাচ্ছি তা হয় ত আমার বলা উচিত হচ্ছে না, তবু না বোলে থাকতে পারছিনে। যদি তোমার মনে হয় অন্যায় বলেছি, তবে আমায় ক্ষমা কোরো, আর এ কথা যে আমি বলেছি তা তুমিও ভুলে যেও, আমিও ভুলে যাবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করব…

মালতী বুঝিতে পারিতেছিল না বিপিন এমনতর ভূমিকা করিয়া কি বলিতে চাহিতেছে। সে আবার মাথা তুলিয়া বিপিনের মুখের দিকে চাহিল।

যখন আসল কথা বলিবার সময় আসিল তখন বিপিন খুঁজিয়া পাইতেছিল না কেমন করিয়া মালতীকে নিজের প্রণয় নিবেদন করিবে। মালতীর কেমন যেন একটা দূরত্ব আছে, তাকে কোনো কথা যেন অসঙ্কোচে বলা চলে না, তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে যেন বাধে। বিপিন একটু ইতস্তত করিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল—আমার বিয়ের কথা হচ্ছে…

বলিয়াই বিপিন বুঝিল কথাটা বড় বেমানান বলা হইল।

মালতীর বুকে ঝাঁত করিয়া আঘাত লাগিল। শক্ত হইয়া বলিল—শুনেছি।

বিপিন উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—জানো কি মালতী, আমি কাকে আমার সহধর্ম্মিণীর উপযুক্ত মনে করি?

মালতীর নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল; হৃদয় বুঝি বা

ফাটিয়া পড়ে। সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বিপিন ক্ষণেক থামিয়া মালতীর কোনো উত্তর না পাইয়া বলিতে লাগিল—মালতী, তুমি কি আমার সহধর্ম্মিণী হবে?

মালতী নির্বাক নিশ্চল। বিপিন মালতীকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া সাহস ও আশা পাইয়া মালতীর হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া মিনতির স্বরে বলিল—তবে মালতী, তুমি স্বীকার করছ?

আশায়, আনন্দে, প্রেয়সী রমণীর প্রথম করস্পর্শে বিপিনের অন্তরের রক্তপ্রবাহ চনচন করিয়া বহিতেছিল, মনের উত্তেজনায় যেন তার সমস্ত দেহযন্ত্র সজীব সজাগ হইয়া মালতীর একটি স্বীকারবাণী শুনিবার জন্য একাগ্র ব্যাকুলতায় উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। বিপিনের আবেগমত্ত পীড়নে মালতীর করপল্লব আলোহিত হইয়া ব্যথিত হইয়া উঠিল।

মালতী আস্তে আস্তে বিপিনের হাত হইতে নিজের হাত সরাইয়া লইয়া বলিল—না।

এই অপ্রত্যাশিত উত্তর শুনিয়া বিপিন স্তম্ভিত অবাক হইয়া গেল। আজ এক নিমিষে একটি 'না' তার এতদিনকার পলে পলে সঞ্চিত সমস্ত আশা ছারখার করিয়া দিয়া গেল।

বিপিন অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—মালতী, আমার নিবেদনের নিষ্পত্তি কি এই চূড়ান্ত, না, আর-একবার ভেবে দেখবে?

মালতীর বোধ হইতে লাগিল যেন বিপিনের দৃষ্টি হইতে সকরুণ বেদনাভরা প্রণয় ক্ষরিত হইতেছে, যেন সে শুনিতে পাইতেছে বিপিনের কণ্ঠস্বরে তার অন্তরের অশ্রুগুলিই গলিয়া গলিয়া পড়িতেছে এবং সে যেন সর্ব্বাঙ্গ দিয়া তার আর্দ্র স্পর্শ অনুভব করিতেছে।

মালতী তার বড় বড় চোখ দুটি নীরব সান্ত্বনায় ভরিয়া বিপিনের দিকে তুলিয়া ধরিয়া বলিল—আমি ভেবেই বলেছি।

বিপিন আর কিছু বলিবার পাইল না। দুজনেই নিঃশব্দ। উভয়ের মধ্যে যে একটি নিস্তব্ধতার পর্দ্দা পড়িয়া গেল তাহা কেউই সরাইতে পারিতেছিল না। অনেকক্ষণ দুজনেই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া বিপিন হঠাৎ উঠিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল।

বিপিন চলিয়া যাইবামাত্র মালতী বালিশে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। এমন সময় খুড়িমা সেখানে আসিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেখিয়া দেখিয়া বিরক্ত ও আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন,—মালতী, অমন কোরে কাঁদ্‌চিস কেন! তুই ত পেটে ধরিস্‌নি, তবে তার জন্যে এত কান্নাকাটি কেন? তোর সকলই কি বাড়াবাড়ি বাপু?

খুড়িমার সাড়া পাইয়া মালতী তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল, যেন এ ব্যক্তি এখনি ক্রন্দনে লুণ্ঠিত হইতেছিল না। খুড়িমা বলিলেন—কার-না-কার ছেলে, তাকে দুদিন একটু নেড়েছিস্ বৈ ত না, তার জন্যে এত কেন রে বাপু! বিপিনের বিয়ে। চ কাজকর্ম্ম কর্‌বি, ঘরের কোণে বোসে বোসে আর রাতদিন কাঁদ্‌তে হবে না।

মালতী চুপ করিয়া রহিল, তার নড়িবার কোনো লক্ষণ না দেখিয়া বিরক্ত হইয়া খুড়িমা বলিলেন—ভ্যালা একগুঁয়ে মেয়ে তুই যা হোক! এমন মেয়ে আমি বাপের জন্মেও দেখিনি!

এই বলিয়া খুড়িমা চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁর হৃদয়ে মালতীর দুঃখের সমবেদনার আঘাতে যে দুঃখের তন্ত্রী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল তাতে তাঁরও চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

৩০

এদিকে যখন এইরূপ কান্নাকাটি চলিতেছিল তখন বিপিন ম্লানমুখে দ্রুতপদক্ষেপে নিবারণ-মুখুয্যের বাড়ীর উদ্দেশে যাইতেছিল।

নিবারণ-মুখুয্যে তখন চণ্ডীমণ্ডপে ছেঁড়া মাদুরখানি বিছাইয়া অতি মলিন একটি ছোট তাকিয়া কোলে করিয়া তারই উপর ঝুঁকিয়া তামাক খাইতেছিল এবং গোবর্দ্ধন নূতন চিলিমে তামাক ভরিতে ভরিতে বলিতেছিল—হেঃ! ভারি ত তোমার ক্ষ্যামতা! বিপ্‌নে আর কিশ্‌রে আমাদের কি নাকালটাই না কর্‌ছে—পথ চল্‌তে গা ছমছম করে, ভয় হয় কখন মাথাটা ধোরে গুঁড়িয়ে বা ফ্যালে। বাপ! সেদিন কি বাঁচনটাই বেঁচে গেছি!

নিবারণ বলিল—দাঁড়া না, এর শোধ তুল্‌ব তবে আমার নাম নিবারণ-মুখুয্যে। ভট্‌চায্যিদের একঘরে করেছি···

গোবর্দ্ধন বাধা দিয়া বলিল—হেঃ! ভারি একঘরে করেছ! ভট্‌চায্যি আর কিশ্‌রে দিব্যি জমিদারবাড়ী আনাগোনা করছে, এ আবার একঘরে কিসের?

নিবারণ বলিল—আহা দাঁড়া না, সবুরে মেওয়া ফলে। বিপনেটা হল জমিদারের ছেলে, ওকে কি সহজে দাবানো যাবে। আগে এই বিয়েটিতে ভাঙচি দেবো, শিশুপালের দশা কোরে ছাড়ব। বাছাধন বিয়ে কর্‌তে গিয়ে দেখবেন সে-মেয়ের বিয়ে অন্য জায়গায় হয়ে গেছে; আর অমনি মুখখানি আম্‌সিপানা কোরে ফিরে আস্‌তে হবে। আমি ঝিনুকপোঁতার হরিশবাবুকে চিঠি লিখব যে বিপিনের জাত নেই, ও মোছলমানের ছোঁয়া মুর্‌গী খায়; আরো দুচারটে মৃত্যুবাণ আজকে রাত্তিরে ভেবে ঠিক কর্‌তে হবে। হরিশচাটুয্যে যে হিঁদু, এ শুনে সে কক্‌খনো মেয়ে দেবে না। তারপর এই সূত্র ধরে ওকে একঘরে

করা সহজ হবে। তখন বাপ কিছু আর ছেলের জন্যে সমাজে ঠেলা হয়ে থাক্‌বে না, সে ছেলেকে দূর কোরে দেবে। এ আমি কর্‌ব কর্‌ব কর্‌ব।

এমন সময় বিপিন প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল।

তাকে দেখিবামাত্রই নিবারণের শরীর এমন কম্পিত হইয়া উঠিল যে হুঁকার আগুন ছড়াইয়া পড়িল। গোবর্দ্ধন চকমকিতে ঘা দিতে গিয়া লোহা দিয়া নিজের হাতেই নির্ম্মম আঘাত করিয়া ফেলিল। তাদের উভয়েরই মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। কেউ কোনো কথা না বলিয়া নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিল, আগুন পড়িয়া তাকিয়া মাদুর যে পুড়িতেছিল সে দিকেও কারো দৃষ্টি দিবার সাহসে কুলাইতেছিল না।

বিপিন তাদের ভয়বিহ্বল ভাব লক্ষ্য না করিয়াই উচ্চস্বরে বলিল—মুখুয্যে-মশায়, আমাকে একঘরে করুন, আমি মোছলমানের ছোঁয়া খাই, আপনারা যাকে ধর্ম্ম বলেন তার কিছুই আমি মানিনে।

বিপিন মালতীর নিকট প্রত্যাখাত হইয়া অন্তরে যে আঘাত পাইয়াছিল, তার বেদনা সে কিছুতেই কারো কাছে প্রকাশ করিতে পারে না, এমন কি সে নিজের কাছে পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছিল; এজন্য তার চিত্ত আর একটা নূতন আঘাত পাইয়া নিজেকে বেদনায় প্রকাশ করিয়া ধরিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। সেই-জন্যই সে তাড়াতাড়ি নিবারণের কাছে আসিয়া এমন জোর করিয়া একঘরে হইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিল। কিন্তু নিবারণ অতশত না বুঝিয়া মনে করিল, সর্ব্বনাশ! ছোঁড়াটা নিশ্চয় তার সব কথা শুনিয়াছে। তথাপি সাহস করিয়া প্রকাশ্যে বলিল—হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ, তোমায় কি একঘরে কর্‌তে পারি ভায়া?—তোমাদের

নিয়েই ত আমাদের সমাজ! তা তা যৌবনকালে ওরকম একটু-আধটু অনাচার সকলেরই ঘোটে থাকে, সেটা—ওর নাম কি—বয়েসের দোষ—বুঝ্লে কিনা ভায়া। ওটা বয়েস হলে—বুঝ্লে কিনা—সেরে যাবে।

—কিছুতে সারবে না মুখুয্যে-মশায়, সে আশা করবেন না। আর যৌবনের ধর্ম্ম বোলে আমায় রেহাই দিচ্ছেন, কিন্তু কিশোরের ত বার্দ্ধক্যের লক্ষণ দেখা যায়নি। তাকে ত একঘরে করেছেন। আমাকেও করুন, দোহাই আপনার।

—এঁ এঁ এঁ তা তা বুঝেছ কিনা, তাতে আর তোমাতে কি সমান হল? হেঁহেঁ সে হল—বুঝ্লে কিনা—খোলাকাটা বামুনের ছেলে, আর তুমি হলে—ওর নাম কি—রাজরাজেশ্বর। তা তা—ওর নাম কি—তুমি যদি বলো, তা হলে ভট্চায্যিদের—বুঝ্লে কিনা—আজই জাতে তুলে নি।

—না না না, অমন কাজ করবেন না, মুখুয্যে-মশায়। বেশ করেছেন একঘরে করেছেন। আপনাদের সঙ্গে একদলে থাকার চেয়ে একঘরে হয়ে থাকা ঢের ভালো। দোহাই আপনার, আমাকেও একঘরে করুন, বাবাকে বুঝিয়ে রাজি করুন—তিনি আমাকে বাড়ী থেকে দূর কোরে তাড়িয়ে দিন। আর আমার এই বিয়েটা যাতে না হয় তার চেষ্টাও আপনাকে একটু করতে হবে। এই দুটো কাজই আপনি অনায়াসে করতে পারবেন।

নিবারণ মনে মনে বলিল—এইরে সব শুনেছে! প্রকাশ্যে বলিল—রামচন্দ্র! রামচন্দ্র! শুভকর্ম্মে হন্তারক—বুঝ্লে কিনা—আমি কি হতে পারি। ওর নাম কি—তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছি, তোমরা যতটা মনে করো আমি ততবড় পাপিষ্ঠ নই—বুঝ্লে কি না ভায়া! আর আমার ক্ষমতাই বা কি যে আমি তোমার বিয়ে রোধ করব। রামচন্দ্র! রামচন্দ্র!

—আপনার ক্ষমতা খুব আছে মুখুয্যে-মশায়, খুব আছে। আপনি হয়ত কস্তুরী মৃগের মতো নিজের গুণ নিজে জানেন না, কিন্তু আপনার মহিমা ত আমাদের কাছে ছাপা নেই। আপনি একখানা চিঠি লিখে দিলেই ত তারা পিছিয়ে যাবে।

—রামচন্দ্র! রামচন্দ্র! আমি ততবড় পাষণ্ড নই—বুঝ্‌লে কিনা ভায়া। এও কি একটা কথা হল? রামচন্দ্র! আমি এদিকে চিঠি লিখি, আর—বুঝলে কিনা—তার পরদিন—ওর নাম কি—তোমার বাবার লেঠেল এসে আমার ভিটেমাটি উচ্ছন্ন করে দিয়ে যাক আর কি! এত বড় বোকা নই আমি, বুঝ্‌লে কিনা ভায়া।

—আহা! আপনি চিঠিতে নাম দেবেন কেন? বেনামী চিঠি চালা-নোটাও ত আপনার একেবারে অনভ্যাস নেই!

—হেঁ হেঁ হেঁ ওড় নাম কি জানো, ও সমস্ত মন্দ লোকের রচা কথা, কেউ ত কারো ভালো দেখ্‌তে পারে না। বেনামী চিঠি! রামঃ, রামঃ!

—তা হলে আপনি আমাকে এই অনুগ্রহটুকু কর্‌চেন না কিছুতেই।

নিবারণ মনে মনে বলিল—তুমি যখন এত ব্যস্ত হয়েছ তখন কিছুতেই একাজ আমার করা হবে না। তোমার যখন ওখানে বিয়ে কর্‌বার ইচ্ছে নেই তখন ঐখানেই তোমার বিয়ে দিইয়ে তোমায় নাকের জলে চোখের জলে কর্‌ব। কিন্তু শ্বশুরের মস্ত জমিদারীটা পাবে সেইটে যা অসহ্য। আচ্ছা দেখা যাবে, হরিশচাটুয্যেকে পুষ্যিপুত্তুর নেওয়াতে পারি কি না। আমার ছোট ছেলেটাকে পুষ্যিপুত্তুর কোরে দিতে পারি তবে ঠিক রোগের মতন ওষুধ হয়।

নিবারণকে নিরুত্তর দেখিয়া বিপিন বিরক্ত হইয়া বলিল—ভাব্‌ছেন কি মুখুয্যে-মশায়! যমের প্রাণীবধে সঙ্কোচ আজ এই নতুন দেখ্‌ছি।

নিবারণ বলিল—না ভায়া, এমন অধর্ম্ম এ বুড়ো বয়সে আমা হতে না, তা তুমি গালই দাও আর মন্দই বলো—বুঝ্‌লে কিনা।

—আচ্ছা, তবে বসুন? আমি অন্য চেষ্টা দেখিগে।—বলিয়া বি প্রস্থান করিল।

খ।নেকক্ষণ পিতাপুত্র উভয়েই আড়ষ্ট নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ ধরিয়া যখন আর বিপিনের কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, তখন নিবারণ একটু নড়িয়া বসিল, গোবর্দ্ধন একটু কাশিল। নিবারণ হস্তসঙ্কেতের সহিত চাপা গলায় বলিল—দেখ্‌ত, দেখ্‌ত ছোঁড়াটা গেল কি না।

গোবর্দ্ধন মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল—হ্যাঁ, আমি যাই আর আমায় ক্যাঁক কোরে ধরুক আর কি। তুমি উঠে গিয়ে দেখে এস না?

—আরে না না, ভয় নেই, ও কিছু বল্‌বে না; বল্‌ত ত এসেই ধমাধম লাগিয়ে দিত।

এ কথার যৌক্তিকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া গোবর্দ্ধন আস্তে আস্তে উঠানে নামিয়া দেখিতে লাগিল বিপিন বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। তখন পিতাকে হস্তসঙ্কেতে বিপিনের দূরে গমন জানাইয়া বলিল—ওঃ চলে গেছে।

তখন নিবারণ সাহস সঞ্চয় করিয়া কোমরের কাপড় একটু কষিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কাছাটা খুলিয়া গিয়াছিল, ঝুলিয়া পড়িল। তখন বাম পদের এক আঘাতে লম্বমান কাছাটিকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দুই হাতে ধরিয়া লইল এবং যথাস্থানে গুঁজিতে গুঁজিতে উঠানে নামিয়া আসিল। যখন দেখিল বিপিন দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে তখন নিজের মনেই প্রকাশ্যে চিন্তা করিয়া বলিতে লাগিল—হুঁ এখন একবার হরিবিহারীর কাছে যেতে হচ্ছে। সে যেন আবার ছেলের আব্দার শুনে বেঁকে না বসে।

তখন তার পুরাতন বন্ধু আধময়লা সূতো-সরা জ্যালজেলে চাদরখানি কাঁধে ফেলিয়া, ধনুকাকৃতি চটিজোড়া পায়ে দিয়ে ও কালো চিরকুট গামোছা ও একগাছা বাঁশের লাঠি হাতে লইয়া নিবারণ যাত্রা করিল।

বাড়ীর বাহিরে নিবারণের ভৃত্য ছিরে একটা আগড় মেরামত করিতেছিল। সে প্রভুকে দেখিয়া দন্তবিকাশ করিয়া বলিল—মুখুয্যে-মশায়, কোয়ানে যাচ্ছ, দেখ ত ঠিক বাঁধেছি কি না?

নিবারণ তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া দাঁতমুখ খিঁচাইয়া বলিল—পাজি বেটা, নচ্ছার বেটা, শুভকাজে যাচ্ছি তুই পিছু ডাক্‌লি। হারামজাদা, আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন।

এই বলিয়া নিবারণ তাড়া করিয়া ছিরেকে মারিতে গেল। ছিরে দেয়ালের ধারে বসিয়া বেড়া বাঁধিতেছিল, পলায়নের উপায় না দেখিয়া আগড়খানা উঁচু করিয়া ধরিয়া তার পাশে লুকাইল। নিবারণ অগ্রসর হইয়া তার লাঠি দিয়া ছিরেকে খোঁচা দিতে আরম্ভ করিল। দু একটা খোঁচা খাইয়াই ছিরে 'আউ' করিয়া আগড়খানা ছাড়িয়া দিল এবং সেই আগড় সজোরে নিবারণের ঘাড়ে গিয়া পড়িল। নিবারণ সে আঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিল না, আগড়ের ধাক্কায় একেবারে চিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল এবং আগড়খানা তার উপর চাপিয়া পড়িল। নিবারণ পড়িয়া পড়িয়া মহা চীৎকার সোরগোল আরম্ভ করিল, কিন্তু ছিরে প্রভুকে সাহায্য না করিয়া সেখান হইতে চোঁচা দৌড় দিল। সেই সময় হীরালাল ধোবা সেইখান দিয়া যাইতেছিল। সে মুখুয্যে-মশায়কে তদবস্থা দেখিয়া তাড়াতাড়ি কাপড়ের মোট ফেলিয়া আগড় তুলিয়া ধরিল। মুখুয্যে উঠিয়াই হীরালালের গালে এক চড়। হীরালাল হতমত খাইয়া আপনার অজ্ঞাত অপরাধ নির্দ্ধারণের জন্য মুখুয্যে-

মশায়ের মুখের দিকে চাহিল। মুখুয্যে আস্ফালন করিয়া বলিল—ব্যাটা ধোবা, তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা তুই আমাকে ছুঁলি? আমি শুভকর্ম্মে যাত্রা কোরে বেরিয়েছি, তুই কোন্ আক্কেলে আমায় মুখ দেখালি!

হীরালাল অপ্রতিভ হইয়া অপরাধীর মতো হাতজোড় করিয়া বলিতে লাগিল—আজ্ঞে আমি জান্‌তাম না যে আপনি কোথাও যাচ্ছেন। তাহলে কি কখনো আপনার সাম্‌নে আসি? ঘাট হয়েছে। মুখুয্যে-মশায়, মাপ করুন।

নিবারণ অঙ্গের ধুলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল—যা বেটা যা। মাপ কর্‌লেম।

হীরালাল যেন নিষ্কৃতি পাইয়া বাঁচিল। বাপরে! ব্রহ্মকোপ কি সামান্য।

গোলমাল শুনিয়া গোবর্দ্ধন বাহির হইয়া আসিল। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বলিল—বাবা, একটু বোসে যাও।

নিবারণ সেইখানেই একটু উবু হইয়া বসিয়া তৎক্ষণাৎ দুর্গা দুর্গা শ্রীহরি শ্রীহরি বলিয়া উঠিয়া যাত্রা করিল।

বিপিন ভট্টাচার্য্য-মহাশয়ের বাড়ী হইতে ফিরিতেছে, পথে হীরালালকে পাশ কাটাইয়া পলাইতে দেখিল। বিপিন হাসিয়া বলিল—কি হীরে কাকা, ভালো আছ? তোমার মুখ এমন শুক্‌নো কেন?

হীরালাল তাড়াতাড়ি প্রণাম করিয়া সমস্ত কথা বলিল। বিপিন চক্ষু অগ্নিবর্ণ করিয়া বলিল—তোমায় নিবারণ শুধুশুধু মার্‌লে আর তুমি অমনি চুপটি কোরে ফিরে এলে? তুমিও তাকে এক চড় কষিয়ে দিতে পার্‌লে না?

হীরালাল জিভ কাটিয়া বলিল—এঁজ্ঞে অমন কথা বোলো না বাবা,

আমার অপরাধ হবে, তিনি হল বেরাহ্মোণ! আর আমি নীচ জাত। পূর্ব্বজন্মে কত পাপ কোরে এ জন্মে ময়লা সাফ কোরে মর্‌ছি। আবার?

বিপিন বলিল—এই ত তোমাদের ভুল হীরেকা। জাতের আবার উঁচু নীচু কি? কাজেরই আবার ছোট বড় কি! তোমরা সব নিজেরা মাথা হেঁট কোরে কথাটি না বোলে লোকের লাথি ঝাঁটা খাবে ত নীচ হয়ে থাক্‌বে না? একবার মাথা তুলে দাঁড়াও দেখি, সহ্য না কর্‌বার মতো বল একবার কোরে নাও দেখি, তখন দেখবে তোমরা নিবারণ-গোবরার মতন বামুনের চেয়ে ভালো বই মন্দ নও। ব্রাহ্মণ ত ভট্‌চায্যি-জ্যাঠা, তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে থাক্‌তে হয়। আর ওগুলো কি বামুন—ওগুলো চণ্ডালেরও অধম।...চলো তুমি ফিরে...আমি দাঁড়িয়ে থাক্‌ব আর তুমি নিবারণের চুলের টিকি ধোরে এক চড় কষিয়ে দেবে। আগড়চাপা পড়েছিল, তুমি তুলে উপকার কর্‌লে, তার পুরস্কার হল কিনা গালাগালি আর চড়!...চলো তুমি।

—না বাবা, আমি বামুনের সঙ্গে কাজিয়া কর্‌তে পার্‌ব না।—বলিয়া হীরা ধোপা সেখান হইতে দৌড় দিল।

বিপিন রাগে ফোঁস ফোঁস করিতে করিতে যখন নিবারণের বাড়ীতে গেল, তখন বহু পুণ্যের জোরে নিবারণ হরিবিহারীর বৈঠকখানায় গিয়া পৌছিয়াছে।

নিবারণকে সমাগত দেখিয়া হরিবিহারী গড়গড়ার নল ফরাশের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—এস এস খুড়ো এস। এই আমি মনে কর্‌ছিলাম তোমাকে ডেকে পাঠাই। তুমি বাঁচবে অনেক দিন।

নিবারণ উদাসীন ভাবে বলিল—না বাপু, এ কলিকালে সংসারে বেঁচে সুখ নেই। যেকালে লোকে জাত মানে না, ধর্ম্ম মানে না, সেকালে কি থাক্‌তে আছে।

হরিবিহারী হাসিয়া বলিলেন—না থেকেই বা করছ কি বলো ? মরেও ত নিস্তার নেই ? যমালয় আছে, যমদূত আছে, নরক আছে ; তার চেয়ে ভালো জায়গায় ভালো লোকের হেফাজতে ত থাকা তোমার আমার ভাগ্যে হবে না। তারপর পুনর্জন্ম হলেও এই কলিকালেই ত জন্ম নিতে হবে! ফিরে জন্মে যে ব্রাহ্মণ হব, এমন কি মানুষই যে হব, তারই বা ঠিক কি ? তার চেয়ে খুড়ো যে ক'টা দিন পারা যায় বেঁচে থাকাই ভালো, তাতে লাভ বৈ অলাভ নেই। এ-জন্মটার সুখদুঃখ ওরই মধ্যে একরকম গা-সহা হয়ে অভ্যেস হয়ে এসেছে, আবার নতুন জীবনে নতুন ল্যাঠার কাজ কি ?

নিবারণ দন্তবিকাশ করিয়া বলিল—হেঁহেঁহেঁ বলেছ ভালো বাবাজী, বলেছ ভালো। হাজার হোক রাজবুদ্ধি কিনা! তবে—ওর নাম কি—ধর্ম্মের গ্লানি শুনলে বড় মনকষ্ট হয়—বুঝলে কিনা, তাইতে খেদে মরণের কথা বেরোয়, নইলে বাঁচতে কার অসাধ বলো। এই দেখ না এই অল্পক্ষণ আগে—ওর নাম কি—বিপিন-ভায়া আমার বাড়ী গিয়ে—বুঝলে কিনা—বড় গলা কোরে বলতে লাগলেন আমি মুরগি খাই, গরু খাই, মোছলমানের এঁটো খাই! রামচন্দ্র! রামচন্দ্র! এসব শুনলে গায়ে জ্বর আসে কিনা বলোত বাবাজী ?

হরিবিহারী এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া পাল্টা প্রশ্ন করিলেন—কেন কেন ? বিপিন আজ হঠাৎ তোমার বাড়ী গিছল যে ?

নিবারণ তুড়ি দিয়া হাই তুলিতে তুলিতে বলিল—আ হা হা হা—সে বাবাজী অনেক কথা, তাই বলতেই ত এসেছি। ভায়া আমায় গিয়ে ধোরে বসেছিলেন যে দাদা-মশায়, আমি ত বাবাকে বলতে পারব না, আপনি একবার বাবাকে :বলবেন এ বিয়েতে আমার মত নেই। আমি মালতীকে বিয়ে করব ঠিক করেছি।—আমি বললাম, আরে পাগল, তাও

কি কখনো হয়, সব ঠিকঠাক, কর্ত্তা কথা দিয়েছেন, এখন কি পাগলামি কর্‌তে আছে? তখন ভায়া রেগে চটেই বল্‌লেন আপনি একবার বাবাকে বলবেন ত, তারপর বাবা না শোনেন ত আমি দেখে নেব। যে বিয়েতে—ওর নাম কি—ব্রজকিশোর স্মৃতিরত্ন পুরোহিত হবে না, ওর নাম কি নবকিশোর বরযাত্র যাবে না, সে বিয়ে আমি কখনো কর্‌ব না। আমি ঝিনুকপোঁতায় হরিশ-বাবুকে বেনামি কোরে লিখে দেবো যে আমি গরু খাই, মুছলমানের এঁটো খাই!...বল্‌লে না পেত্যয় যাবে বাবাজী, ভায়ার সে কুদুনি কি? এই মারে ত এই মারে। তখন—বুঝলে কি না—আমি স্বীকার কর্‌লুম যে তোমায় এসে বল্‌ব। তখন—ওর নাম কি—একটু ঠাণ্ডা হয়ে ভট্‌চায্যিদের বাড়ীর দিকে চোলে গেল। আমি তাড়াতাড়ি তোমায় খবর দিতে এসেছি, সাবধান, শুভকর্ম্ম পণ্ড কোরে না দ্যায়। এর ভেতরে নিশ্চয় ঐ ভট্‌চায্যিদের টিপ আছে, আর ভায়ারও বোধহয় মালতীর ওপর মন পড়েছে! দেখো বাবাজী, শেষকালটায় যেন তাকেই বিয়ে না কোরে ফেলে।

হরিবিহারী চিন্তিত হইয়া অন্যমনস্কভাবে বলিতে লাগিলেন—আমি যার তোমায় ডেকে পাঠাচ্ছিলাম তোমায় বল্‌ব বোলে যে ভট্‌চায্যিদের জাতে তুলে নেওয়া যাক্। কিন্তু এ যে একটা কেমন খট্‌কা লাগছে। ঐ গোঁয়ারগোবিন্দ কিশোর ছোঁড়া কি কাণ্ডখানাই না করছে বিপিনকে নিয়ে। তাহলে ভট্‌চায্যিরা যেমন আছে তেমনি থাক, কি বলো?

—হাঁ সে আর বল্‌তে? এখন কি ওদের জাতে তুল্‌তে আছে?

—কিন্তু পুরুতের কি হবে?

—তার আর ভাবনা কি? ভাটপাড়ায় হাজার গণ্ডা পুরুত জিয়ানো রয়েছে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ বেশ বলেছ। তাহলে তুমি যা হোক দেওয়ানজির সঙ্গে পরামর্শ কোরে ঠিকঠাক কোরে দিয়ো খুড়ো।

—তা আর অত কোরে বল্‌তে হবে কেন? এ ত আমাদের কর্ত্তব্য।

ঝঞ্ঝাটভীত হরিবিহারী নিজেকে কোনো চেষ্টা করিতে হইবে না জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। তারপর বলিলেন—কিন্তু এদিকে বিপিনকে কি করা যায়?

নিবারণ বলিল—বিপিনকে ডেকে তুমি খুব কড়া কোরে ধমকে দাও। ছোটগিন্নি আর মালতীকে বাড়ী থেকে কোথাও সরিয়ে ফেলো। ছোটগিন্নির টিপেই এইসব হচ্ছে। কিন্তু খবরদার বাবাজী, আমি যে তোমায় কিছু বলেছি তা যেন সে টের না পায়, তাহলে আমার ধড়ে প্রাণ থাক্‌বে না। হতভাগা ছোঁড়াগুলো বলে কি না যে, গোবধ হবে বোলে আমায় কিছু বলে না। তা গরুও যা ব্রাহ্মণও ত তাই, শাস্ত্রেই আছে গোব্রাহ্মণহিতায় চ। কিন্তু গরু যখন খেয়ে ফেল্‌ছে, তখন গো হয়েও ত এদের হাতে নিস্তার নেই। দোহাই বাবাজী, আমার নাম কোরো না। আর এক কাজ করো, আমায় বরং ঝিনুকপোঁতায় পাঠিয়ে দাও, আমি সেখানে বোসে বোসে সে দিকটা আগলাই এখন।

হরিবিহারী উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—এ অতি উত্তম পরামর্শ। তুমি দেওয়ানজির কাছ থেকে একশ টাকা নিয়ে কালই রওনা হয়ে যাও। দেওয়ানজিকে আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি।

হরিবিহারী একটু চিরকুট লিখিয়া দিলে 'হরিহে তোমারি ইচ্ছা' বলিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া নিবারণ এক ঢিলে অনেকগুলি পাখী মারিয়া উৎফুল্ল মনে প্রস্থান করিল।

নিবারণ চলিয়া গেলে হরিবিহারী বলিলেন—রামধন, যা ত একবার ছোটবাবুকে ডেকে আন্ ত।

রামধন বিপিনকে ডাকিয়া আনিল।

বিপিন ঘরে ঢুকিয়া বলিল—বাবা, ডাক্‌ছেন?

—হ্যাঁ। এসব কি ছেলেমানুষী হচ্ছে,—বিয়ে করব না, বিয়ে ভেঙে দেবো, হ্যান ত্যান? এসব কি?

বিপিন নীরব। হরিবিহারী বলিতে লাগিলেন—বাপের সুপুত্তুর হয়ে বিয়েটা কোরে এস, তারপর যা খুসি কোরো না, তাতে ত তোমায় কেউ বারণ কর্‌বে না। একটা বিয়ে ত কর্‌তে হবে।

বিপিন বলিল—এ বিয়ে আমি কিছুতেই কর্‌তে পার্‌ব না।

হরিবিহারী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন—শুন্‌ছি ছোট-বৌএর বোনঝিকে বিয়ে কর্‌বার জন্যে ক্ষেপেছিস। এ সমস্তই ছোট-বৌএর কারসাজি! দিচ্ছি এখুনি ওদের বাড়ী থেকে খেদিয়ে·····

বিপিন বলিল—আপনি খুড়িমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়েছেন। আপনি তাঁদের প্রতিপালন করতে বাধ্য। আমি আপনাকে এ অন্যায় কখনো করতে দেবো না। আপনি তাঁদের তাড়িয়ে দিলে আমাকেও আপনার বাড়ী ছেড়ে ওঁদের সঙ্গেই যেতে হবে!

হরিবিহারী একেবারে উন্মত্তের মতো হইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—কী! আমার মুখের ওপর উত্তুর! যা না তুই সুদ্ধু আমার বাড়ী থেকে দূর হয়ে! আমায় কী ভয় দেখাচ্ছিস! আজই দূর হয়ে যা!

অভিমানী বিপিনের চোখ ছল-ছল করিতে লাগিল। সে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—আচ্ছা, তাই হবে।

বিপিন পিতার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া বরাবর লাইব্রেরীতে গেল। দেখিল সেখানে দুই হাঁটু হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া পঞ্চা ঢুলিতেছে। বিপিন আসিয়া বেদনা-কাতর কণ্ঠে ডাকিল—পঞ্চাদা।

পঞ্চা চমকিয়া জাগ্রত হইয়া বলিল—কেন ভাই ?

বিপিন বলিল—আমি কল্‌কাতায় যাব, আমার জিনিষপত্তর গুছিয়ে দে।

পঞ্চা বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে কোনো কথা না বলিয়া আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। বিপিন আরাম-কেদারায় শুইয়া পড়িয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল।

পঞ্চা তাড়াতাড়ি গিয়া গিন্নিকে বলিল—মুনিবমা, ছোটবাবুর কি হয়েছে। মুখ একেবারে কালবৈশাখীর মতো আঁধার! আমায় বল্‌লে, পঞ্চাদা আমি কল্‌কাতায় যাব জিনিষপত্তর গুছিয়ে দে।

গিন্নি চিন্তিত হইয়া বলিলেন—কি হয়েছে তুই কিছু জানিস্‌নে ?

—না। এখনি রামধন এসে মহারাজের কাছে ছোটবাবুকে ডেকে নিয়ে গিছ্‌ল। সেখান থেকে ফিরে এসেই আমায় ঐ কথা বল্‌লে।

—ডাক্ দেখি একবার রামধনকে শুনি কি হয়েছে!

পঞ্চা রামধনকে ডাকিয়া আনিল। রামধন আসিয়া সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিল। তখন গিন্নি বলিলেন—আমি আর পারি না বাপু। আমারই হাড় ভাজা-ভাজা কোরে তুল্‌লে। কোথায় বেটার বিয়ে দিয়ে বরণ কোরে বৌ ঘরে তুল্‌ব, না, বেটাই চল্‌লেন বিবাগী হয়ে। কি

কুক্ষণে মালতী ভিটেয় পা দিয়েছিল যে কোনো দিকে ভালাই নেই। চ দেখি বিপিন কোথায় ?

গিন্নি লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন বাবা—বিপিন।

বিপিন মাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই তার দুই চোখ দিয়া বড় বড় অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। গিন্নি তাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বসিলেন। বিপিন মার বুকে মুখ লুকাইয়া দারুণ অভিমানে ও দুঃখে শিশুর মতো কাঁদিতে লাগিল। গিন্নিরও অশ্রুধারা বিপিনের মাথায় শুভাশীর্ব্বাদ ও পরম সান্ত্বনার রূপে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ক্ষণেক ক্রন্দনের পর গিন্নি বলিলেন—বিপিন, কি ছেলে-মানুষী কর্‌ছিস্ বাবা। নিজেও কষ্ট পাচ্ছিস্, সকলকেই কষ্ট দিচ্ছিস্। তুই ত কখনো এমন ছিলিনে।

বিপিন বলিল—আর তোমাদের কষ্ট দেবো না মা, আমি এইবার জন্মের মতো যাচ্ছি।

—বালাই ষাট, বংশের দুলাল তুই, তুই কোথায় যাবি বাবা ? সবার আগে তোকেই যে আমি কোলে পেয়ে মা হয়েছিলাম ; সে কোল তুই ইচ্ছা করে স্বচ্ছন্দে ছেড়ে যেতে পার্‌বি ?

—কি কর্‌ব মা, তোমায় ছেড়ে আমি কখনো বেশিদিন কোথাও থাকিনি, তবু থাক্‌তে হবে। নিয়তি আমায় টান্‌ছে। বুক ভেঙে যাবে, তবু আমায় থাক্‌তে হবে।

—ছি বাবা, অমন কথা বল্‌তে নেই। আমায় ছেড়ে তুই কোথায় যাবি ?

—যেতেই হবে মা, বাবার হুকুম। আর থেকেও ত কোনো লাভ নেই, আমি ত পদে পদে তোমাদের জ্বালাতন করছি। আমি যে-অবধি এবার বাড়ীতে এসেছি সে-অবধি ত আমার জন্যে তোমাদের সুখ নেই।

আমার মত্ যখন তোমাদের মতের সঙ্গে শুধু বিরোধ বাধাতেই আছে, আমার দূর হওয়াই ভালো।

—বালাই বালাই ষাট ষাট! শত্রু দূর হোক! অকল্যাণ দূর হোক! তুই চিরজীবী হয়ে আমায় বিরক্ত কর্—তাইতেই আমার আনন্দ, তাইতেই আমার সুখ।

বিপিন এই স্নেহের কাছে পরাজয় স্বীকার করিতেছিল। কিন্তু তখনি তার মনে পড়িল এ বাড়ীতে মালতী আছে। তখন খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল—না মা, এ বাড়ীতে আমার আর থাকা হবে না, আমায় অন্যত্র যেতেই হবে।

গিন্নি পুত্রের দৃঢ়তায় স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন—বিপিন, তোর মুখ চেয়েই আমি পুত্রশোক ভুলেছিলাম। আমি কাঁদ্‌লেই তুই কাঁদ্‌তিস্ বোলে আমি প্রাণ খুলে কোনোদিন কাঁদিনি। আমায় কাঁদিয়ে যদি তুই যেতে পারিস্, যা। তুই যেখানেই থাক্ আমার আশীর্ব্বাদে তোর মঙ্গল হবে!··· তোর যদি মন খারাপ হয়ে থাকে ত কিছুদিন না হয় অন্যত্র গিয়ে থাক্; কিন্তু এই পোষমাসে বাড়ী থেকে কি বেরুতে আছে? লোকে কুকুর শেয়াল বাড়ীর বার করে না, ঝাঁটা কাড়ে না, আর তুই ঘরের ছেলে ঘর ছেড়ে যাবি?

—মা, যে নিজেই অলক্ষণ তার আবার লক্ষণ কোরে যাত্রার দরকার কি? আমি আর থাক্‌তে পার্‌ব না মা।

—যা খুসি কর্। তুই আমার পেটের ছেলে হলে কখনো আমায় এমন কোরে দুঃখ দিতে পার্‌তিস্‌নে।—বলিয়া গিন্নি পরিপূর্ণ বেদনায় চোখ মুছিতে মুছিতে প্রস্থান করিলেন। বিপিন একাকী বসিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে বাড়ীময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল বিপিন বিতাড়িত হইয়া

কলিকাতা যাইতেছে। পুরস্ত্রীগণ অজ্ঞাত আশঙ্কায় অসমাপ্ত কর্ম্ম ফেলিয়া স্তম্ভিত হইয়া মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতেছিল। গিন্নি যখন চোখ মুছিতে মুছিতে অসময়ে ঘরে গিয়া শয্যা আশ্রয় করিলেন, তখন খুড়িমা বিপিনের এবং রোহিণী মালতীর উদ্দেশে যাত্রা করিল।

খুড়িমা আসিয়া দেখিলেন বিপিন চুপ করিয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়া আছে। খুড়িমা বলিলেন—বাবা বিপিন, আমাদের ছেড়ে তুমি কোথায় যাবে বাবা ?

বিপিন ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—এখানে আর থাকা পোষাল না খুড়িমা।

—সে কি বাবা ? তোমার বাড়ী, তোমার ঘর, তোমার পোষাল না, একি একটা কথা ? তুমি গেলে আমরা কার ভরসায় থাক্‌ব ? আমাদের মতন হতভাগিনীদের কথা একবার ভাব্‌ছ না বাবা ?

—ভেবেছি খুড়িমা। আমি এসেই নানা গণ্ডগোল বাধিয়ে তুলেছি। আমি গেলেই সব আবার শান্ত হয়ে যাবে। যদি না হয় তবে তখন আমার কাছে যেয়ো। নিরাশ্রয় আমার আশ্রয় তোমাদের সুখে না রাখুক শান্তিতে রাখ্‌বে।

—কিন্তু বাবা, আমি শুধু নিজের স্বার্থের জন্যে বল্‌ছিনে। দিদির যে তুমি-অন্ত প্রাণ ! সৎমা এমন দেখিনি, দেখ্‌ব না !

—খুড়িমা, আমার মায়ের মন কি আমি জানি না। তবু যেতে হবে।

—থাকা কি এতই কঠিন বাবা ?

—হ্যাঁ খুড়িমা। বাবা বলেছেন হয় ঝিনুকপোঁতায় বিয়ে করতে হবে, নয় এবাড়ী থেকে যেতে হবে।

—ঝিনুকপোঁতায় বিয়ে করাটা কি এতই শক্ত বাবা ?

—হ্যাঁ খুড়িমা। যে কাজে মন প্রসন্ন হয়ে অগ্রসর না হয় সে কাজ করতে নেই। আমার বাপ-মায়ের জেদের জন্যে একটি শিশু বালিকার সর্ব্বনাশ করবার আমার কি অধিকার আছে ?

—বড়ঠাকুরকে একটু বুঝিয়ে বলো না, তোমার পছন্দ-মত পাত্রী সন্ধান করুন।

বিপিন হাসিয়া বলিল—সে হবার জো নেই খুড়িমা। আমার যেমন পছন্দ আছে, পাত্রীরও ত তেম্‌নি একটা পছন্দ আছে ? আমি তাকে পছন্দ করলেই যে সে আমাকে পছন্দ করবে তার ত কোনো মানে নেই। কাজেই ওসব চেষ্টা আমি ছেড়েই দিয়েছি।

খুড়িমা বলিলেন—মেয়েমানুষের আবার পছন্দ অপছন্দ কি ?

বিপিন হাসিয়া বলিল—এই জন্যেই ত বরাবর আমার সঙ্গে বিরোধ বেধে আস্‌ছে। তোমরা মেয়েমানুষকে মানুষ মনে করো না। কিন্তু তাদের ভালো মন্দ বিচার আছে, পছন্দ অপছন্দ আছে, প্রাণ আছে।

—কি জানি বাবা! তোমাদের মতন ত আমরা পণ্ডিত নই। যা ভালো বোঝো করো। তোমার মতন এমন ছেলেকে পছন্দ হবে না এমন মেয়েও কি বিশ্ব-বাংলায় আছে ? যে অনেক তপিস্যে করেছে সেই তোমার গলায় মালা দিতে পাবে!—বলিয়া খুড়িমা বিষণ্ণ মনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া প্রস্থান করিলেন।

পাশের ঘরে বসিয়া মালতী সব শুনিতেছিল।

এমন সময় রোহিণী আসিয়া দাঁত বাহির করিয়া চাপা গলায় বলিল—দিদিমণি, শুনেছে ? দাদাবাবু কল্‌কাতায় চোলে যাচ্ছে!

মালতী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চাহিয়া রূঢ়ভাবে বলিল—হাঁ শুনেছি! তা যাচ্ছেন ত আমার কি ?

রোহিণী গালে হাত দিয়া ন্যাকামির স্বরে বলিল—ওমা, এমন সুন্দর দাদাবাবু আমাদের, ঘরবাড়ী ছেড়ে চোলে যাচ্ছে, তাতে তোমার কষ্ট হচ্ছে না ?

মালতী দৃঢ়স্বরে বলিল—না। তোমাদের দাদাবাবু, আমার কে ? আমি তাঁকে বেশিদিন দেখেছি, না ভালো কোরে চিনি, যে, আমার কষ্ট হবে ? একটা মানুষ রাগ কোরে যাচ্ছে এই বোলেই একটু যা খারাপ লাগছে।

রোহিণী একেবারে হতাশ হইয়া মুষড়িয়া পড়িল। সে বড় আশা করিয়া আসিয়াছিল যে দেখিবে মালতী ফোঁস ফোঁস করিয়া কাঁদিতেছে, কাটা কই-মাছের মতো অ-শেষ বেদনায় ছটফট করিতেছে। কিন্তু তার কোনো লক্ষণ ত দেখিলই না, অধিকন্তু তার উল্টা ভাব দেখিয়া রোহিণীর এতকালের সব পোষা ধারণাগুলা যেন ওলটপালট হইয়া গেল। সে নিতান্ত অপ্রসন্ন মনে প্রস্থান করিল।

পাশের ঘরে যতই মোটমাটরি কষা হইতে লাগিল মালতীর মনের উপর ততই টান পড়িতে লাগিল। আজ সে পুনরায় নিজেকে নিরাশ্রয় মনে করিতে লাগিল। আর যে আর কিছুতেই অশ্রু রোধ করিয়া রাখা যায় না। সে ক্রমশ আসন্নবর্ষণ মেঘের মতন গম্ভীর থম্‌থমে হইয়া উঠিল। চড়া-বাঁধা সেতারের মতো তার সমস্ত হৃদয় বেদনায় ঝনঝন করিয়া উঠিতে লাগিল, কথা বলিতে গলা কাঁপিয়া যাইতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় যখন বিপিনের যাত্রার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিল তখন আর সে নিজেকে সম্বরণ করিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। অবশেষে সে কাঁদিয়া ফেলিল। সে যতই চক্ষু মুছিয়া আত্মসম্বরণ করিতে চেষ্টা করে অশ্রু ততই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

সন্ধ্যার সময় রোহিণী ঘরে প্রদীপ দিতে আসিল। মালতী তাড়াতাড়ি

চোখ মুছিয়া, অধর দংশন করিয়া বসিয়া রহিল। রোহিণী দেখিল মালতীর মুখখানি সন্ধ্যার পদ্মের মতো আলোহিত ম্লানিমায় ভরিয়া উঠিয়াছে; তার উপর প্রদীপের সোনালি আভা যেন অস্তসূর্য্যের করস্পর্শের মতো ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রোহিণীর নয়ন মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল, প্রদীপ দেখিতে সে ভুলিয়া গেল। খানিকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া তার অত্যন্ত করুণা বোধ হইল, সে সান্ত্বনার স্বরে বলিল—দিদিমণি, তুমি ভেবোনি, দাদাবাবুর হয়ত যাওয়া হবে না, রাণীমা রাজাবাবুকে বল্‌তে গেছেন।

মালতী আর নিজেকে সম্বরণ করিয়া রাখিতে পারিল না। সে উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। রোহিণীর সম্মুখে এই দুর্ব্বলতা প্রকাশ হইয়া পড়াতে সে যতই লজ্জা বোধ করিতে লাগিল ততই তার কান্না রোধ করা দায় হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন কাঁদিতে-কাঁদিতেই বলিল—পোড়ারমুখী তুই বেরো আমার সাম্‌নে থেকে। আমাকে তুই এমন কোরে কেন জ্বালাস্, কেন দগ্ধাস্? আমি তোর কি করেছি? আমি শুন্‌তে চাইতে চাইনে তোর দাদাবাবুর কথা! আমায় অপমান করিস্‌নে! তোর পায়ে পড়ি তুই যা! তুই যা!

রোহিণী অবাক হইয়া খানিকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া প্রদীপ রাখিয়া প্রস্থান করিল, সে বুঝিতেই পারিল না মালতীর এরূপ ব্যবহারের অর্থ কি? মালতীর এই কাণ্ড দেখিয়া তার হাসা উচিত, না, রাগ করা উচিত, না, কাঁদাই উচিত! এমন রহস্যময়ী জটিলচরিত্র নারী যে সে বাপের জন্মেও দেখে নাই ইহা সে অকপটেই স্বীকার করিল এবং ইহা তার সরলতা ও সত্যবাদিতার একমাত্র নিদর্শন বলিয়া বাড়ীর সকলেই তার কথায় বেশ জোরের সহিত সায় দিল।

মালতী যখন শুনিল যে বিপিনের যাওয়া সম্বন্ধে প্রতিবন্ধক ঘটিতেছে

এবং সকলেই তাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য অশেষবিধ চেষ্টা করিতেছে তখন তার অন্তরে একটি অস্বীকৃত আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। এবং আনন্দ-উল্লাসের অনুভব যখন ক্রমশ অস্বীকার করা অসম্ভব হইল তখন সে গলায় কাপড় দিয়া হাত জোড় করিয়া উর্দ্ধনেত্রে প্রার্থনা করিতে লাগিল—হে ঠাকুর, তাঁর যেন থাকা না হয়, তাঁর যেন থাকা না হয়। তাঁর মনে বল দাও, তিনি যেন বাধা অতিক্রম করতে পারেন। আমার কাছে থেকে তাঁকে দূরে নিয়ে যাও হে ঠাকুর!

এমন সময় হরিবিহারীর খড়মের পশ্চাতে গিন্নির বাঁকমলের শব্দ শোনা গেল।

গিন্নি পুত্রের নিকট পরাস্ত হইয়া স্বামীর কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি স্বামীকে বলিলেন—আমার বিপিনকে তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছ, আমি এই শূন্য পুরীতে কি কোরে থাকব? আমাকে সুদ্ধু পাঠিয়ে দাও।

হরিবিহারী বলিলেন—আরে ক্ষেপ্‌ছ কেন? বিপিন যাবে কোথায়? কোথাও যাবে না, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকোগে।

গিন্নি বলিলেন—তার মোট-মাট্‌রি বাঁধা হয়ে গেল, তুমি বল্‌ছ সে যাবে না! তুমি নিষ্ঠুর পাষাণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, কিন্তু মায়ের প্রাণ নিশ্চিন্ত হবে কি কোরে?

হরিবিহারী একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—চলো, আমি এক কথায় বিপিনের যাওয়া বন্ধ কোরে দিচ্ছি। সে আর যাবার নামটি করবে না।

গিন্নি আশ্বস্ত হইয়া স্বামীর সহিত পুত্রের কক্ষদ্বারে আসিলেন। তাঁর হৃদয় আনন্দের আশায় ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল। পুত্র পিতার কথায় প্রতিনিবৃত্ত হইলে মাতা পুত্রকে কি কি স্নেহের অনুযোগ করিবেন গিন্নি তাহাই উৎফুল্ল মনে চিন্তা করিতেছিলেন।

হরিবিহারী বলিলেন—বিপিন, আমার ওপর রাগ কোরে ত চোলে যাওয়া হচ্ছে, কিন্তু আমার জিনিষপত্রগুলির প্রতি ত যথেষ্ট অনুরাগ দেখ্ছি। ঘর-সর্ব্বস্বই ত বেঁধে জড়ো করেছ। আমার কোনো জিনিষ তুমি নিয়ে যেতে পার্‌বে না, বোলে দিচ্ছি।

বিপিন অবাক হইয়া পিতার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিল—বেশ, তাই হবে, আমি এক কাপড়েই যাব।

হরিবিহারী মনে করিয়াছিলেন তাঁর এই জমিদারী চালটি একেবারে অকাট্য, বিপিনকে জিনিষ লইয়া যাইতে বারণ করিলে বিপিন আর একপাও নড়িতে পারিবে না। কিন্তু বিপিনের দৃঢ়তা দেখিয়া তাঁর সে ভুল একেবারে ভাঙিয়া গেল। এর পর আর পুত্রকে ঘরে থাকিতে অনুনয় করাও চলে না। সুতরাং পুত্রের নিকট সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়া এবং গৃহিণীর তিরস্কৃত হইবার ভয়ে হরিবিহারী সেখান হইতে বিনা বাক্যব্যয়ে পলায়ন করিলেন।

গিন্নি তাড়াতাড়ি গিয়া বিপিনের হাত চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বিপিনও কাঁদিতে লাগিল। অনেকক্ষণ অশ্রুবর্ষণের পর গিন্নি বলিলেন—কর্ত্তার মতিচ্ছন্ন হয়েছে, কি বলেন কি করেন তার ঠিক নেই। তাড়াতাড়ি এলেন, আমি মনে কর্‌লাম সান্ত্বনা করতেই আস্‌ছেন। পোড়া কপাল ওঁর বুদ্ধির!······মাথা খাস্‌ বাবা রাগ করিস্‌নে। ও তোর বাপই ত, রাগের মাথায় যদি কিছু বোলে থাকে ত কিছু মনে করিস্‌নে। ওর হয়ে আমি তোর কাছে ঘাট মান্‌ছি!

বিপিন চোখ মুছিয়া বলিল—ওকি মা, ওতে আমার অকল্যাণ হবে। বাবা বলেছেন বোলে আমি রাগ কর্‌ছিনে; কিন্তু মা এ বাড়ীর কোনো জিনিষই আমি আর ব্যবহার কর্‌তে পার্‌ব না। স্নেহের দানে অযোগ্যকেও অধিকারী কোরে তোলে; শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সে

অযোগ্য অক্ষম, কিন্তু মায়ের অজস্র দান স্নেহে সহজ বোলে তার নিতে লজ্জা নেই ; কিন্তু কেউ যদি দেওয়ার অহঙ্কারেই দান করে তবে সে দান মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব কোরে তোলে—দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েরই।

—তা তুই পৈতৃক বিষয় ছেড়ে দিবি ?

—হলই বা মা পৈতৃক ? আর হলই বা তা বিষয় ? যেখানে স্নেহের সম্পর্ক দেনাপাওনার জমাখরচ কাটে সেখানে বিষয় বিষ হয়ে ওঠে। এ সম্পত্তিতে আমার আর অধিকার নেই। আমার অংশ আমি বিনিকে লেখাপড়া কোরে ছেড়ে দেবো !

—ছি বাবা, এসব কি পাগলামি করছিস। যা তুই কিছুদিন পশ্চিমে বেড়িয়ে আয়। পোষ মাস বোলে আমি আর আপত্তি করব না। তবে কি তুই কালই যাবি ? কি নিতে থুতে হবে বল্ জোগাড় কোরে দি।

—কালই যাব মা, কিন্তু জোগাড় কিছুই করতে হবে না। এক কাপড়েই যাব আমি। এ বাড়ীর কোনো জিনিষ আমার অস্পৃশ্য।

—আবার পাগলামি করে। আচ্ছা, তুই বাপের জিনিষ না নিস, আমার জিনিষ ত নিতে পারিস্। এ সমস্ত জিনিষ আমি তোকে আমার স্ত্রীধন থেকে দিয়েছি মনে কর্। আর তোরও ত নিজের যৌতুক-পাওয়া জমিদারী আছে।

—সে মা, আমি কিশোরের পাঠশালার জন্যে দান কোরে দিয়েছি।

—কি সর্ব্বনাশ ! তিন-তিনখানা তালুক পাঠশালায় দান। যা খুসি তোর করগে যা। তোকে অলক্ষ্মীতে পেয়েছে। আমরা কি করব, আপনার সর্ব্বনাশ যদি তুই আপনি ডেকে আনিস্।

পুত্রের এত বড় অর্বাচীনতায় গিন্নি বিস্মিত ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া হনহন করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

পদ্মা জিজ্ঞাসা করিল—কালই যাওয়া ঠিক হল ভাই ?

বিপিন বলিল—হাঁ পঞ্চাদা।

পঞ্চা আবার পোঁট্‌লাপুঁটলি বাঁধিতে ব্যস্ত হইল। বিপিন বলিল—ওসব আর তোর বাঁধাবাঁধি কর্‌তে হবে না পঞ্চাদা; আমার কিছুরই দর্‌কার নেই।

পঞ্চা বোচকা বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল—তোমার না দর্‌কার হতে পারে, কিন্তু আমার ত হবে।

বিপিন বলিল—না না, তোর যেতে হবে না। আমি একলাই যাব।

—আমার যেতে হবে কি হবে না, সেটা তোমার চেয়ে আমি বেশি জানি। তোমাকে এতবড়টা কর্‌লে কে? তোমার পঞ্চাদা যেদিন মর্‌বে সেদিনই তোমার কাছ ছাড়বে; তার আগে নয়।

বিপিন এই স্নেহশীল ভৃত্যকে স্নেহের দাবী অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

এমন সময় বিনি ঘরে আসিয়া বিপিনের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল—বল্‌দা, মা বল্‌থিল তুমি কল্‌কাতায় পালিয়ে দাখ। মা কাঁদতে, আমি দেতে দেবো না।

এই বলিয়া বিনি বিপিনের গলা জড়াইয়া ধরিল। বিপিনও তাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। শিশু বাহিরে দেখিয়া আসিয়াছে মা কাঁদিতেছে, এখানে আসিয়া দেখিল দাদা কাঁদিতেছে, সে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অপরিস্ফুট বেদনায় ভঁ্যা করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বিপিন চোখ মুছিয়া তাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। বালিকা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তার বুকের উপর ঘুমাইয়া পড়িল।

পাশের ঘরে উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া বসিয়া মালতী যখন শুনিল যে বিপিনের যাওয়া স্থগিত হইল না, তখন দুঃখ ও আনন্দের ঘাত-প্রতিঘাতে

তার হৃদয় ভাঙিয়া শতখান হইবার উপক্রম হইল। সে সমস্ত রাত কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ মুখ লাল করিয়া তুলিল। এখন তার কেবলই মনে হইতে লাগিল তার জন্যই বিপিন দেশত্যাগী হইতেছে।

সমস্ত রাত্রি দুর্ভাবনায় জাগিয়া থাকিয়া অতি প্রত্যূষে মালতী ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

তখনো দেবকন্যা ঊষা আসিয়া আকাশের আঙিনা হইতে সমস্ত রাতের ঝরা বাসি তারার ফুল ঝাঁট দিয়া সোনার ছড়া দেয় নাই। অন্দরের পুকুর-পাড়ের ষষ্ঠীপূজার অশ্বত্থ-গাছে সবে মাত্র বুলবুল দোয়েল শ্যামা জাগিয়া উঠিয়া ঝঙ্কার তুলিয়া প্রকৃতিকে জাগাইতেছিল; প্রকৃতি তখনো কোয়াসার চাদরে মুখ ঢাকা দিয়া নীরবে ঘুমাইতেছে; দীঘির শাদা জলের স্ফটিক মেঝের উপর লঘু চরণ ফেলিয়া বাতাস তখনো নাচিতে আরম্ভ করে নাই। সুবৃহৎ পুষ্করিণী যেন ঘন সবুজ রঙের একখানি প্রকাণ্ড ফ্রেমে-আঁটা বনদেবীর দর্পণের মতো পড়িয়া রহিয়াছে। বেগুনী রঙের আকাশ তখনো নিদ্রায় অচেতন, তার হৃৎস্পন্দন নাড়ীর গতি গ্রহতারকায় দপদপ করিতেছিল। পশ্চিম দিগন্তে কমলা রঙের পাল মেলিয়া চন্দ্র তখনো অস্ত-সাগরে পাড়ি দিতেছিল। কিন্তু তখনই বৃদ্ধ দুবেজী পুকুর-পাড়ের বাগানে পুষ্পচয়ন করিতে করিতে মধুর উদাত্ত স্বরে ভজন গাহিতেছিল—

আয় ইয়ার তুয়ে না যায় ভুল!
পাত পাতমে তু-ই রঙিলে,
তু-ই রঙিলে ফুল!

মালতী নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া শুনিতে লাগিল, বিপিন জাগ্রত হইয়া পাশের ঘরে যাত্রার উদ্যোগ করিতেছে। মালতী একপা একপা করিয়া বিপিনের ঘরের দিকে যায় আর থামে। অনেক ইতস্তত করিয়া মালতী

বিপিনের ঘরের দরজার সাম্‌নে গিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। বিপিন তাকে দেখিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

মালতী লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বলিল—আপনার যাওয়া কি একেবারে ঠিক?

বিপিন গম্ভীরভাবে বলিল—হাঁ।

—কবে ফির্‌বেন?

—এ বাড়ীতে আর আমার ফের্‌বার জো নেই। এই আমার অগস্ত্য-যাত্রা।

মালতী মাথা নীচু করিয়া মৃদুস্বরে বলিল—আমি আপনার সঙ্গে যাব।

বিপিন বিস্মিত হইয়া বলিল—তুমি কোথায় যাবে মালতী?

—যেখানে নিয়ে যাবেন।

বিপিন মালতীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়া তার হাত ধরিয়া বলিল—তবে কাল আমায় অমন কোরে দুঃখ দিলে কেন মালতী?

মালতী মৃদুস্বরে বলিল—পাছে আপনাকে আমার জন্যে মা-বাপকে ত্যাগ কর্‌তে হয়।

বিপিন বলিল—আজকে আমি সব ছেড়ে তবে তোমায় পেলাম! তোমার মূল্য এতদিন আমি বুঝিনি।

মালতী নত হইয়া বিপিনকে প্রণাম করিতে যাইতেছিল। বিপিন তাকে বাহু-বেষ্টনে তুলিয়া ধরিয়া ফুলের মতো তার মুখখানিতে চুম্বনের পর চুম্বন করিল। তখন লজ্জা আসিয়া মালতীর চোখ দুটি চাপিয়া ধরিল, যেন লজ্জাবতী লতা স্পর্শ পাইয়া ঢলিয়া পড়িল, যেন মুক্তাগর্ভ শুক্তি মুদ্রিত হইল, যেন অস্তরবির শেষ কিরণটি বুকে করিয়া কমলদল

বন্ধ হইল! উষার অরুণ রাগ তখন সমস্ত ঘরখানিকে নব-বিবাহের রক্তিমচ্ছটায় রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছিল; মালতীর হাসির মতো সেই লালিমা বিপিনের অন্তর-বাহিরের মতো সেই ঘরখানিকে বিবাহের রঙে রাঙাইয়া তুলিয়া বিপিনের অনির্ব্বচনীয় ভাবনায় বাসনায় সোনা মাখাইয়া দিতেছিল।

প্রণয়-বেদনার তাড়নায় উপযাচিকা হইয়া আপনাকে দান করার লজ্জায় মালতীর চেতনা আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। দুর্লভ প্রার্থিতকে পাইয়া বিপিনের আনন্দ তাকে বিমূঢ় করিয়া তুলিয়াছিল। হঠাৎ তাদের সুখের আবেশ ভাঙিয়া গেল—তারা দেখিল, গিন্নি ও খুড়িমা আসিয়া দরজার সাম্‌নে স্তম্ভিত হইয়া তাদের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

বিপিন মালতীর হাত ধরিয়া তাঁদের সম্মুখে প্রণাম করিল।

গিন্নি চীৎকার করিয়া বলিলেন—ছোট বৌ, এম্‌নি কোরেই কি শোধ তুল্‌তে হয়?

খুড়িমা সে কথায় কান না দিয়া বিপিনকে কঠোর স্বরে বলিলেন—বিপিন, তোমার ওপরে আমার বড় বিশ্বাস ছিল। তোমরা বাপে বেটায় মিলে আমর ধন মান দু-ই নষ্ট করলে!

বিপিন বলিল—খুড়িমা, তুমি আমায় ভুল বুঝো না, মালতী আমার স্ত্রী, মালতীকে আমি বিয়ে করব।

খুড়িমা গিন্নির দিকে ফিরিয়া বলিলেন—দিদি, বড়ঠাকুরকে বোলে আমায় কাশী পাঠিয়ে দাও, আমি আর এ বাড়ীতে থাক্‌ব না।

গিন্নি গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—মনস্কামনা সিদ্ধ হল, আর থাক্‌বে কেন?

দেখিতে দেখিতে বাড়ীর সকল লোক আসিয়া সেখানে ভিড় জমাইয়া

তুলিল। হরিবিহারী দ্রুতপদে আসিয়া বলিলেন—পাল্কী এসেছে, তোমরা সব এখনি দূর হও। তোমরা মনে করেছ এমনি ষড়যন্ত্র কোরে হরিবিহারী রায়কে জব্দ করবে? হরিবিহারী রায় জব্দ হবার পাত্র নয়। তোমরা শিগগির দূর হও।

সেই সময়ে প্রভু-পরিবারে বিপ্লবের সংবাদ না জানিয়া বৃদ্ধ দুবেজি তুলসীদাসের রামায়ণ পাঠ করিতেছিল—

প্রমুদিত পুরনরনারী সব সজহিঁ সুমঙ্গলচার।
এক পবিসহিঁ এক নির্গমহিঁ ভীর ভূপদরবার॥

হরিবিহারী দ্রুতপদে সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

—মা, এ বাড়ীতে থাকার মেয়াদ ফুরিয়েছে। তবে আমরা যাই।—বলিয়া বিপিন মালতীকে লইয়া গিন্নিকে আবার প্রণাম করিল। পরে খুড়িমাও প্রণাম করিয়া সরোদনে বলিলেন—দিদি, আমি জন্মের মতো তোমার চরণ ছেড়ে যাচ্ছি, আমার জন্যে তোমাকে অনেক দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে; জেনে হোক না জেনে হোক, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, তোমার কাছে যে অপরাধ করেছি তা মার্জ্জনা কোরে আমায় বিদায় দাও।

গিন্নি সে কথায় কোনো জবাব না দিয়া জনান্তিকে ধনুষ্টঙ্কারের মতো বাজিয়া বলিলেন—আমার যে সর্ব্বনাশ কোরে যাচ্ছে তারও যেন ভালো না হয়, ইহপরকাল নষ্ট হয়। ভগবান আছেন।

খুড়িমা বলিলেন—হাঁ দিদি ভগবান আছেন। আমি যদি কখনো তোমার অনিষ্টকামনা কোরে থাকি তবে আমার ইহকাল ত নেই-ই, পরকালেও যেন অশেষ দুর্গতি হয়,—এ কথা আমি তীর্থে যাত্রা কোরে তীর্থের দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্‌ছি, বাবা বিশ্বেশ্বর যেন আমায় চরণে স্থান না দেন।

গিন্নি আর কোনো কথাই বলিলেন না। পুত্রের আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় মাতার চক্ষু অশ্রুসিক্তও হইল না, একটি নিষেধ-বাণীও উচ্চারিত হইল না—পুত্রের বারবার বিদ্রোহাচরণে মাতার মনও এমনি প্রতিকূল হইয়া উঠিয়াছিল। বিধবার বিয়ে! এতবড় অনাচার কেউ কখনো দেখে নাই শুনে নাই। আজ চোখের সামনে তাই প্রত্যক্ষ দেখিয়া বাড়ী-সুদ্ধ সকলে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল।

এমন সময় বিনি আসিয়া মালতীর হাত ধরিয়া তার কচি মুখখানি তুলিয়া আদরের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—মাতীদি, তোল বিয়ে? বল্‌দার ছঙ্গে তুই ছুছুল বালী দাচ্ছিস? আমিও তোল ছঙ্গে ছুছুলবালী দাবো! —ঘাড় কাত করিয়া সে মালতীর সম্মতির অপেক্ষা করিতে লাগিল। মালতী তাকে কোলে তুলিয়া অশ্রুসিক্ত চুম্বন করিল।

বিনোদ লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া—মালতীদি, তুমি আমার বৌদি! আমি বৌদির মিতবর!—বলিয়া বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে মালতী ও বিপিনকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল।

হায়! শিশুরা জানে না যে বিবাহ আনন্দের দ্বারা অভিনন্দিত নহে, ইহা দুঃখের দ্বারা অভিশপ্ত। এ বিবাহে মঙ্গলশঙ্খ বাজিল না, পুরাঙ্গনারা হুলুধ্বনি করিয়া বরবধূকে সম্বর্দ্ধনা করিল না, কেউ আশীর্ব্বাদ করিয়া বরবধূকে বরণ করিল না। কিন্তু তবু ইহা বিবাহ।

পাল্কীর কাছে আসিয়া মালতী বিনিকে নামাইয়া পাল্কীতে উঠিল। বিনিও ছুটিয়া পাল্কীতে চড়িতে যাইতেছিল, রোহিণী ধরিয়া কোলে তুলিল। বিনোদকে হাবার মা গ্রেপ্তার করিল। বিনি বিনোদ দাসীদের কোলে বন্দী হইয়া মুক্ত হইবার জন্য ছটফট করিতে করিতে চীৎকার করিতে লাগিল—আমি যাব! আমি যাব! দাদার বিয়ে দেখতে আমি যাব!

মালতী ও খুড়িমা পাল্কীতে চড়িয়াছেন। বিপিন হাতীতে চড়িবে; এমন সময় নবকিশোর আসিয়া বলিল—বিপিন, ঠিক সময়ে এসে জুটে গেছি। চলো।

তারা যাত্রা করিল। এই দুপ্রহর সময়ে পৌষ মাসে অভুক্ত অবস্থায় তারা বাড়ী হইতে বিদায় লইল, কিন্তু এদের মুখের দিকে চাহিয়া, বা গৃহস্থের অকল্যাণের ভয়ে কেউই এদের আহার করিয়া যাইতেও অনুরোধ করিল না। তারা শূন্য উদর ও ভরা দুঃখ লইয়া যাত্রা করিল। তারা সকলেই নির্ব্বাক নিস্পন্দ। তখন সমস্ত প্রকৃতি মধ্যাহ্নবিশ্রামে স্তব্ধ। শুধু বিনোদ আর বিনির তীক্ষ্ণ চীৎকারধ্বনি বিবাহ-উৎসবের সানাইয়ের শব্দের মতন দুর হইতে ভাসিয়া আসিতেছিল। ক্রমে তাহাও ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া স্বজন-সম্পর্কের ক্ষীণ স্মৃতিটির মতন মিলাইয়া গেল। তখন বিপিন ও মালতী ভাবিতেছিল—এই আমাদের বিবাহ! কী ভীষণ সকরুণ এই উৎসব!

৩২

রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিয়া বিপিন খুড়িমাকে বলিল—খুড়িমা, আমাদের সঙ্গে তুমিও কল্‌কাতা চলো। আমাদের ঘরকন্না গুছিয়ে আমাদের স্থিতি কোরে দিয়ে তারপর কাশী যেও।

খুড়িমা রূঢ় স্বরে বলিলেন—সংসারে আর আমি থাক্‌ছিনে। কাশী না গিয়ে আমি জলগ্রহণ করব না।

নবকিশোর বলিল—তবে খুড়িমা ওপারের প্লাট্‌ফর্ম্মে চলো; কাশীর গাড়ী আস্‌বার সময় হয়েছে।

খুড়িমা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিপিন ও মালতী তাঁকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইল।

এই বিদায়ের ক্ষণে খুড়িমার সকল কঠোরতা চোখের জলে ভাসিয়া

গেল। তিনি বিপিন ও মালতীর চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন; তারপর বিপিনের হাতে মালতীর হাত রাখিয়া চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে বলিলেন—আমার মান ইজ্জত, আমার সর্ব্বস্ব তোমার হাতে দিয়ে গেলাম বাবা; তুমি তার মর্য্যাদা রেখো।

বিপিন ও মালতীর চক্ষুও শুষ্ক রহিল না। বিপিন বলিল—খুড়িমা, মা ত আমাদের আশীর্ব্বাদ করলেন না; তুমিও আমাদের ছেড়ে যাবার সময় আশীর্ব্বাদ কোরে যাবে না?

খুড়িমা ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—আশীর্ব্বাদ করছি আমি যেমন দুঃখ পেয়েছি তোমরা তেমনি সুখী হয়ো।

খুড়িমা আর কিছু বলিতে পারিলেন না; কাঁদিতে কাঁদিতে নবকিশোরের সহিত প্রস্থান করিলেন। বিপিন ও মালতী স্তম্ভিত হইয়া খুড়িমার এই অভিসম্পাতের মতন ভীষণ আশীর্ব্বাদের কথা ভাবিতে লাগিল।

৩৩

বিপিন ও মালতী কলিকাতায় আসিয়া তারকের বাড়ীতে উঠিয়াছে। নবকিশোরের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। এখানে মালতী পরের অন্তঃপুরে আছে, সেখানে গিয়া বিপিন তার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেছে না, নবকিশোরও কাছে নাই। তার মনে একটি শান্তিময় ঘরের অতীত স্মৃতি ও একটি সম্ভবপর ঘরের সুখময় কল্পনা থাকিয়া থাকিয়া কেবলি আঘাত দিতেছে, তাকে ব্যাকুল ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। এ অবস্থায় মালতী ও নবকিশোর উভয়েরই সঙ্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া বিপিনের কিছুই ভালো লাগিতেছে না। তার উপর সমস্তদিন তারকের সহিত তর্ক করিয়া করিয়া তার মন ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল। তারক তার প্রাণপণ চেষ্টায় বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিল যে বিধবা-বিবাহ আমাদের দেশের জিনিব নয়,—ইহা বিলাতী আমদানি। যে দেশে বিধবার চরম

আদর্শ পুড়িয়া মরা, যে দেশে বিধবা মানে পুণ্যশীলা ব্রহ্মচারিণী, সে দেশে এরূপ অনাচার ব্যভিচারেরই নামান্তর।

বিপিন বিরক্ত ও লজ্জিত হইয়া একদিন তাকে বলিল—মাপ কোরো ভাই, আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করছিনে, তর্কটা তোমার কিশোরের জন্যেই তোলা থাক্, তার সঙ্গেই তোমার বনবে ভালো। আমি শুধু বলতে চাই কি, তোমরা শুধু স্ত্রীলোকের বেলাই এতটা কঠিন নজর রাখো কেন? আর পুরুষের বেলাই বা রাখো না কেন? পুরুষের চৌদ্দটা বিয়ে করলেও দোষ নেই, আর যত দোষ বিধবার বেলা!

তর্কের সুযোগ পাইয়া তারক পরম উৎসাহিত হইয়া উঠিল। সোজা হইয়া বসিয়া বলিল—পুরুষ আর স্ত্রী সমান হল? প্রকৃতিই যে তাদের ভিন্ন ছাঁচে গড়েছে। যে নারী সন্তানের জননী হবে, তার কি একনিষ্ঠতা আবশ্যক নয়?

—মানি। কিন্তু বিধবা যে, তার বিবাহ হলে একনিষ্ঠতা নষ্ট হয় না। বিশেষত যে বিধবা কুমারীরই সমান আপনার সমস্ত প্রাণের অনিবেদিত ভালোবাসার অর্ঘ্য সাজিয়ে সার্থকতার জন্যে একজন কারুর অপেক্ষা কোরে আছে, তার বেলাও কি ঐ ব্যবস্থা?

—হাঁ নিশ্চয়। প্রকৃতির নিয়ম কখনো কি স্বতন্ত্র লোকের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন রকমের হতে পারে। নিয়ম নিয়মই। ওরকম লোককে সেই নিয়মের অনুকূল কোরে নিজেকে গোড়ে তুলতে হবে। সে দুর্ব্বল বোলে ত আদর্শ খাটো হতে পারে না। আদর্শ চিরকালই উচ্চ; মানুষের মন চিরকালই খাটো; তাকে সংগ্রাম কোরে সেই উচ্চ স্থানে পৌঁছুতে হবে; এইতেই ত তার গৌরব।

—এ ত প্রকৃতির নিয়ম নয়; এ যে সমাজের শাসন। সকলকেই

জোর কোরে আদর্শে পৌঁছে দিতে গেলে কি ফল হয় তা ত সমাজের মধ্যে আমরা নিত্যই দেখ্‌ছি। তার ওপর, মনে করো, যারা অসহায় নিরাশ্রয়, যাদের ভালো থাক্‌বার ইচ্ছা আছে কিন্তু সুবিধা নেই, তাদের উপায় ?

তারক জোর দিয়া বলিল—নিরাশ্রয় হলেই নিরুপায় হবে তার কি মানে আছে। আমাদের দেশের সন্ন্যাসিনীরা কি ? একেবারে নিরাশ্রয়, কিন্তু কত বড় সব সাধ্বী ! তোমায় দেখাব আমি দেখাব, প্রত্যক্ষ দেখাব, বিধবা সাধ্বী সন্ন্যাসিনী কাকে বলে।···শুনেছ ত শ্রীশ্রীপ্রেমানন্দ স্বামীর নাম। সাক্ষাৎ দেবতা ! শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতার ! নিয়ে যাব তোমাকে আজই দর্শন করাতে। দেখ্‌বে দেখ্‌বে তিনি নরনারীর কি চমৎকার আদর্শ প্রচার কর্‌ছেন। তিনি আমার গুরুজী।

এই বলিয়া তারক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তার মাংসশূন্য কঙ্কালসার হাত দুটি জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইল। গুরুজীর স্মরণে বিভোর হইয়া তার তর্ক থামিয়া গেল।

তারক বলিল—গুরুজীকে দর্শন কর্‌তে যাবে ?

বিপিন জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় তিনি থাকেন ?

—তাঁর আশ্রম এখন খড়দহে। গঙ্গার ধারেই আশ্রম, নামেও আনন্দাশ্রম কাজেও আনন্দাশ্রম, কি মনোরম পবিত্র সে স্থান। গেলেই ইচ্ছে করে সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়ে গুরুজীর চরণতলে পোড়ে থাকি।

বিপিন হাসিয়া বলিল—এ রকম মনের অবস্থা যখন হয় তখন ত সে-রকম জায়গায় যাওয়া ঠিক উচিত হবে না।

তারক গম্ভীরভাবে বলিল—সংসারের মায়া কি অত শিগগির কাটে হে ভায়া। মুক্তির পথ অত সহজ নয়। শ্রীগুরুর বিশেষ কৃপা না হলে তাঁর চরণে আশ্রয় মেলে না।

বিপিন হাসিয়া বলিল—যদি তাঁর এই অধমের প্রতি বিশেষ কৃপাই হয়ে পড়ে, তখন ?

—সে সৌভাগ্য তোমার হবে না, ভয় নেই।

—ঠিক বল্‌ছ ত হবে না ! হলে কিন্তু তুমি তার জন্যে দায়ী !

—হাঁ হাঁ, এখন চলো।—বলিয়া তারক বিপিনের হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল।

বিপিন হাসিতে হাসিতে প্রস্তুত হইয়া তারকের গুরুজীকে দেখিতে যাত্রা করিল। তারকের তর্ক খোঁচা দিয়া দিয়া বিপিনের আবাল্যের সমস্ত সংস্কারকে উস্কাইয়া তুলিয়া তাকে বড় দ্বিধার মধ্যে ফেলিতেছিল। সে নিজের বিক্ষিপ্ত মনটাকে নূতন দৃশ্য দেখিয়া গুছাইয়া লইবার জন্য সানন্দেই তারকের আহ্বান স্বীকার করিল।

৩৪

আহিরীটোলা ঘাট হইতে একখানি পান্সি ভাড়া করিয়া তারক ও বিপিন খড়দহে আনন্দাশ্রমের ঘাটে আসিয়া নামিল। প্রশস্ত ঘাটটি আগাগোড়া মার্ব্বেল পাথর দিয়া বাঁধানো। জলের তল পর্য্যন্ত সোপান-শ্রেণী নামিয়া গিয়াছে। বরফের মতো শুভ্র সুন্দর ঘাটের শিলায় গঙ্গার জল ছলছল তরতর করিয়া খেলা করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। সোপান বাহিয়া উপরে উঠিয়াই বিপিন দেখিল একটি চমৎকার সুরম্য সুসজ্জিত পরিষ্কার পরিপাটী প্রকাণ্ড উদ্যান। কোথাও কদম্বকুঞ্জ কোথাও বকুলবীথি, কোথাও কুরবকের কেয়ারি; মাঝে মাঝে গোলাপ বেলা মল্লিকা মালতী সুরভিপুষ্পের ক্ষেত; কেয়াফুলের বেড়া; এক-প্রান্তে একটি লতাবিতান, তার প্রবেশপথে একটি মার্ব্বেলের খিলান, তার মাথায় সোনালি পাথর বসাইয়া লেখা আছে—কেলিকুঞ্জ ! মাঝে মাঝে

শস্যক্ষেত্র চোখের উপর মাধুর্য্যের শ্যাম-অঞ্জন বুলাইয়া দিতেছে। পায়ে ঝাঁঝ আর গলায় ঘুঙুর পরিয়া দুটি হরিণ চঞ্চল হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে; তালতমাল-কুঞ্জের তলায় তলায় গুটিকয়েক ময়ূর চরিয়া বেড়াইতেছে; শান্ত নীরব আশ্রয়-বাটিকাটি কত শত পক্ষীর আনন্দসঙ্গীতে থাকিয়া থাকিয়া ঝঙ্কৃত মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। স্থানে স্থানে শ্বেতপাথরের চৌবাচ্চার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া বিচিত্র ভঙ্গীতে ফোয়ারার উচ্ছ্বসিত ধারা হীরার শতনরী হারের মতো উৎসারিত হইতেছে। এত বড় বাগানের কোথাও অনাবশ্যক ঘাস জন্মে নাই, কোথাও একটি শুষ্কপত্র পড়িয়া নাই, যেন একখানি নিরুপম চিত্রপট। এই বিস্তৃত উদ্যানের মধ্যস্থলে একখানি ছবির মতো বাড়ী, আগাগোড়া আইভিলতায় ঢাকা; এই বাড়ীটিও প্রকাণ্ড। বাড়ীর তোরণে লেখা আছে গোলোকধাম। বাড়ীর প্রবেশপথেই একটি ঘর আছে, সেখানে জুতা রাখিয়া যাইতে হয়। জুতা রাখার ঘরের পাশেই একটি জলের চৌবাচ্চা, একটি পাথরের মাছের মুখবিবর দিয়া জল নির্গত হইয়া পড়ে; তার উপরে সোনালি পাথরে লেখা—বৈতরণী। বাড়ীতে আরও অনেক চৌবাচ্চা আছে; তাহা হইতে জল বাহির হইবার নালি কোনোটি বা গোমুখী, কোনোটি বা মকরমুখী, কোনোটি বা শতধারা; কোনোটির নাম ভোগবতী, কোনোটির নাম মন্দাকিনী, কোনোটির নাম অলকনন্দা।

বিপিন ও তারক জুতা খুলিয়া, বৈতরণীতে পা ধুইয়া অট্টালিকায় প্রবেশ করিল। অট্টালিকার মেঝে পর্য্যায়ক্রমে শ্বেত ও কৃষ্ণ মর্ম্মরে মণ্ডিত, তাতে মধ্যে মধ্যে শতদল পদ্মের আকার হইয়াছে; স্তম্ভগুলি বিচিত্র বর্ণের মার্বেলের; কড়িকাঠ হইতে বিচিত্র সুন্দর আলোর ঝাড় লণ্ঠন বেল ঝুলিতেছে। কক্ষে কক্ষে গৈরিকধারী শিষ্যমণ্ডলী ধর্ম্মগ্রন্থ

পাঠে রত! কেউ পীড়িতের সেবা করিতেছে। কেউ কেউ বা ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনা করিতেছে, কিন্তু তাহা উদ্ধতভাবে তর্ক করিয়া নয়, শান্তভাবে ধীরস্বরে।

বিপিন ও তারক মর্ম্মর সোপান বাহিয়া দ্বিতলে উঠিল। দ্বিতলের একাংশে ঠাকুরঘর, ঠাকুরঘরটি গঙ্গার দিকে। বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া গঙ্গার উন্মুক্ত বক্ষ চমৎকার দেখা যায়। ঠাকুরঘরের সম্মুখে লেখা আছে—বৈকুণ্ঠ! ভিতরে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ, নাম রাধাকান্ত! কয়েকজন শিষ্যা ঠাকুরের পূজা আরতি ভোগের আয়োজন করিতেছে, তারাও নীরব অথচ প্রসন্ন। তারক বিগ্রহকে প্রণাম করিল, বিপিনও দেখা-দেখি করিল, সে এই শান্ত নীরব সুন্দর আশ্রমে আপনার বিরোধকে বড় করিয়া রাখিতে পারিল না।

সেখান হইতে তারক বিপিনকে গুরুসন্দর্শনে লইয়া চলিল! একে গুরু তায় সন্ন্যাসী, তাঁর গৃহে সকলেরই অবাধ গতি; এজন্য এ গৃহের কোনো দ্বারে অর্গল পর্য্যন্ত নাই।

বিপিন গিয়া দেখিল একটি প্রশস্ত কক্ষ; বহুমূল্য পুরু নরম গালিচায় একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত ঢাকা। ছাদ হইতে বিবিধবর্ণের সুন্দর সুন্দর বেলোয়ারি ঝাড় প্রলম্বিত; দেয়ালে বিচিত্র পুষ্পপত্র অঙ্কিত, তার মাঝে মাঝে দেশী বিদেশী পুরাণের চিত্র—গোপালজননী যশোদার পাশে যিশুজননী মেরীর ছবি, মহাভারত রামায়ণ পুরাণের দৃশ্যের পাশে পাশে য়ুরোপীয় শিল্পগুরুগণের অঙ্কিত চিত্র সজ্জিত রহিয়াছে। ছবির উপরে দেয়ালের গায়ে বিচিত্র ছাঁদের লেখায় ইংরেজি সংস্কৃত ফার্সী বচন চিত্রিত। ঘরের একপ্রান্তে একখানি প্রকাণ্ড মেহগিনি কাঠের সুন্দর খাট; তার শয্যা মশারি সমস্তই রেশমী; দরজায় দরজায় চওড়া হাশিয়াদার শালের পর্দ্দা; পাশের ঘরে একটি সুবৃহৎ লাইব্রেরী

বিভিন্ন ভাষার পুস্তক ও হস্তলিপির পুঁথির সুশৃঙ্খল সন্নিবেশে সম্পদশালী। ঘরের মধ্যস্থলে আর-একখানি ছোট কার্পেটের উপর বসিয়া আছেন গুরুজী ; আর তাঁর সম্মুখে কতিপয় আগন্তুক।

আগন্তুকদের মধ্যে কেউ শোকাতুর, কেউ জগতের কৃতঘ্ন আচরণে আহত, কেউ দরিদ্র,—তারা সান্ত্বনার সন্ধানে এখানে আসিয়াছে। কেউ বা আত্মা, ইহকাল পরকাল, পুনর্জন্ম প্রেততত্ত্ব প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় বিষয়ের মীমাংসা করিতে আসিয়াছে। গুরুজী হাসিয়া হাসিয়া সকলের সহিতই শান্ত ধীরভাবে আলোচনা করিতেছেন। কত লোক কত অদ্ভুত প্রশ্ন করিতেছে তবু তাঁর বিরক্তি নাই। তাঁর বদনমণ্ডল সর্ব্বদাই প্রসন্ন, হাস্যদীপ্ত।

গুরুজীর বয়স চল্লিশের নীচেই। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, সুকোমল সুশ্রী শান্ত মূর্ত্তি। চুল দাড়ি গোঁফ কামানো, মুখে মেয়েলি ভাবের উজ্জ্বল লাবণ্য। গায়ে একটি রেশমী গেরুয়া রঙের আল্‌খেল্লা, মাথায় একটি রেশমী গেরুয়া পাগ্‌ড়ী। গুরুজীর চোখদুটি চমৎকার সুন্দর বুদ্ধিতে ঝল্‌মল করিতেছে, তাঁর অন্তরের দর্পণের মতো প্রশান্ত নির্ম্মল ; মুখখানি সংযমনিষ্ঠার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত, দৃঢ়তা-মাখানো অথচ সদাই হাস্যমধুর। এই অপরূপ পুরুষকে দেখিয়া বিপিন মনে মনে বলিল—হাঁ মানুষ বটে! গুরু হবার উপযুক্ত! শ্রদ্ধা সম্ভ্রম ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া বিপিন প্রণাম করিয়া এক পার্শ্বে বসিল।

এত সব বিলাসসজ্জা বিপিনের মনে কিছুমাত্র দ্বিধা উদ্বোধিত করিল না। তার মনে হইতে লাগিল এই অদ্ভুত পুরুষের চারিদিকে এইরূপ সৌন্দর্য্য সম্পদের সমাবেশ না হইলে যেন ঠিক মানাইত না।

গুরুজী স্মিতহাস্যে মাথা নত করিয়া তাদের অভ্যর্থনা করিলেন এবং হাসিমুখে তারককে জিজ্ঞাসা করিলেন—কিহে সংসারানন্দ! ইনি?

তারক কৃতাঞ্জলিপুটে পরম বিনয়ের সঙ্গে বলিল—উনি আমার একটি বন্ধু। নাম বিপিন বিহারী রায় চৌধুরী। উনি এম-এ পাশ। আপনাকে দর্শন করতে এসেছেন।

গুরুজী হাসিয়া বলিলেন—আমি এম-এ ওয়ালাদের বড় ডরাই, তাঁরা শুধু তর্ক করতেই আসেন। বিপিনবাবু, আপনাকে আগেই বোলে রাখি, এঁরা সবাই আপনাকে বলবেন যে আমি একটা মস্ত রকমের অবতার, বরাহ কূর্ম্ম দলের, চাইকি আমি স্বয়ং ভগবানই! তবে আমি সে কথা যে অস্বীকার করি সে হচ্ছে আমার লীলা!...এসব কথা আপনি কিছু বিশ্বাস করবেন না; আমি আপনাদের মতনই একজন অতি সাধারণ মানুষ, পাপে পুণ্যে লালসা বৈরাগ্যে জড়ানো অতি সাধারণ।... তবে প্রত্যেক মানুষেরই চিন্তাপ্রণালীর একটা স্বাতন্ত্র্য আছে; আমার যেটা সত্য ও মঙ্গল বোলে দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছে, তাই আমি লোককে বলি, কেউ বা সে মত গ্রহণ করে, কেউ বা করে না! মহাপ্রভু ঈশা বলেছেন—You shall know the truth and the truth shall make you free. এ সত্য, কি রকম সত্য? সে কথাও মহাপ্রভু ঈশা স্পষ্ট কোরেই বোলে গেছেন—Then shall ye know, that I do nothing of myself; but as my Father hath taught me, I speak these things. And He that sent me is with me; the Father hath not left me alone. এই বোধের যে ভরপূর আনন্দ, যে আনন্দে আমার অন্তর ফুলে ফুলে ওঠে, তা আমি নিজে সম্ভোগ করতে না পেরে আমার ভাই-ভগিনীদের বণ্টন কোরে দি। এই অপার আনন্দ প্রচার করা ভিন্ন আমার জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। আমি সংসারত্যাগী নই, আমি ঘোর কৃপণ সংসারী! এই বুঝে তর্ক করবেন।

গুরুজীর চোখ দুটি উজ্জ্বল হইয়া হাসিতে লাগিল। বিপিন জন্মে এমন মোহন চরিত্রদ্যোতক মুখভাব দেখে নাই; মুখের প্রত্যেকটি রেখা যেন তাঁর চিত্তের গভীর জ্ঞান, মনের সরলতা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, চরিত্রের দৃঢ়তা ডাকিয়া ডাকিয়া বলিয়া দিতেছিল। বিপিন একেবারে মুগ্ধ হইয়া বলিল—প্রভু, আমি মূর্খ! কতকগুলো কেতাব পড়ার ছাপ বিশ্ববিদ্যালয় আমার নামের গায়ে মেরে দিয়েছে মাত্র। জ্ঞান আমার কিছুমাত্র হয়নি। আমি তর্ক করতে আসিনি, শিষ্যের মতো জিজ্ঞাসু হয়ে এসেছি। আমাকে অনুগ্রহ কোরে বলে দিন, মানুষের কর্ত্তব্য কি, ধর্ম্ম কি, কি ব্রত পালন করলে আমি প্রকৃত মানুষ হতে পারব!···আর দয়া কোরে আপনি আমাকে 'আপনি' বোলে সম্বোধন করবেন না।

গুরুজী হাসিয়া হাসিয়া মানুষের ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ভাষার সে কী প্রচণ্ড শক্তি, কী ওজস্বী প্রকাশ; বলিবার সে কী অপূর্ব্ব মনোহর ভঙ্গী; স্বরের কী গম্ভীর মাধুর্য্য; জটিল কথাকে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া সরল করিবার সে কী চমৎকার নিপুণতা! কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা সঙ্গীতের মতো সুমধুর একটি তাললয়ছন্দে গাঁথা, সুরে অনুপ্রাণিত, হাসির মতো স্বচ্ছ মনোহর। বিপিন মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছিল, আবিষ্টের মতো শুনিতেছিল। গুরু কি বলিতেছেন সে ভালো করিয়া শুনিতে পারিতেছিল না, বুঝিতে পারিতেছিল না, শুনিতেছিল শুধু তাঁর বাক্যের প্রবল প্রবাহের ঝঙ্কৃত সঙ্গীত, দেখিতেছিল শুধু তাঁর অপরূপ সুন্দর হাস্যোজ্জ্বল প্রফুল্ল মূর্ত্তি!

আরতি আরম্ভের শঙ্খধ্বনি হইল। গুরু নীরব হইলেন। সকলকে লইয়া তিনি রাধাকান্তের আরতি দেখিতে গেলেন। বিপিনের চোখের সামনে আরতির পঞ্চপ্রদীপের আলো যেন গুরুর চোখের আলোর

কাছে ম্লান বোধ হইতে লাগিল। আলোকে গন্ধে আনন্দে আরতি হইয়া গেল। স্বামীজী তখন যুক্তকরে ঊর্দ্ধনেত্রে পরম পুলকিত ভাবে গান ধরিলেন—

"তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হত যে মিছে।"

বিপিন তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিল সে স্বর কি তীক্ষ্ণ, কি মধুর! ছন্দে ছন্দে পর্দ্দায় পর্দ্দায় ভাবের হিল্লোলে সুর তরঙ্গিত হইতেছিল—সে সুর কোথাও আপনার সৌভাগ্যগর্ব্বে পুলকিত, কোথাও বেদনায় আপ্লুত, কোথাও মিনতিতে একেবারে বিগলিত! সঙ্গীতরসধারা মন্দির ছাপাইয়া অট্টালিকা ভেদ করিয়া আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া পড়িতেছিল, গঙ্গা সেই সন্ধ্যারতির বন্দনা-গানে তাল দিয়া তেমনি হিল্লোলে গলিয়া পড়িয়া যুগল সম্মিলনে ছুটিতেছিল।

স্বামীজী গান সমাপ্ত করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তাঁর সঙ্গে সকলেই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। বিপিনের মনে হইতেছিল এ প্রণাম যেন যথেষ্ট প্রণাম হইল না, সমস্ত হৃদয় লুটাইয়া দিলে যেন ঠিক হয়। তারপর গুরুজী নিজের হাতে সকলকে প্রসাদ পরিবেষণ করিলেন, ভাবপ্রবণ বিপিন ভক্তিতে একেবারে গলিয়া অশ্রুজলে পরিণত হইবার মত হইতে লাগিল।

স্বপ্নাবিষ্টের মতন তাকে তারক একরকম টানিয়া আনিয়া বাড়ীতে ফেলিল। সে বাড়ীতে আসিয়া মনে করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল গুরুজী কি বলিয়াছেন। স্বপ্নভঙ্গের পর কিছুই যেমন স্পষ্ট মনে হয় না, সমস্ত ব্যাপারটা আব্ছায়া রকমে অনুভবেই থাকে,

স্মৃতিতে ফুটিয়া ওঠে না, চেষ্টা করিয়া তাহা স্মরণ করিলেও সঞ্চরমান চিত্রের মতো পশ্চাতের দৃশ্য যখন উপস্থিত হয় পূর্ব্বের দৃশ্য তখন অন্তর্হিত, বিপিনের তেমনি কিছুই বেশ একটি ধারাবাহিক শৃঙ্খলায় স্মরণ হইতেছিল না, টুক্‌রা টুক্‌রা তালি জুড়িয়া সে এইটুকু বুঝিল যে স্বামীজী বলিয়াছিলেন—বৈরাগ্যমূলক প্রেমই ধর্ম্ম। মানুষ নিজেকে কোনো বিশেষ দেশকালের মধ্যে সঙ্কীর্ণ করিয়া দেখিবে না, সে আপনাকে বিশ্বাসী মনে করিবে, অতীত অনাগত সকল কালের সকল লোকের সহিত প্রেমযোগ স্থাপন করিলেই ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণতা নষ্ট হইয়া শান্ত বৈরাগ্য হৃদয় পরিপূর্ণ করিবে। মানুষে মানুষে ভেদ নাই,—সকল জাতি সকল বর্ণ সেই এক অদ্বিতীয় পরমপুরুষেরই বিচিত্র প্রকাশ। অহঙ্কার এই মোহ উৎপাদন করে, প্রবৃত্তিই এই ভেদ সংঘটিত করায়; নারী স্বর্গীয় জিনিষ, ইঁহাদিগকে পূজা করিতে হয়, ভোগে কলুষিত করিতে নাই। ইঁহারা দেবতা; যিনি সৌন্দর্য্যের আদিপ্রস্রবণ পরমসুন্দর, নারী সেই সৌন্দর্য্যসূর্য্যের সমুজ্জ্বল রশ্মি; আমরা আমাদের হৃদয়-পর্‌কলার ভিতর দিয়া দেখি বলিয়া নারীকে লালসায় রঙিন করিয়া দেখি, কিন্তু বস্তুত নারী শুভ্র উজ্জ্বল পবিত্র। প্রেমের পাত্র স্ত্রীপুরুষ সকলেই সমান; স্ত্রীপুরুষ ভেদে যদি ভাবের তারতম্য ঘটে তবে সেখানে নিজের চিত্ত নির্ম্মল নাই বুঝিতে হইবে। আসল প্রেম জীবাত্মায় পরমাত্মায়। জীবাত্মা রাধা, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ; এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ রাধাকান্ত। হৃদ্‌কমল-মঞ্চে ইঁহাদের নিত্য নিরন্তর মিলনোৎসব চলিতেছে বিচিত্র ভাবে বিচিত্র ভঙ্গীতে; প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ সুন্দর দিনে সেই আনন্দের আভাস পাওয়া যায়। যাঁরা আত্মক্রীড় আত্মরতি তাঁরা বুঝিতে পারেন ঝুলন রাস দোল বাহিরের কোনো সাময়িক উৎসব নয়, অন্তরে অহরহ নিত্য নিরন্তর জীবাত্মা-

পরমাত্মার মহামহোৎসবে সম্পন্ন হইতেছে। জীবাত্মা-পরমাত্মার এই যে প্রেমযোগ তাহা মানুষ বিশ্ববোধ আত্মবোধের ভিতর দিয়াই লাভ করে।

বিপিন ভাবিতে লাগিল, তবে কি এই সব সংসার-মায়া মিথ্যা! মালতী আমার কেউ নয়, আমরা বিশ্বের সম্পত্তি, বিশ্ব আমাদের বিরহে ক্রন্দন করিতেছে! নবকিশোর ফিরিবার আগে স্বামীকে একবার সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিতে হইবে, দেখি তিনি কী বলেন। নবকিশোরটা গায়ের জোরে সমস্ত মানাইতে চায়, স্বামীজী কী শান্ত যুক্তিতে সব বুঝাইয়া দেন! নবকিশোরকে কিন্তু এখন শীঘ্র স্বামীজীর কথা বলা হইবে না, তাহা হইলে সে তর্কের ধূলা উড়াইয়া কোনো পথই ভালো করিয়া দেখিতে দিবে না।

চারিদিকে আঘাত সংঘাতে জমিদারের ছেলে বিপিন নিতান্ত মুহ্যমান বোধ করিতেছিল; কাঙারু-শাবকের মতো মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াও মাতায় বহির্গর্ভের থলিটির মধ্যে আবৃত থাকাই যার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, চিরকাল পরের উপর নির্ভর করাই যার অভ্যাস, পরের সাহায্য ব্যতীত যার আহার বিহার আরাম বিশ্রাম কিছুই সম্পন্ন হইবার জো ছিল না, তাকে যখন নিজের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে দিশাহারা হইতে হইতেছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে তার শেষ দুটি অবলম্বন নবকিশোর ও মালতীর সঙ্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া বিপিন নিজেকে নিতান্তই অসহায় ও একাকী বোধ করিতেছিল। এমন অবস্থায় প্রেমানন্দ স্বামীর প্রবল ব্যক্তিত্বের প্রভাব তার মনের উপর পড়াতে বিপিন যেন একটা আশ্রয় পাইয়া বাঁচিল। সেই দিন হইতে সে প্রায়ই স্বামীজীর আশ্রমে যাইতে লাগিল; স্বামীজী আজ বিডন গার্ডেনে, কাল টাউন হলে, পরশু কোনো থিয়েটার-ঘরে

বক্তৃতা দিয়া ফিরেন, আর শত সহস্র মুগ্ধ দৃষ্টির ঈর্ষার পাত্র হইয়া বিপিন ছায়ার মতো স্বামীজীর পশ্চাতে পশ্চাতে ফিরে।

একদিন স্বামীকে নির্জ্জনে পাইয়া বিপিন নিজের সমস্ত কাহিনী সবিস্তারে নিবেদন করিল। স্বামীজী চোখ বুজিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া সমস্ত শুনিলেন। কিছুক্ষণ পরে 'রাধাকান্ত!' বলিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া চোখ মেলিলেন। বিপিনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—বৎস, তোমায় ত আমি বলেছি প্রেমই ধর্ম্ম! তুমি মহা ভাগ্যবান তাই রাধাকান্ত তোমার হৃদয়ে এমন প্রবল প্রেম দিয়েছেন। তুমি সেই প্রেমকে একধারায় ভোগের মরুভূমিতে কেন বইয়ে দেবে, তাতে তোমারই বা লাভ কি, জগতেরই বা লাভ কি? সেই প্রেমকে তোমরা হৃদয়হিমাচল থেকে জাহ্নবীধারার মতো সহস্রধারায় বইয়ে দাও, যাক সে বিশ্বমানবের মহাসাগরে মিশে, সে সার্থক হোক, সে ধন্য করুক! আমি যতদূর দেখ্‌ছি মালতী সাক্ষাৎ রাধারাণীর বিকাশ, সে সকল কলঙ্ক মাথায় কোরে তোমায় যে বরণ করেছে, তার সেই অপূর্ব্ব অমল প্রেম সে কি শুধু তোমার নিজের ভোগে কলুষিত করবার জন্যে! না না, তা কখনো নয়। তোমরা আধ্যাত্মিক যোগে ঘনিষ্ঠ হবে, বিশ্ব তোমাদের প্রেমের প্রসাদ পেয়ে ধন্য হয়ে যাবে। এই তোমাদের পথ। আত্মা শুধু যে কেবলমাত্র আছে তা ত নয়—আত্মা জ্ঞান প্রেম ও আনন্দের খনি। পৃথিবী কত যুগযুগান্তর তপস্যা করে আত্মাকে পেয়েছে। আত্মা পৃথিবীর অন্ধকারের আলো, মরুভূমির ওয়েসিস! আত্মাকে পেয়ে পৃথিবীর শ্রী ফিরে গেছে। সসাগরা পৃথিবীর সমস্ত ধনরত্ন ভোগ একদিকে, আর আত্মা একদিকে,—আত্মার তুলনায় ভোগ অকিঞ্চিৎকর ছাই ভস্ম! বেদান্তশাস্ত্র বলেন যে, আত্মা, অস্তি ভাতি এবং প্রিয়—এই তিন সাধনের ধন একাধারে। অস্তি কিনা আত্মার স্থিরপ্রতিষ্ঠা, ভাতি

কিনা আত্মার জ্ঞানালোক, প্রিয় কিনা আত্মার প্রেমামৃত। তাই হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সাধনতত্ত্ব আত্মানং বিদ্ধি, আত্মাকে জানো ; তারপর আত্মাকে প্রেম করো, দেহকে নয়, নিজের ভোগের লালসাকে নয়। পুষ্করিণীতে পাঁকশ্যাওলা জোমে যেমন তার জল অব্যবহার্য্য হয়, তেমনি প্রবৃত্তির প্রলেপ লেগে আত্মার ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয় ; নষ্ট পুষ্করিণীকে ঝালিয়ে যেমন আবার কাকচক্ষু জল পাওয়া যায়, তেমনি বিবেক বৈরাগ্য এবং সংযমের দ্বারা আত্মার পঙ্কোদ্ধার করা আবশ্যক, তা নইলে আত্মা সাধকের ভোগে আস্‌তে পারে না।—আত্মরতিই রতির চরম বোলেই জেনো। ভাষার মধ্যে যেমন ব্যাকরণ অলঙ্কার কাব্য সাহিত্য সবই অন্তর্ভূত, তেমনি সমগ্র আত্মাতে জ্ঞান বীর্য্য প্রেম আনন্দ সবই অন্তর্ভূত হয়ে আছে ; ভাষা আয়ত্ত করতে হলে যেমন প্রথমে ব্যাকরণজ্ঞানকে আয়ত্ত করা চাই, ব্যাকরণ শুষ্ক নীরস বোলে ছেড়ে দিয়ে একেবারেই কাব্য ধর্‌লে সকল দিকই পণ্ড হয়ে যায়, কাব্যের রস কিছুতেই আয়ত্ত হয় না, তেমনি সাধনের ভিতর দিয়ে প্রকৃত আত্মার প্রেম আয়ত্ত না কর্‌লে প্রেম ব্যর্থ হয়ে পড়ে। ...তুমি যদি মালতীকে প্রকৃত ভালোবাস্‌তে চাও, তার আত্মার সঙ্গে তোমার আত্মার যোগ স্থাপন করো ; আপনাদের ভোগলালসাকে খর্ব্ব কর। ...তুমি ভাগ্যবান, তুমি ভাগ্যবান ! এমন সর্ব্বস্ব-খোয়ানো প্রেম রাধাকান্তকে নিবেদন কোরে দিয়ে তোমরা ধন্য হও !

গুরুজী আবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। বিপিন স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। স্বামীজীর তত্ত্বকথা তার চোখের সাম্‌নে আকাশ পাতাল উলটপালট করিয়া দিয়া বনবন করিয়া ঘুরাইতে লাগিল।

গুরুজী চোখ মেলিয়া বলিলেন—বৎস, তুমি অবসর-মতো কথাগুলি ভেবে দেখো।

বিপিন স্বামীজীর পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া নীরবে প্রস্থান করিল।

বিপিনের মনের উপর স্বামীজীর কথাগুলি কাটিয়া কাটিয়া বসিতে লাগিল —স্বামীজী যে মালতীকে ত্যাগ করিতে বলিলেন না, আরো গভীর ভাবে প্রকৃত ভাবে ভালোবাসিবার পথ নির্দ্দেশ করিলেন, এই কথাটাতেই তাকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। তার মনে হইতে লাগিল বাস্তবিকই ত দেশবিদেশের ইতিহাসে কাব্যে এই কথাই দেখা যায়— সৌন্দর্য্য ও প্রেম যেখানেই সমগ্রকে আচ্ছন্ন করিয়া বাসনার সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে ঘুরিয়া মরিয়াছে, যেখানে মঙ্গলকর্ম্মে বৃহৎকর্ম্মে আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে নাই, সেখানেই ত অবশেষে নিদারুণ দুঃখের প্রলয়াঘাতে সেই ভীষণ প্রেমের নাগপাশ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। নিজের ভোগের সুর বিশ্বসঙ্গীতের সুরকে অতিমাত্রায় আচ্ছন্ন করিয়া নিজেকেই যদি একান্ত প্রবল করিয়া তোলে তবে সেই ভোগ ত মৃত্যুরই নামান্তর! বিপিনের মনে হইতে লাগিল, বাস্তবিকই যদি সে মালতীকে ভালোবাসিয়া থাকে তবে তাকে পবিত্র রাখিয়া সুন্দর রাখিয়াই ভালোবাসিতে হইবে, নিজেদের বাসনার পঙ্কে আত্মাকে আচ্ছন্ন বিমলিন করিয়া নহে।...কিন্তু মালতী বড় সুন্দর! এই 'অষ্টাদশ বসন্তের একগাছি মালা' কি একদিনের জন্যও বুকে তুলিয়া লওয়া অন্যায় হইবে? 'যে মিলন ক্ষুধাতুর মৃত্যুর মতন' তার কি ক্ষুধা মিটিবে না? জীবনসূত্রে যে জট বাঁধিয়া যাইতেছে, তাহা কি খুলিবে না? না না, ও বিষয়ে আর ভাবনা বৃথা—

'একি দুরাশার স্বপ্ন হায়গো ঈশ্বর,
তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোন্‌খানে!'

বিপিন পথ চলিতে চলিতে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিতে লাগিল— গুরুদেব, গুরুদেব, অজ্ঞানতিমিরান্ধকে পথ দেখাও, পথ দেখাও।

তারপর হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিতে করিতে বলিল—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

৩৫

বিপিন যখন প্রেমানন্দ স্বামীর আকর্ষণী শক্তিতে মন্ত্রস্তম্ভিতের মতো হইয়া বিশ্বসংসার ভুলিতে বসিয়াছিল, সংসার কিন্তু তখন তাকে ভুলিয়া থাকে নাই।

বিপিন মালতীকে লইয়া চলিয়া আসিলে হরিবিহারী ও গিন্নি উভয়েই পুত্রের প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। গিন্নির দুর্ব্বলের বল অনাথের নাথ লক্ষ্মীজনার্দ্দনকে প্রত্যহ একশ-আটপাত তুলসী ও ডবল ভোগ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, এবং রামলাল আচার্য্যকে ডাকাইয়া ডাইনি মালতীর দিক হইতে বিপিনের মন ফিরাইবার জন্য গ্রহশান্তির আয়োজন করিতে লাগিলেন। আচার্য্য-ঠাকুর সময় বুঝিয়া যে লম্বা-চওড়া ফর্দ্দ দিলেন তাতে কনকধুস্তূরের ফুল, অরুণবর্ণ অশ্ব, নীলবস্ত্র, কম্বল, মৃগমদ ও নবরত্ন প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে দেশে দেশে লোক ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

হরিবিহারী তাঁর বুদ্ধির ভাঁড় নিবারণকে ডাকিয়া অনন্তর-করণীয় সম্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। নিবারণ পরামর্শ দিল মালতীর শ্বশুরবাড়ীতে এবং বিপিনকে দুখানি পত্র দেওয়া হোক। মালতীর ভাসুরকে লেখা হোক বিধবার বিবাহ কুলত্যাগেরই সামিল; এতে তাদের কুলের কলঙ্ক, বংশের অপমান; তাদের উচিত ইহা রোধ করা, টাকা যত লাগে তাহা হরিবিহারী দিবেন। এবং বিপিনকে এই মর্ম্মে চিঠি লেখা হোক যে মালতীকে তার ভালো লাগিয়া থাকে বেশ ত, মালতী তার কাছেই থাকুক, কিন্তু তাকে বিবাহ করিতে পারিবে না; বিবাহ যদি করে তবে তাকে ত্যাজ্যপুত্র করা হইবে।

হরিবিহারী এই সৎপরামর্শে আনন্দিত হইয়া দু-জায়গাতেই চিঠি লিখিলেন এবং বিপিনের চিঠিতে স্বয়ং বুদ্ধি খরচ করিয়া আর-এক লাইন যোগ করিয়া দিলেন যে বিপিন যদি শীঘ্রই বাড়ী ফিরিয়া না যায় তাহা হইলে নিবারণ-পুত্র পটলার সহিত বিনির বিবাহ দিবেন।

বিপিনের চিত্ত যখন সংসার ও সন্ন্যাসের মধ্যে দোল খাইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে সে পিতার চিঠি পাইল। একে সে ভাবপ্রবণ উত্তেজনাশীল প্রকৃতির লোক, তার উপর প্রেমানন্দের প্রবল প্রভাব তাকে মাতাল করিয়া তুলিয়াছিল। সেই অবস্থায় বিপিন এই চিঠি পাইয়া লজ্জায় ঘৃণায় একেবারে পাগল হইয়া পিতাকে যে চিঠি লিখিল তাহা পড়িয়া হরিবিহারীর মতন নিশ্চেষ্ট লোকও নিজে উদ্যোগী হইয়া উকিল ডাকাইয়া বিপিনকে ত্যাজ্যপুত্র করিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন।

বিপিন পিতৃ-সংসারের সহিত সম্পর্ক একেবারে চুকাইয়া একরকম নিশ্চিন্ত হইল। এক-একবার তার মায়ের জন্য বড়ই মন-কেমন করিত। কিন্তু সে তাহা দমন করিয়া ভাবিত গুরুদেব তাকে একে একে বন্ধন-মুক্ত করিতেছেন, ক্রমে ক্রমে সব দিক ঠিক হইয়া যাইবে। এক-একবার বিনির ভাগ্যের কথা মনে করিয়া তার চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিত, কিন্তু তার পিতামাতাই যদি তার শত্রুতাচরণ করেন তবে সে আর কতদিন সংগ্রাম করিয়া তাকে রক্ষা করিতে পারিবে। না, না, এসব চিন্তা আর না, ইহাতে শুধু বিক্ষেপ, শুধু অশান্তি, শুধু আধ্যাত্মিক অবনতি। বৈরাগ্যমেবাভয়ম্—বিরতিই চরম সুখ।

মালতীর ভাসুর এতদিন ভ্রাতৃবধূ সম্বন্ধে দিব্য উদাসীন ও পরম নিশ্চিন্ত ছিল, কিন্তু এখন হরিবিহারীর পত্রে যত টাকা লাগে পাইবার প্রত্যাশায় অকস্মাৎ তার বধূর প্রতি মমতা ও কুলমর্য্যাদার প্রতি

সতর্কতা অত্যন্ত কঠোরভাবে জাগ্রত হইয়া উঠিল। সে খুঁজিয়া খুঁজিয়া তারকের বাড়ী সন্ধান করিয়া বাহির করিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে গেরুয়া রঙের একখানি মলিদার চাদর মুড়ি দিয়া দরজার ধারে একখানি বেঞ্চিতে বসিয়া বসিয়া তারক মালাজপ করিতে-ছিল, ঝুলির ছিদ্র দিয়া শীর্ণ তর্জ্জনী অঙ্গুলীটি সোজা হইয়া বাহির হইয়াছিল, আঙুলের অষ্টধাতুর তারের পুঁটে-দেওয়া আংটিটি চকচক করিতেছিল। এমন সময়ে মালতীর ভাসুর মুকুন্দ একটা কালো কাশ্মীরার কোটের উপর একটা চেক আলোয়ান মাথা পর্য্যন্ত মুড়ি দিয়া আসিয়া তারককে জিজ্ঞাসা করিল—মশায়, এটা কি তারক-বাবুর বাড়ী?

তারক বলিল—হাঁ, আপনি কি চান? আপনি?

—আমাকে চিন্তে পার্বেন না। আমি আস্‌চি বারাসাত থেকে, আপনার সঙ্গে একটু দর্‌কার আছে।—বলিয়া মুকুন্দ দুই হাতে গায়ের কোট ও আলোয়ান কোমরের কাছে গুটাইয়া তারক যে বেঞ্চিতে বসিয়া ছিল সেই বেঞ্চিতে বসিতে গেল। তারক অমনি ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—হাঁ হাঁ হাঁ করেন কি? করেন কি?

মুকুন্দ থতমত হইয়া চারিদিকে চাহিতে চাহিতে বলিল—কেন হয়েছে কি? কথা কটা বল্‌তে হবে তাই একটু বস্‌ব।

তারক বলিল—দেখ্‌ছেন না আমি মালা জপ কর্‌ছি?...

—তাতে কি? আমি ত ব্রাহ্মণ।

—হোন না কেন ব্রাহ্মণ। পায়ে জুতো আছে ত? জুতো পোরে আমার মালা ছোঁবেন?

—আচ্ছা, না হয় নাই ছুঁলাম। আমার কথা অল্প, আমি দাঁড়িয়েই বোলে যাই।...আমি শুন্‌লাম মথুরাপুরের জমিদারের ছেলে বিপিনবাবু এখানে আছেন?

—হাঁ আছেন ত ?

—তাঁর সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক এসেছে ?

—হাঁ, তার নাম মালতী। তাকে বিপিন বিয়ে করবে বলে।

—আমি সেই মালতীর ভাসুর। আমার ভাদ্দর্‌-বৌকে আমি বাড়ীতে না রেখে দূর কোরে দিয়েছিলাম কেন জানেন ? আমি কি আর আমার ভায়ের বিধবা বৌকে একবেলা দুটি হবিষ্যি দিতে পারতাম না ? আমি কি এমনি কশাই মশাই ? কিন্তু তাকে ভদ্রলোকে ঘরে ঠাঁই দিতে পারে না, এমন সে। বুঝতে পারছেন ত কথাটা ?

তারকের মালাজপ স্থগিত হইয়া গিয়াছিল। সে বিস্মিত হইয়া তার বসা গাল আরো তুবড়াইয়া বলিল—অ্যাঁ! বলেন কি ? তাকে ত বেশ চুপচাপ লক্ষ্মীটির মতো দেখতে।

মুকুন্দ মুচকি হাসিয়া বলিল—ঐ ত, ঐখানেই ত ওর বাহাদুরী ; ধরবার ছোঁবার জোটি নেই··

—তা আপনি কি করতে চান ?

—আমি যখন শুনলাম যে সে আপনার বাড়ীতে এসে আছে তখন মনে করলাম নিশ্চয় ভদ্রলোক না জেনে অমন নষ্ট মেয়েমানুষকে নিজের পরিবারে ঠাঁই দিয়েছেন ; কিন্তু আমাদের ত উচিত নয় তাঁকে ঠকানো। যদিও নিজের ঘরের কুচ্ছো বলতে নিজের মুখ হেঁট হচ্ছে, তবু······

তারক তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—না না না, তা আপনি খুব ভালো কাজই করেছেন। আপনি—হেঁ হেঁ—দাঁড়িয়ে রইলেন যে·· বসুন বসুন এই বেঞ্চিতেই বসুন, আমি ত এখন আর মালাজপ করছিনে।··· তা আমি বিপিনকে বলব।

মুকুন্দ বেঞ্চিতে বসিয়া বলিল—বলব নয়, মেয়েটাকে দূর কোরে

দেবেন। আপনাকে তবে একটা গোপনীয় কথা পূর্ব্বেই বলি, আপনাকে ভালো মানুষ বলেই ত ঠেকছে, আবার আপনি বিপদে-টিপদে পড়বেন?

বিপদের নাম শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া তারক দাঁত বাহির করিয়া বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি ঠিক ঠাওরেছেন, আমি একেবারে নেহাত ভালো মানুষ। সংসারের মার-পেঁচ কিছুই বুঝিনে। বিপদ-টিপদের কথা কি বল্‌ছেন?···শুনে আমার গা কাঁপ্‌ছে। দোহাই···আপনার নাম জানিনে ···মালতীর ভাসুর মশায়, আমাকে বাঁচান!

মুকুন্দ গম্ভীর হইয়া বলিল—সেই জন্যই ত আমার গাঁটের পয়সা খরচ কোরে এতদূর আসা।···শুনুন সব খুলে বলি।···আমি পুলিশ-আদালতে নালিশ করেছি যে বিপিন আমার ভাদ্দরবৌকে ফুস্‌লে বার কোরে এনেছে। আর হাইকোর্টে দরখাস্ত করেছি বিয়েটা যাতে রদ হয়, আর মালতী যাতে আমাদের বাড়ী গিয়ে থাকে। হাজার হোক কুলের বৌ ত সে, অমনি চৌদ্দটা বিয়ে কোরে বেড়াবে সেটা ত আমাদেরই লজ্জার কথা। লোকে বল্‌বে ঐ মুকুন্দ-মজুমদারের ভাইয়ের বৌ। কি বলেন আপনি? তাই বল্‌ছি, আপনার বাড়ীতে শেষে কি পুলিশের হাঙ্গামা হওয়া ভালো হবে?

মুকুন্দ তারকের গা ঠেলিয়া দিল। তারক পুলিশ ও আদালতের নামে ভীত হইয়া মুকুন্দের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—না না মশায়, দোহাই আপনার। আপনি ত ব্রাহ্মণ, পায়ের ধূলো মাথায় দিন, আমার বাড়ীতে পুলিশ-হাঙ্গামা কর্‌বেন না। আমি আজই, এই রাত্রেই, ওদের তাড়িয়ে দেবো।

মুকুন্দ বলিল—তা ত আপনি দেবেনই আমি জানি, হাজার হোক আপনি ভদ্রলোক ত। কিন্তু আপনাকে আরও একটা কাজ

করতে হবে, ওরা কোথায় যায় তার খোঁজটি আপনাকে রাখ্‌তে হবে; নইলে পুলিশ যখন ওদের সন্ধান পাবে না তখন আমি বোলে দেবো আপনিই ওদের লুকিয়ে রেখেছেন। বুঝেছেন ত?

তারক বলিল—হাঁ হাঁ হাঁ খুব বুঝেছি। আমি রাখ্‌ব রাখ্‌ব খবর রাখ্‌ব!

—আচ্ছা তবে বসুন। আমি আসি।—বলিয়া মুকুন্দ উঠিয়া দাঁড়াইল।

তারকও উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—একটা কথা বল্‌তে ভয় হচ্ছে, একবার একটু এই অধমের বাড়ীতে পা ধুয়ে গেলে ভালো হত না।

মুকুন্দ বলিল—না না, সে আজ থাক, আপনার সঙ্গে ত আমার পরে আরও দেখা হবে।

তারক মনে মনে বলিল—না দেখা হলেই ভালো হত।—প্রকাশ্যে বলিল—আজ্ঞে আজ্ঞে তা ত বটেই ··আচ্ছা তবে প্রণাম।

মুকুন্দকে বিদায় করিয়া দরজায় খিল্ দিয়া তারক বাড়ীর ভিতর গেল এবং উদ্বেগ-জড়িত কণ্ঠে স্ত্রীকে উদ্দেশ করিয়া ডাকিল—কৈ গো কোথায় গেলে?

তারকের স্ত্রী রান্নাঘরে রুটি সেঁকিতেছিল, মালতী রুটি বেলিয়া দিতেছিল, এবং ডেরিডাম্‌রি পাঁচ ছয়টি ছেলেমেয়ে চেঁচামেচি কান্নাকাটি করিয়া হাট বাধাইয়া তুলিয়াছিল। তারকের ডাক শুনিয়া তার স্ত্রী উৎকর্ণ হইয়া ছেলেদের ধমক দিয়া বলিল—আঃ থাম্ না তোরা, একেবারে হাট বাধিয়ে তুলেছিস! কিছু কি শোন্‌বার জো আছে ছাই। উনি বোধ হয় ডাক্‌ছেন।···

ছেলেরা সব ক্ষণেকের জন্য সন্ধি করিয়া চুপ করিল। তখন আবার তারকের আহ্বান শোনা গেল—ওগো শুন্‌চ?

মালতী বলিল—হঁ্যা তারকবাবুই ডাক্ছেন।

একটা ছোট মেয়ে মাতার বাহুর পাশ দিয়া মাথা গলাইয়া স্তন্যপান করিতেছিল; সেটাকে সরাইয়া দিতেই সে তারস্বরে হাত-পা ছুড়িয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তার সেই সরব আন্দোলন ও আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া তারকের গৃহিণী খুন্তি হাতে করিয়াই বাহির হইয়া আসিল। তার গায়ে কাপড়টা পৈতের মতো জড়ানো, আগুনতাতে ছিল বলিয়া সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা নয়; স্বামীর আহ্বানে বাঁ হাতে আঁচলের একটা খুঁট মাথার মাঝখানে একটু তুলিয়া দিয়াছিল কিন্তু পশ্চাতের খোঁপাটা বাহির হইয়াই ছিল। সে স্বামীর সম্মুখীন হইয়া বলিল—কেন? কেন ডাক্ছ?

—ঐ যে বৌটি বিপিনের সঙ্গে এসেছে তার ভাসুর এসেছিল। তিনি বল্লেন বৌটির চরিত্তির ভালো নয়, সেই জন্যেই তাঁরা ওরে বাড়ী থেকে দূর কোরে দিয়েছিলেন। আমাকেও বোলে গেলেন আজকে রাত্রেই দূর কোরে দিতে; না দিলে পুলিশ এসে হাঙ্গামা করবে। বৌটি ঐ ওখানে আছে, তাকে বলো।

তারকের স্ত্রীকে কিচ্ছু বলিতে হইল না, মালতী সব শুনিতেছিল। একজন অপরিচিত পুরুষের মুখে নারীর এই চরম অপমানের কথা শুনিয়া মালতীর চোখ মুখ দিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল এবং এই মাঘমাসের রাত্রেও তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া দরদর করিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল।

তারকের স্ত্রী গালে হাত দিয়া ঘাড় কাত করিয়া স্বামীকে বলিল—ওমা বলো কি গো? শেষকালে কি পরের দায়ে আমাদের হাতে দড়ি পড়বে নাকি? এতগুলি কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে কি শেষে পথে ভাসব —ওগো ভালো-মানুষের ঝি, শুন্ছ তোমার গুণের কথা। বেরো আমার বাড়ী থেকে এখনি এই দণ্ডে।

তারকের স্ত্রী ঘনঘন খুন্তি সঞ্চালন করিয়া মালতীকে বারবার দ্বার নির্দ্দেশ করিতে লাগিল। মালতী তেজস্বিনী মেয়ে, সে একেবারে ভাঙিয়া পড়িবার পাত্র নয়। সে এতদিন এ বাড়ীতে আছে, তারক তাকে দেখে নাই, তার গলা শুনে নাই। আজ অপমানের আঘাত পাইয়া উদ্ধত সর্পিনীর মতন সে বাহিরে আসিয়া বলিল—ভয় নেই আপনাদের। বিপিনবাবু ফিরে এলেই চোলে যাব।

মালতী উহাদের আর গ্রাহ্য না করিয়া দ্বিতলে গিয়া আপনার ও বিপিনের সমস্ত সামগ্রী গুছাইয়া লইতে লাগিল। তারক বিপিনের প্রতীক্ষায় বাহিরে আসিয়া শীতে জড়োসড়ো হইয়া বসিয়া হি হি করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

অনেক রাত্রে বিপিন আসিয়া দরজার কড়া নাড়িল। তারক উঠিয়া দরজার খিল খুলিয়া দিয়াই বিনা ভূমিকায় হঠাৎ বলিয়া উঠিল—এ তোমার ভারি অন্যায়!

বিপিন হাসিয়া বলিল—হাঁ ভাই, একটু রাত হয়ে গেছে। গুরুজীর সঙ্গে আজ অনেক সুন্দর সুন্দর কথা হল। খেয়ে নিয়ে বল্‌ব তোমায়।

তারক বিরক্তির স্বরে বলিল—না না বক্তৃতা শোন্‌বার জন্যে ত আমার ঘুম হচ্ছে না। এ তোমার কি অন্যায় ব্যাভার?

বিপিন তারকের ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল—কি বল্‌ছ? কি অন্যায় করেছি?

—আমার বাড়ীতে একটা বেশ্যা এনে রেখেছ!

বিপিন দাঁতের উপর দাঁত চাপিয়া ঘুসি তুলিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল—দেখ তাড়কা-রাক্কুসী, এক ঘুসিতে তোর ঐ মূলোর মতো দাঁতগুলো ঝরিয়ে একেবারে বাক্‌রোধ কোরে দেবো! ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বল্‌তে জানো না ষ্টুপিড!

তারক কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল—এ ত আমার ভারি বিপদ হল দেখছি। মালতীর ভাসুর এসে বল্‌বে তোমায় পুলিসে দেবো, তুমি বলবে ঘুসি মার্‌ব ?…

বিপিন জিজ্ঞাসা করিল—মালতীর ভাসুর ?

—হ্যাঁ। সেই ত এসে এই সব বোলে গেল।

—কি বোলে গেল সে ?—বলিয়া বিপিন তারকের হাত ধরিয়া আচ্ছা করিয়া নাড়িয়া দিল। তারক দম-দেওয়া গ্রামোফোনের মতো আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনর্গল সমস্ত কথা বলিয়া গেল। বিপিন চুপ করিয়া শুনিল। সে চিন্তিত হইয়া ভাবিতেছে, এমন সময় মালতী সেখানে আসিয়া বলিল—বিপিনবাবু, শিগ্‌গীর একখানা গাড়ী ডাকুন ; এ বাড়ীতে এখনো দাঁড়িয়ে আছেন ?

বিপিনও বুঝিতেছিল, আত্মসম্মানবোধ যার আছে তার এ বাড়ীতে আর এক দণ্ডও থাকা উচিত নয়। কিন্তু সে এই রাত্রে এই সুন্দরী রমণীকে সঙ্গে লইয়া যায় কোথায় ? বিপিন মহাসমুদ্রে পড়িয়া কূল পাইতেছিল না ; সে যে সংসার-ব্যাপারে নিতান্ত অনভিজ্ঞ, সম্পূর্ণ অসহায়। সে কাতরভাবে মালতীর মুখের দিকে চাহিল। মালতীর চক্ষু দুটি বড় হীরার সূচীর মতো জ্বলিতেছিল। মালতী বলিল—চুপ কোরে ভাবছেন কি ? চলুন।

বিপিন হতাশভাবে বলিল—মালতী, কোথায় যাব ?

মালতী জোরের সহিত বলিল—সে ভাবনার সময় এখন নেই, একখানা গাড়ী ত ডাকুন। ঘণ্টা-হিসেবে গাড়ী কর্‌বেন ; গাড়ী পথে পথে নিয়ে বেড়াবে। সেই সময়ে যা হয় একটা ঠিক কোরে ফেলা যাবে।

বিপিন যন্ত্রচালিতের ন্যায় নিজেই গাড়ী ডাকিতে বাহির হইল। তাদের চিরপুরাতন ভৃত্য পঞ্চা যে পাশের ঘরে পড়িয়া নিশ্চিন্ত

নিদ্রায় অচেতন আছে, একথা তখন তার মনে আসিল না। বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বিপিনের মনে হইল আজ যেন কলিকাতার সমস্ত গ্যাসের আলো ধূম ও কুয়াশা মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে, অজগরের মতো পথগুলা পথ ভুলাইবার জন্যই যেন অসংখ্য শাখায় আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে, অট্টালিকার পর অট্টালিকা অর্গলবাহু দ্বারা রুদ্ধদ্বার চাপিয়া ধরিয়া দুটি গৃহহীন নরনারীর দুর্দ্দশা দেখিবার জন্য স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বিপিন একখানি সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী ঘণ্টা-হিসাবে ভাড়া করিয়া আনিল। তারপর সমস্ত জিনিষ তারকের বাড়ীর একটা ঘরে গুছাইয়া রাখিয়া শুধু একটা বিছানার মোট ও একটা কাপড়ের ট্রাঙ্ক গাড়ীর মাথায় চাপাইয়া বিপিন ও মালতী অভুক্ত অবস্থাতেই গাড়ীতে চড়িয়া বসিল। কেউ একবার বলিল না, খাইয়া গেলে ভালো হইত। এতগুলা রুটি যে ন দেবায় ন ধর্ম্মায় নষ্ট হইল এজন্য তারকের স্ত্রী কয়লার উনানের আঙারের মত গনগন করিতে লাগিল। এবং ছেলেটাকে চড় কসাইয়া মেয়েটার কষা নিংড়াইয়া সে এক মহামারি কুরুক্ষেত্র গণ্ডগোল বাধাইয়া তুলিল।

এই গোলমালে পঞ্চার ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। সে তার মুনিবদের গাড়ীতে চড়িতে দেখিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে নিজের পুঁটুলিটি বগলে করিয়া গাড়ীর কোচবাক্সে আপনার স্থান করিয়া লইল। তারক জিজ্ঞাসা করিল—তোমরা কোথায় যাচ্ছ ?

বিপিন বলিল—যমের বাড়ী।

তারক ভাবিল, তাইত! সে জায়গাটার সন্ধান ত পুলিসের ভয়েও বাহির করা মুস্কিল এবং চেষ্টা করিয়া সন্ধান পাইলেও ভূত হইয়া পুলিসকে পাওয়া ছাড়া আর কোনো প্রকারে ত পুলিসকে সন্ধান জানাইবার উপায় নাই। তারক মহা সমস্যায় পড়িয়া ভাবিতে লাগিল—তাইত!

গাড়োয়ান গাড়ীর দরজা বন্ধ করিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—বাবু, কোথায় যেতে হবে?

বিপিন বলিল—তোমার যেখানে খুসি, পথে পথে নিয়ে বেড়াও।

গাড়ী নিশিতে-পাওয়া রোগীর মতন এপথ ওপথ করিয়া টলিয়া টলিয়া উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরিতে লাগিল। খানিকক্ষণ পরে দুড়ুম করিয়া সাড়ে নটার তোপ পড়িল, আর সেই ফাঁকা তোপের শব্দ শুনিয়াই ঘরে ঘরে লোক বোমকালী বলিয়া চম্‌কিয়া উঠিল। গাড়োয়ান হাঁকিল—বাবু, আর কত ঘুর্‌ব?

বিপিন ও মালতী এতক্ষণ ভাবনার মধ্যে ডুব দিয়া একেবারে তলাইয়া গিয়াছিল। তোপের শব্দ আর গাড়োয়ানের ডাকে সচকিত হইয়া নিতান্ত নিরুপায় ভাবে বিপিন বলিল—তাইত কোথায় যাব?

মালতী বলিল—শুনেছি কল্‌কাতায় কোথায় কোথায় সব হোটেল আছে, সেইখানে চলুন্ না।

বিপিন বিপন্নের ভাবে বলিল—হোটেল? তাইত সে-সব কোন্ রাস্তায় তা ত জানিনি।

—গাড়োয়ানকে বলুন সে খুঁজে কোথাও নিয়ে যাবে।

—কোথায় অচেনা জায়গায় রাত্রে গিয়ে শেষকালে কি বিপদে পড়্‌ব?

—অত ভাবলে ত চল্‌বে না, এক জায়গায় ত যেতে হবে। সমস্ত রাত ত আর গাড়ীতে ঘোরা চল্‌বে না।

বিপিন একটু চিন্তা করিয়া বলিল—এক খুড়িমার কাছে গেলে হত, কিন্তু তাঁদের ঠিকানা ত জানি না, শেষে কি কাশীর গুণ্ডার হাতে পড়্‌ব?…একমাত্র পথ আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি।…গুরুজীর আশ্রমে গেলে হয়।

মালতী বিস্মিত হইয়া বলিল—গুরুজী? আপনার আবার গুরুজী কে? তাঁর আশ্রম কোথায়?

—আশ্রম তাঁর খড়দায় গঙ্গার ধারে। তাঁর নাম শ্রীশ্রীপ্রেমানন্দ স্বামী। সন্ন্যাসী তিনি। মহাপুরুষ! অসাধারণ লোক!

মালতী বলিল—প্রেমানন্দ! হোন না তিনি প্রেমানন্দ, হোন না তিনি মহাপুরুষ! কিন্তু সন্ন্যাসীর আশ্রমে আমরা যাব কেন?

বিপিন এই প্রশ্নে একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিতে লাগিল—দেখ মালতী, তোমার আমার সাংসারিক মিলন হওয়া বোধ হয় ঈশ্বরের ইচ্ছা নয়, নইলে এমন সব অঘটন কেন ঘটবে। গুরুজীও বলছেন তোমার সঙ্গে আমার সাংসারিক মিলন মঙ্গলকর হবে না। চলো আমরা দুজনেই সন্ন্যাস গ্রহণ করি; কামনা বিসর্জ্জন দিয়ে আমরা দুজনে আধ্যাত্মিক যোগে মিলিত হব, দুজনে পাশাপাশি থেকে পরস্পরকে ভালোবেসে জগতের সেবা করব। আমার মন আজ কদিন থেকে এই কথাই বল্‌ছে; আমি বাসনা বিসর্জ্জন দিতে পারিনি বোলে ভগবান আজ একেবারে ঘাড়ে ধোরে পথে বার করেছেন; সব বাড়ীর দরজা বন্ধ; শুধু সেই প্রেমিক ভক্তের আশ্রমের কোনো দ্বারে অর্গল নেই। চলো আমরা সেইখানে যাই।

বিপিনের কথাটা মালতীর বুকে শেলের মতো গিয়া বিঁধিল। সে এত অপমান এত নির্য্যাতন এত বিপদ মাথায় করিয়া যে বিপিনের সঙ্গে অকূলে ভাসিয়াছে সে কি এই জন্য? হিন্দু বাঙালী ঘরের বিধবা সে. সে যে কতখানি ভালোবাসিয়া তবে এতবড় সংস্কারের গণ্ডি পার হইয়া বিপিনকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিল, সেই ত্যাগের সেই ভালো-বাসার গভীরতা বিপিন বুঝিল না? আজ একটু অসুবিধায় পড়িয়া বিপিন কিনা অনায়াসে চিরজন্মের বিচ্ছেদের কথা মুখে আনিতে পারিল,

একবার ভাবিয়া দেখিল না মালতী তার জন্য কি না সহ্য করিয়াছে, কি না ত্যাগ করিয়াছে! মালতী মিনতির স্বরে বলিল—যা আপনার ইচ্ছে হয় করবেন, নবকিশোর বাবু ফিরে আসা পর্য্যন্ত অনুগ্রহ কোরে অপেক্ষা করুন। আজকে হোটেলেই চলুন।

আবার নবকিশোরের নাম? বিপিনের উপর মালতী নির্ভর করিতে পারে না? এই কি তার ভালোবাসা? নবকিশোরই যদি তার অধিক হিতৈষী হয়, তবে সে নবকিশোরের সহিতই বুঝা-পড়া করুক, বিপিনের সহিত তার আর কোনো সম্পর্ক না থাকাই ভালো। বিপিন ত তাই চায়, ভগবানের অলক্ষ্য মঙ্গলহস্ত তার বন্ধনগুলি যে একে একে খুলিয়া দিতেছে, এ যে গুরুদেবেরই পরম কৃপার ফল, ইহা কি সে বুঝে না? ভালো, তাই তাই হোক, মালতীকে নবকিশোরের জিম্মায় সোপর্দ্দ করিয়াই বিপিন একেবারে মুক্ত হইবে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া বিপিন গাড়োয়ানকে কোনো হোটেলে লইয়া যাইতে বলিল। গাড়োয়ান অনেক খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাদের এক হিন্দু-নিবাসে উপস্থিত করিল। অনেক ডাকাডাকি, কড়া খটখটির পর হোটেলের চাকরদের তুলিয়া তারা আশ্রয় পাইল। যথারীতি বচসার পর গাড়ীভাড়া চুকাইয়া ভারাক্রান্ত হৃদয় ও শূন্য উদর লইয়া বিপিন ও মালতী হোটেলের দুই ঘরে দুটি বিছানা পাতিয়া শুইয়া পড়িল। পঞ্চা আপনার কম্বলখানি বিছাইয়া মালতীর ঘরের দরজার সাম্‌নে পড়িয়া রহিল।

৩৬

ভোর না হইতেই কলিকাতার নিদ্রিতদের জাগাইবার উৎকট চেষ্টা পথে পথে চলিতে লাগিল। কলে কলে বাঁশি বাজিল, ময়লা-ফেলা গাড়ী উৎকট শব্দে ছুটিতে লাগিল, ট্রাম চলিল। তাদের সঙ্গে সঙ্গে কাকের

কলরব, ভিখারী-বষ্টমের করতাল বাজাইয়া নাম-সঙ্কীর্ত্তন এবং নানা ফেরিওয়ালার কড়ি-কোমল সাধা সুরের আর্ত্তনাদ প্রবল হইয়া উঠিল। এততেও যার ঘুম না ভাঙে সে কুম্ভকর্ণের আধুনিক সংস্করণ। সুতরাং বিপিন ও মালতীকে পরিতৃপ্তির পূর্ব্বেই নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠিতে হইল।

বিপিন নবকিশোরের চিঠির আশায় একবার তারকের বাড়ীতে গেল। কোনো চিঠি আসে নাই। তারক বলিল—চলো তোমার বাসাটা দেখে আসি; চিঠি এলে আমি পৌঁছে দেবো'খন।—মুকুন্দকে বিপিনের নূতন বাসার সন্ধান দিতে হইবে বলিয়া তারকের এত আগ্রহ।

বাসায় ফিরিবার সময় বিপিন আপনাকে বড় বিব্রত বোধ করিতে লাগিল।

মাতার আদরের ধন বিপিন চিরদিন পরের যত্নে ও বিলাসিতায় একেবারে অকর্ম্মা হইয়া গিয়াছিল; বড় হইয়া যখন সে মাতার সঙ্গচ্যুত হইয়া বিদেশে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল, তখন তার পরম আশ্রয় ছিল বলিষ্ঠ সতেজ নবকিশোরের বন্ধুত্ব। আজ অপরিচিত নূতন বাসার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করিবার ভার পড়িয়াছে এক তার উপর! সে ত কখনো নিজের বা পরের আরামের জন্য মাথা ঘামায় নাই, আজ হইতে একটি নূতন অগঠিত অসম্পূর্ণ সংসারের সমস্ত খুটিনাটি তাকেই বহন করিতে হইবে। আজ তাকে চাল ডাল তরকারি তেল নুন লকড়ি, হাঁড়ি কুঁড়ি, হাতা খুন্তি বেড়ির তুচ্ছ ভাবনা ভাবিতে হইবে।

সে খুঁজিয়া পাতিয়া করিয়া কর্ম্মিয়া লইবার লোক মোটেই নহে। অথচ এই-সমস্ত কাজ, শেক্সপীয়র গেটে বঙ্কিম রবীন্দ্র ভুলিয়া গিয়া, তার নিজে না করিলে নয়, ইহাই মনে হইয়া তার মন ক্লান্ত ভীত ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। বাসায় ফিরিতে তার পা উঠিতে চাহিতেছিল

না। সে এক-একবার মনে করিতেছিল, বিলাতে যেমন এক এক পরিবার সারা জীবনটা হোটেলেই পরের হেফাজতে কাটাইয়া দেয়, সেও তেমনি কাটাইয়া দিবে, ঘরকন্নার হাঙ্গামা সে ঘাড়ে করিবে না। সব চেয়ে সুবিধা হয় সে যদি প্রেমানন্দের আশ্রমে গিয়া আশ্রয় লইতে পারে! সেই চিন্তাটাই বড় নিশ্চিন্ত আরামের।

যখন বিপিন নিশ্চিন্ত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল, তখন নিশ্চিন্ত থাকিবার সুবিধা পাইয়াও মালতীর নিশ্চিন্ত থাকিতে ভালো লাগিতেছিল না।

মালতী আজ এই অস্থায়ী অচেনা গৃহের সর্ব্বময় গৃহিণী। তাই সে দুঃখের মধ্যেও আনন্দ বোধ করিতেছিল। সে প্রাতঃকালেই স্নান করিয়া পঞ্চাকে বলিল—পঞ্চাদা, হোটেলের ঐ ম্লেচ্ছ নোংরা রান্না ত মুখে রুচবে না; তুমি হোটেলের ম্যানেজারকে বোলে এই ঘরের একপাশে রান্নার হুকুম নিয়ে এস; আমরা বরং ঘরে কলি ফেরাবার খরচ দিয়ে যাব; আর বাজার থেকে একটা লোহার আখা, কাঠ, হাঁড়ি, চাল, ডাল তরকারি সব কিনে নিয়ে এস, আমি রাঁধব।

পঞ্চা বিনা বাক্যব্যয়ে জোগাড় করিতে বাহির হইয়া গেল; মালতী কোমরে কাপড় জড়াইয়া সিক্ত চুল চূড়ার আকারে মাথার উপর তুলিয়া গৃহকর্ম্মে নিজেকে ব্যাপৃত করিয়া দিল।

বিপিন আসিয়া দেখিল, তার করিবার জন্য কিছুই বাকী নাই; মালতী নিজেই সমস্ত জোগাড় করিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। বিপিন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। গৃহকর্ম্মের মধ্যেই রমণীর আসল রূপটি প্রকাশ পায়; বিপিন মালতীকে অত্যন্ত সহজভাবে এই অচেনা জায়গার অসীম অসুবিধার মধ্যে তারই আরামের জন্য গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। মালতীর এই কল্যাণী অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি

দেখিবার সুযোগ বিপিনের কখনো ঘটে নাই। আজ এই দুর্দ্দিনেও তার প্রফুল্ল মুখ ও সুনিপুণ তৎপরতা বিপিনের মন এক নূতন রসাবেশে আপ্লুত করিয়া তুলিল। প্রেমানন্দের মোহ তার মনে যে ব্যবধান রচনা করিতেছিল মালতীর আচরণে আজ তাহা বুঝি ঘুচিয়া যাইবে বলিয়া মনে হইল।

এতদিন সমস্ত সংসার ভুলিয়া সর্ব্বস্বের মূল্য দিয়া বিপিন যাকে চাহিয়াছিল, তাকে আজ পাইয়াছে, আজ উভয়ের মাঝখানে কোনো বাধা নাই, আজ বিপিনের বড় আনন্দের দিন হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আজ কোনো বাধা নাই বলিয়াই মিলনেও কোনো ব্যগ্রতা নাই, আজ বিপিন নিজেই নিজের বাধা হইয়া উঠিয়াছে!

হোটেলে নিষ্কর্ম্মা বসিয়া দুদিন গেল; মালতীকে একা ফেলিয়া বিপিন কোথাও যাইতেও পারে না, আর উভয়ের মধ্যে আবার এমন একটা ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে যে উভয়ের উভয়কে লইয়াই যথেষ্ট বোধ হয় না। বিপিন বসিয়া শুধু গুরুজীর কথা বলে আর ভাবে; আর মালতী ভাবে পুরুষগুলা কি দুর্বোধ্য জাত, একটুখানি স্থিরতা নাই, ধৈর্য্য নাই, নিষ্ঠা নাই, অবস্থার পর অবস্থার ক্ষণিক উন্মাদনা শুধু চাখিয়া ফিরিতে চায়! মালতীর মনে হইতেছিল বিপিনের এই যে সন্ন্যাসগ্রহণের ধূয়া তা তাকে ত্যাগ করিয়া মুক্ত হইবার ছল মাত্র। সত্য বটে জমিদারের ছেলে বিপিন ক্রমাগত আঘাতের পর আঘাত পাইয়া ভাঙিয়া পড়িয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে যে চাহিবে ইহা আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু দুঃখ কি শুধু সেই মালতীর জন্য পাইতেছে, মালতী কি বিপিনের জন্য কোনো দুঃখ স্বীকার করে নাই? হিন্দু বাঙালী ঘরের মেয়ে সে, বিধবা হইয়া বিবাহ করিতে যে স্বীকার করিয়াছে, ইহার জন্য যে লজ্জা ধিক্কার ও লাঞ্ছনা

তাকে উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে, তা যে তার অগ্নিপরীক্ষার চেয়েও ভীষণ! তা কি তুচ্ছ হইল? সেই অগ্নিপরীক্ষা সে যার মুখ চাহিয়া অবাধে স্বীকার করিয়াছিল, সেই কিনা আজ তার সকল আশ্রয় নষ্ট করিয়া দিয়া নিরুপায় অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে? এর চেয়ে অপমান তার নামের মিথ্যা কলঙ্কে বা কুৎসায় ত তার বোধ হয় নাই।

মালতী হোটেলের ঘর হইতে বসিয়া বসিয়া দেখে কত বর বাদ্যযন্ত্রের কোলাহল ও আলোর সমারোহ করিয়া বিবাহ করিতে যাইতেছে; কত বধূ নববিবাহের রঙিন সজ্জায় ম্লান মুখে অপরিচিত স্বামীর সহিত শ্বশুরবাড়ী যাইতেছে। দেখিয়া দেখিয়া তার নিশ্বাস পড়িত; নিজের দুর্ভাগ্য স্মরণ করিয়া লজ্জায় অপমানে তার সমস্ত অন্তর তাকে শত ধিক্কার দিয়া উঠিত।

বিপিনের সহিত একটা শেষ বোঝাপড়া হওয়া দরকার হইয়া উঠিয়াছে। বিপিন যদি তাকে বিবাহ নাই করে তবে বিপিনের কাছে থাকা আর এক দণ্ডও উচিত নয়। পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়ানোও এর চেয়ে সম্মানের, এর চেয়ে সুখের! এই সময় নবকিশোর থাকিলে ঠিক হইত। কিন্তু কেউ যদি সাহায্য করিবার নাই থাকে, তবে তাকে নিজেই নিজের অদৃষ্টের একটা হদিস বুঝিয়া লইতে হইবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা বড় লজ্জার কথা। কিন্তু উপায় আর নাই।

মালতী সঙ্কল্প ও সাহস সঞ্চয় করিয়া বিপিনের কাছে কথাটা যখন উত্থাপন করিতে গেল, তখন সে কথা বলিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সুন্দর মুখের ক্রন্দন জগতে অতুলনীয় সুন্দর। বিপিন বসিয়া

বসিয়া মুগ্ধ নেত্রে দেখিতে লাগিল। অকস্মাৎ তার মনে হইল, না না, এসব মোহ, ইহা মারের মারিবার ফাঁদ। সে তখন বল সংগ্রহ করিয়া মালতীকে বক্তৃতার দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল প্রবৃত্তির বশীভূত হওয়ায় কল্যাণ নাই, এমনি বা এর চেয়েও বেশী বিপদ ঘটিবে; আসল আনন্দ আধ্যাত্মিক মিলনে। গুরুজীর কৃপায় তাদের যথার্থ মিলন ও কল্যাণের আনন্দ লাভ হইবে।

এমন সময় তারক পথ দেখাইয়া মুকুন্দকে হোটেলে লইয়া আসিল। মুকুন্দ পুলিশ-আদালতে ও হাইকোর্টে মোকদ্দমা রুজু করার কথাটা বিপিন ও মালতীকে সালঙ্কারে ও সাড়ম্বরে শুনাইয়া গেল।

বিপিন বলিল—দেখ্‌ছ মালতী, ভগবানের কত রকমের নিষেধ কতবারে কত রকমে আস্‌ছে? চলো আমরা গুরুজীর আশ্রয়ে যাই।

মালতী মিনতির স্বরে বলিল—আর অল্প অপেক্ষা করুন, নবকিশোর-বাবুকে আস্‌তে দিন।

আবার নবকিশোর! মালতী মনে করিতেছিল বিপিনের এই যে ক্ষণিক দুর্ব্বলতা তা নবকিশোরের বলিষ্ঠ মনের আশ্রয় পাইলেই দূর হইয়া যাইবে; নবকিশোরের এমন একটি শক্তি আছে যার দ্বারা সে অনায়াসে তাহাদিগকে সকল তুফান কাটাইয়া বন্দরের ঘাটে পৌছাইয়া নিরাপদে নঙ্গর করিয়া দিবে। সে ভগবানের নিকট অনুক্ষণ প্রার্থনা করিতে লাগিল,—হে ভগবান, নবকিশোরকে শীঘ্র প্রেরণ করো।

এদিকে নবকিশোরের প্রতি মালতীর বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাবকে প্রণয়ের পক্ষপাত মনে করিয়া বিপিন ক্রমশঃ বন্ধুর প্রতিও বিমুখ হইয়া উঠিতেছিল। সে মনে করিতেছিল এত কাণ্ড সব ত নবকিশোরের বুদ্ধিতেই সংঘটিত হইয়াছে। বিপিন ইহার মধ্যে আগাগোড়া তার

বন্ধুর একটা মৎলবের খেলা দেখিতে পাইল। তার এ-সমস্ত কাণ্ড বিপিনের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া সমাজসংস্কারের সুনাম সস্তায় নিজে ভোগ করিবার ফন্দি! উঃ! কি ভীষণ প্রতারণা! বিপিনের সরলতার সুযোগ লইয়া সে তার কি সর্ব্বনাশ না করিয়াছে? পাঠশালার ছুতা করিয়া তিন-তিনখানা তালুক নিজে হস্তগত করিয়াছে; পৈতৃক জমিদারী ও পিতা-মাতার স্নেহ হইতে তারই জন্য বঞ্চিত হইতে হইয়াছে; অবশেষে মালতীরও মন হরণ করিবার ফন্দি খেলাইয়াছে—সে ফন্দিগুলা যে কি তা ঠিক স্পষ্ট এখন জানা না গেলেও নিশ্চয় কিছু আছে, নতুবা মালতী তার জন্য এত ব্যাকুল হইতেছে কেন? এই ফন্দিগুলা যতই বিপিন ঠাহর করিতে পারিতেছিল না, ততই সেগুলাকে নিগূঢ় ভীষণ বলিয়া অনুভব করিতেছিল। গুরুজীর কৃপায় তার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, বিপিন বুঝিয়াছে সংসার মারের মায়াচক্র। বিপিন আর এ মায়ায় ভুলিতেছে না।

এইরূপে আরো দুদিন গেল। তার পরদিন অকস্মাৎ নবকিশোর আসিয়া উপস্থিত হইল। কতক সংবাদ সে তারকের কাছে শুনিয়া আসিয়াছিলন। হোটেলে আসিয়াই বিপিনকে বলিল—বেশ লোক যা হোক! এতদিন এই হোটেলে পড়ে আছ, একটা বাড়ী ভাড়া কোরে নিতে পারনি। নাও ওঠ।

বিপিনের দুর্ব্বলচিত্ত নবকিশোরের সরল বলিষ্ঠ ব্যবহারের পাশাপাশি হইবামাত্রই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সে কুণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেন? কোথায় যাব?

—বাড়ীভাড়া কোরে সব ঠিক করে এসেছি; 'দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ী, বেলা দ্বিপ্রহর' এখন হুজুর চলুন। এখানে 'যেতে নাহি দিব' বল্‌বার কেউ নেই, থাকতে নাহি দিব বল্‌বার আমি হাজির। ওঠ ওঠ, উঠে পড়ো।

বিপিন সবিস্ময় সম্ভ্রমে বলিল—তুমি এলেই বা কখন, আর বাড়ীভাড়া করলেই বা কখন ?

—এসেছি পাঞ্জাব মেলে ভোরে। তারকের কাছে সব শুনেই ছুটে গিয়ে বাড়ীভাড়া কোরে সেখানকার সমস্ত বন্দোবস্ত কোরে এই চলে আস্‌ছি।

বিপিন মুখখানি যথাসম্ভব গম্ভীর করিয়া বলিল—শুনেছ—আদালতে নালিশ করেছে।

নবকিশোর উপেক্ষার ভাবে বলিল—ওঃ! তার জন্যে কিছু ভেবো না মালতী সাবালগ; তার যা খুসি সে করতে পারে, যেখানে খুসি থাক্‌তে পাবে; ওর ভাসুরের ক্ষমতা নাই ওর বিয়ে বন্ধ করে, কি ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

নবকিশোরের এই আশ্বাসবাক্যে বিপিনের মুখ তেমন প্রসন্ন হইল না; সে যেমনটি মনে করিয়াছিল তেমন ত ঘটিল না; তার উপরে সে দেখিল যে মালতী এই কদিন তার কাছে বিমর্ষ হইয়া কাটাইয়াছে, আজ সে উৎফুল্ল হইয়া নবকিশোরের কথা যেন সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়া পান করিতেছে, তার চোখমুখ হাসিতে জ্বলজ্বল করিতেছে, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেন হাসি ঠিকরাইয়া পড়িতেছে।

নবকিশোর কিন্তু বিপিনকে লক্ষ্য না করিয়াই বিয়েবাড়ীর কর্ম্মকর্ত্তার মতন অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল—আদালতের ল্যাঠা চুকে গেলেই চটপট বিয়েটা সেরে ফেল্‌তে হবে। কিন্তু সেখানেও এক মুস্কিল আছে··· আমি আজ নিজে কদিন ধোরে তাই ভাব্‌ছি।

মালতী উৎকন্ঠিত হইয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া নবকিশোরের মুখের দিকে চাহিল। বিপিন উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি ?

নবকিশোর বলিতে লাগিল—ভাব্‌ছিলাম বিয়েটা কি প্রণালীতে

সম্পন্ন হবে। প্রচলিত হিন্দু প্রণালীতে বিবাহ দিতে হলে শালগ্রাম শিলা আর অগ্নিকে ভগবান স্বীকার কোরে বিয়ে করতে হবে, কিন্তু তা যখন আমাদের বিশ্বাসের প্রতিকূল তখন সে বিবাহ-প্রণালী গ্রহণীয় ত নয়ই। আবার শালগ্রাম ও অগ্নি-হোম ত্যাগ কোরে বিবাহ দিলে আইন-সঙ্গত হবে না। আইনের মতে রেজেষ্টারী কোরে বিয়ে হতে পারে, কিন্তু তাতে স্বীকার করতে হয় আমি হিন্দু নই ; এ কথনো স্বীকার করা যেতে পারে না—আমরা হিন্দু, একশবার হিন্দু, আমাদের দেশের এতবড় অতীত ঐতিহ্য ছেড়ে একেবারে অহিন্দু হতে আমরা কথনো স্বীকার করতে পারি না···তা বিয়ের জন্যে তোমরা ভেবো না, একটা উপায় ভেবে ঠিক করবই ! এখন চলো।

সকলে গিয়া জিনিষপত্র লইয়া গাড়ীতে উঠিল। 'নবকিশোর বাবু যা হয় একটা সুব্যবস্থা করবেনই', ভাবিয়া মালতী আশ্বস্ত হইয়া সকল ভাবনা ভুলিয়া গিয়াছিল। কেবল বিপিন ভাবিতেছিল—নবকিশোরের সবই বাড়াবাড়ি। এও একটা বোধ হয় নবকিশোরের ফন্দি! আমার সঙ্গে মালতীর যাতে বিবাহ না হয় তারই একটা চাল !

বিপিন নবকিশোরকে আর তেমন প্রাণ খুলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। আবার তার দুর্ব্বল মন তার প্রতি ভালো করিয়া রাগ করিতেও পারিতেছিল না ; সে মনে মনে নবকিশোরের প্রতি একটু বিরূপ হইয়া থাকিবেও তার এমন শক্তি ছিল না যে সে সেকথা প্রকাশ করিয়া বলে। কাজেই তার রুদ্ধ রোষ পুটপাকের মতো তার অন্তরকে জারিয়া ছাই করিয়া ফেলিয়াছিল, অথচ বাহিরে তার কোনো প্রকাশ ছিল না।

মোকদ্দমা চুকিয়া গিয়াছে। বিপিন এখন স্বচ্ছন্দে মালতীকে বিবাহ করিতে পারে কিন্তু বিপিনের এই মোকদ্দমার আবর্ত্তে পড়িয়া সংসারের প্রতি আরো বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল!—দিনের পর দিন আদালতে যাওয়া-আসার কষ্ট, স্ত্রীলোকসম্বন্ধীয় মোকদ্দমায় সকলের সম্মুখে দাঁড়ানোর লজ্জা, সমস্ত দর্শকের সকৌতুক দৃষ্টির আঘাত, এবং সর্ব্বোপরি বিপক্ষ-পক্ষের উকিলদের অভদ্রোচিত বিদ্রূপাত্মক প্রশ্ন বিপিনকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। সে এই-সকলের মধ্যে ভগবানের মঙ্গলহস্তের স্পষ্ট নিবারণ দেখিতে পাইতেছিল। এদিকে মালতী কিন্তু ডাক্তারের বয়সপরীক্ষা, উকিলের জেরা ও বিদ্রূপ সহ্য করিতেছিল শুধু এত দুঃখের ও অপমানের পর বিপিনের প্রণয়ে সান্ত্বনা পাইয়া পুরস্কৃত হইবে এই আশায় বুক বাঁধিয়া।

যতদিন মোকদ্দমা চলিতেছিল ততদিন মাথা ঘামাইয়াও নবকিশোর বিবাহ দিবার পদ্ধতি একটা মনের মতো খুঁজিয়া পাইল না; কোনোটায় আইনে বাধে, কোনোটায় ধর্ম্মে বাধে। তার মনে হইতে লাগিল কি মুস্কিল! রেজেষ্টারী বিবাহের আইনটা এমন কেন হইল? এতদিন এই আইনটা চলিয়া আসিতেছে অথচ ইহার সংস্কার যে প্রয়োজন তাহা কাহারও মাথায় আসে নাই? কিন্তু যাহা হয় নাই তাহার জন্য দুঃখ করিয়া ফল কি? এখন উপায়? উপায় সে কিছু খুঁজিয়া পাইল না। তবে কি এদের বিবাহ হবে না? তাইত! রফা করিবার মতন লোক ত নবকিশোর নয়।

নবকিশোর যখন বিপিনের বিবাহ ও সংসার পাতাইবার উদ্যোগে ব্যস্ত হইয়া ফিরিতেছিল, বিপিন তখন দিব্য সুযোগ পাইয়া প্রত্যহ পরম নিশ্চিন্তভাবে প্রেমানন্দের আশ্রমে যাতায়াত করিতেছিল। মালতী ভীত

হইয়া উঠিল। বিপিন পাছে মালতীকে স্বার্থপর অধার্ম্মিক বা এমনি কিছু ভাবিয়া তার উপর রাগ করে এই ভয়ে সে বিপিনকে কিছু বলিতে পারিতেছিল না, অথচ তাকে প্রেমানন্দের প্রভাব হইতে রক্ষা করাও আবশ্যক ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছিল। একদিন সে নিতান্ত ভীত হইয়া নবকিশোরের শরণাপন্ন হইল। বিপিন তখন চলিয়া গিয়াছে। মালতী নবকিশোরকে বলিল—আপনার বন্ধু আজকাল কোথায় যাতায়াত করছেন খবর রাখেন কি?

মালতীর ম্লান মুখ ও হতাশাকরুণ স্বর শুনিয়া ভীত হইয়া নবকিশোর বলিল—না। কেন? কোথায় সে যায়?

—সন্ন্যাসীর আখড়ায়। তিনি সন্ন্যাসী হবার সঙ্কল্প করছেন?···

শ্রবণমাত্র নবকিশোর হাহা হাহা করিয়া হাসির রবে ঘর ভরিয়া ফেলিয়া বলিল—বিপিন হবে সন্ন্যাসী!—তাহলে তার গেরুয়া কাপড় কুঁচিয়ে দেবার জন্যে আর আলখেল্লা গিলে কোরে দেবার জন্যে পঞ্চা-দাদাকে, আর তার নিয়ম সংযম পালন করবার জন্যে আমাকেও সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী হতে হবে।—চাই কি তোমারও সন্ন্যাসিনী হওয়া দরকার হতে পারে।···

মালতী নবকিশোরের হাসি ও শ্লেষবাক্যে লজ্জিত ও আশ্বস্ত হইয়াও বলিল—আপনি হাসছেন, কিন্তু আমার বড় ভয় হচ্ছে। তিনি রাতদিন মুখ ভার কোরে বোসে শুধু সন্ন্যাসের কথাই ভাবেন। আমাকে শুদ্ধ সন্ন্যাসিনী হতে বলেন।—বলেন যে আমাদের মিলন ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। আর তাঁর গুরু তাঁকে বুঝিয়েছেন যে এ রকম মিলন ধর্ম্মসঙ্গত হবে না।···

নবকিশোর গম্ভীর ভাবে বলিল—গুরু! গুরু কে? বাঁদরটা শেষ-কালে একটা গুরু কেড়ে বসল নাকি? কে সে?

—তাঁর নাম নাকি প্রেমানন্দ। খড়দায় তাঁর আশ্রম। সেই আশ্রমেই রোজ যান—চিরদিনের জন্যই যাবেন বোলে প্রস্তুত হচ্ছেন।

প্রেমানন্দের নাম শুনিয়া নবকিশোর চিন্তিত হইল! সে প্রেমানন্দকে একদিন দেখিয়া বুঝিয়াছিল যে লোকটার আকর্ষণী শক্তি অসাধারণ এবং আজকাল যে দলে দলে নব্য যুবকেরা বহ্নিমুখ পতঙ্গের ন্যায় তাঁর চেলা হইতেছে এ খবরও তার অবিদিত ছিল না। এই ফ্যাশানের বশবর্ত্তী হইয়া বিবিধ বিক্ষেপে উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত বিপিনেরও সেই দলে সহজে ভিড়িয়া যাওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়।

নবকিশোর অত্যন্ত চিন্তিত হইলেও বাহিরে প্রফুল্লভাব ধারণ করিয়া মালতীকে বলিল—তুমি ক্ষেপেছ? বিপিন হবে সন্ন্যাসী? তোমার কিছু ভয় নেই—তোমার উড়ুক্‌খু পাখীটির ডানাদুটি শীগগির বিবাহের সোনার শিকলে বেঁধে তোমার হাতে দেবো—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

নবকিশোরের প্রতি মালতীর অগাধ বিশ্বাস। সে সান্ত্বনা পাইয়া প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু নবকিশোরের মনের মধ্যে অমঙ্গল আশঙ্কার মেঘ যেন কালো হইয়া চারিদিক ছাইয়া ফেলিতে লাগিল।

নবকিশোর অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া ঠিক করিল তবে আর এদের বিবাহে একদিনও বিলম্ব করা উচিত নয়।

পরদিনই নবকিশোর বিপিনকে বলিল—বিপিন, কোন্ পদ্ধতি অনুসারে বিয়ে হওয়া উচিত আমি ত অনেক ভেবে-চিন্তেও ঠিক কর্‌তে পার্‌লাম না। যে পদ্ধতিতে বিবাহ করা তোমার অভিরুচি বলো, আমি তারই জোগাড় কোরে দেবো।

বিপিন মাথা নত করিয়া বলিল—আমি বিয়ে কর্‌ব না।

নবকিশোর যদি জোর করিয়া বিবাহ দিয়া দিত, বিপিন হয়ত আপত্তি

করিত না। কিন্তু নবকিশোর তারই উপর ভার দেওয়াতেই সে অবকাশ পাইয়া বলিল—আমি বিয়ে কর্‌ব না।

নবকিশোর এই উত্তর শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্রনির্ঘোষে বলিল—লজ্জা কর্‌ল না ঐ কথা মুখে উচ্চারণ করতে? একজন ভদ্রঘরের মেয়েকে সকল আশ্রয় থেকে বঞ্চিত কোরে এতদূর টেনে এনে এখন তাকে প্রত্যাখ্যান কর্‌তে চাও! কাপুরুষ!

নবকিশোরের উষ্ণতায় বিপিনও উত্তপ্ত হইয়া বলিল—ভদ্রঘরের মেয়েকে যে এতদূর টেনে এনেছি তার জন্যে দায়ী আমি, না, তুমি? তুমিই ত আগাগোড়া আমার প্রবৃত্তির ইন্ধনে বাতাস দিয়ে দিয়ে এই দারুণ অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়েছ। এখন আমার চৈতন্য হয়েছে। তুমি নিজে মালতীকে ভালোবাসো, মালতীও তোমায় আমার চেয়ে ঢের বেশী ভালোবাসে? তুমিই মালতীকে বিয়ে করগে।

এতদিন ধরিয়া যে সন্দেহবিদ্বেষের উত্তাপ তিল তিল করিয়া বিপিনের অন্তরে বিপিনেরও প্রায় অজ্ঞাতসারে সঞ্চিত হইতেছিল। তা আজ নবকিশোরের তিরস্কারে হঠাৎ অগ্নিগিরির উৎক্ষেপের ন্যায় বিপিনের মুখ ফুটিয়া তাদের এতদিনের সুখ-সান্ত্বনার সমস্ত আয়োজন এক নিমিষে জ্বালাইয়া পুড়াইয়া খাক করিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িল। এ আগুন নিভাইতে অনেক দিনের চোখের জল লাগিবে, নষ্ট ঐশ্বর্য্য ফিরিয়া পাইতে বহুদিনের শ্রমসাধনার আবশ্যক হইবে।

নবকিশোর বিপিনের কথার বিষে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। মালতীর সাক্ষাতে এমন রূঢ় ও গর্হিতভাবে যে বিপিন এই কথা কেমন করিয়া বলিতে পারিল তা নবকিশোর সহসা ধারণা করিতে পারিল না। সে যে মালতীকে একটুও ভালোবাসে ইহা সে নিজের কাছেই স্বীকার করিত না; কিন্তু বিপিন যখন সেই অতিগুপ্ত খবরটিকে তার

অন্তরের অন্ধকার গুহা হইতে টানিয়া বাহির করিয়া আলোকে প্রসারিত করিয়া ধরিল তখন সেই কথার মধ্যেকার সত্যের সর্ষপপ্রমাণ বীজটি অকস্মাৎ যাদুকরের মায়াবৃক্ষের ন্যায় অঙ্কুরিত পল্লবিত পুষ্পিত হইয়া উঠিল,—তার প্রকাশের সৌন্দর্য্য মোহ আর ঢাকিয়া রাখিয়া অস্বীকার করা গেল না। সে চকিতে মনের মধ্যে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিয়া লইল সেই হেমন্তের স্নিগ্ধ বৈকালে মালতীর সহিত প্রথম সাক্ষাতের দিনেই তার জড়তাবর্জ্জিত সরল সাহস দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়াছিল; তারপর চৌধুরীবাড়ীতে মালতীর নির্য্যাতন দেখিয়া সে সহানুভূতিতে তার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল, মালতীকে সে আশ্বাস ও নির্ভয় দিয়া মালতীর বিশ্বাস লাভ করিয়াছিল; সব শেষে সেই যেদিন তার পিতা মালতীকে বধূরূপে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়া নবকিশোরের মনে ক্ষণকালের জন্যেও আশা ও আনন্দের মোহ রচনা করিয়াছিলেন;—আজও সে-সকলের স্মৃতি তার মনের মধ্যে সজীব হইয়া আছে; সুপ্ত ছিল মাত্র, বিপিনের নির্দ্দয় আঘাতে বেদনায় আর্ত্তনাদ করিয়া এক মুহূর্ত্তে জাগিয়া উঠিয়াছে। নবকিশোর নিজের মন হাতড়াইয়া দেখিয়া মালতীর মুখের দিকে চাহিল। দেখিল সে বিপিনের নির্লজ্জ আঘাতে স্তম্ভিত হইয়া আরক্ত নত বদনে দাঁড়াইয়া আছে। নবকিশোরের মনে হইল এই নির্লজ্জ কাপুরুষের রূঢ় আঘাত হইতে মালতীকে বাঁচাইবার অধিকার ও উপায় তার হাতে আছে। তখন সে নিজের উত্তেজনায় দ্বিধা মাত্র না করিয়া বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল—মূর্খ! তুমি কাপুরুষের মতো একে যদি ত্যাগ করো, আমি কখনো ত্যাগ করতে পারব না। মালতীকে আমি ভালোবাসি এ কথা আমি স্বীকার করছি। মালতী যদি স্বীকার করে, আমিই তাকে গ্রহণ করব।

—বাস্! আজ থেকে তবে আমি খালাস! মালতীর সম্বন্ধে আমার

আর কোনো দায়িত্ব নেই! আমি খালাস!—বলিতে বলিতে বিপিন ঘর হইতে বেগে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু বিপিনের কেবলই মনে হইতে লাগিল এই নিষ্ঠুর বাক্য হয় ত মালতীর হৃদয়ের ঠিক মাঝখানে তীরের মতো গিয়া বিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু যে তীর একবার ধনুক ছাড়িয়া যায় তাকে আর ত ফেরানো যায় না।

মালতীর আজ অপমানের চরম। সে যাকে ভালোবাসিয়া এত দুঃখ সহ্য করিতেছিল আজ সেই অনায়াসে তাকে পরের হাতে ফেলিয়া দিয়া প্রস্থান করিল। মালতী নবকিশোরকে পরমবন্ধু মনে করিয়া শ্রদ্ধা করিত, আজ সেই নবকিশোরের প্রচ্ছন্ন প্রণয় তার কাছে উদ্‌ঘাটিত হইয়া তাকে লজ্জায় মারিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। নবকিশোরের প্রতি তার বন্ধুত্বের নির্ভরকে প্রণয়ব্যাকুলতা বলিয়া ভুল করিয়া তার প্রতি নবকিশোর ও বিপিন উভয়েরই আচরণ মালতীকে চরম আঘাত করিল। তাকে লইয়া পুরুষদের এই নির্লজ্জ কৌতুক তাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। বিপিন যখন ঘর হইতে প্রস্থান করিল তখন মালতী যেন একটা প্রচণ্ড আঘাতে ক্ষণেকের জন্য হতচৈতন্য ও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—চিন্তা করিবার শক্তি পর্য্যন্ত রহিল না। গম্ভীর নিস্তব্ধ নৈশ অন্ধকারে তার হৃদয় যেন আচ্ছন্ন হইয়া গেল, বড় বড় কালো কালো চাকা যেন তার দৃষ্টির সম্মুখে সন্‌ সন্‌ শব্দ করিয়া ঘুরিতে লাগিল, আর তার মধ্যে সবুজ আগুনের হাজারলক্ষ ফুল্‌কি লোষ্ট্রাহত মৌমাছির মতো ভন্‌ ভন্‌ করিয়া উড়িতে লাগিল। তারপর যখন চৈতন্য হইল, গভীর বিষাদে তার হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়িল। তার মনে হইল যেন তার স্বল্পাবশেষ সুখসৌভাগ্য চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে।

তখন অশ্রুজলের একটা বিপুল আবেগ মালতীর বুকের মধ্যে

বার বার ঠেলিয়া উঠিয়া তার কণ্ঠ ও চক্ষু পর্য্যন্ত আকুল করিয়া তুলিতে লাগিল। জগৎসংসারে তার আপনার বলিতে, আহা বলিয়া স্নেহ করিতে, আশ্রয় বলিয়া দাঁড়াইতে, মনের দুঃখ ব্যক্ত করিয়া বলিতে কেহ কোথাও যে নাই, এ কথা কাল ত তার মনে ছিল না,—আজ একি হইল যাতে তার কেবলই মনে হইতেছে বিপিন তার সম্পূর্ণ নির্ভরস্থল নহে? নবকিশোরকেও আর বিশ্বাস নাই। কেন মনে হইতেছে,—এই বিশ্বভুবন অত্যন্ত বৃহৎ ও কঠোর এবং সে বালিকা অত্যন্ত ক্ষুদ্র দুর্ব্বল অসহায়?

দেখিতে দেখিতে অশ্রুজলে তার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কী মর্ম্মভেদী সেই অশ্রুজল! তার মনে হইতে লাগিল, হে ভগবান! আমায় এমন কোনো জায়গা দাও যেখানে আমি আপনাকে এদের সকলের দৃষ্টি হইতে লুকাইতে পারি। হে ভগবান! এস তুমি মৃত্যুরূপে এস! সকল লজ্জা, সকল গ্লানি, সকল দুঃখ, তোমাতে ঢাকা পড়ুক!

মালতীকে ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া নবকিশোর বুঝিল সে নিজের উত্তেজনার বশে নিজের অজ্ঞাতসারে মস্ত একটা আঘাত করিয়া বসিয়াছে। তখন সে নিজেকে মালতী ও বিপিনের নিকট অত্যন্ত অপরাধী বলিয়া মনে করিতে লাগিল। এ অপরাধ ক্ষালনের ক্ষমতা নির্ম্মমভাবে তার অধিকারের বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে, বিপিন বা মালতী তাদের আচরণ দ্বারা এ আচরণটিকে কোনো রকমে ঢাকিয়া না ফেলিলে এই মূঢ়তা চিরকাল তাকে ধিক্কার দিবে ইহা নিশ্চিত বুঝিয়া নবকিশোর নিতান্ত লজ্জিত ও ব্যাকুল হইয়া উঠিল; আপনার নিষ্ফলতায় আপনাকে দগ্ধ করিতে লাগিল; সেও যে বিপিনের সহিত মিলিত হইয়া এমন কদর্য্য অপমানে মালতীকে জর্জ্জরিত করিয়াছে

এই মূঢ়তার বেদনায় সে অভিভূত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া বিচারকের সম্মুখে অপরাধীর মতো নিরুপায়ভাবে শাস্তির অপেক্ষা করিয়া রহিল, ক্রন্দনকাতরা মালতীর কাছে একটি সান্ত্বনার কথাও উচ্চারণ করিতে পারিল না।

কল্পনাপ্রবণ বিপিন যখন দেখিল যে কল্পনা ও বাস্তবে আকাশ-পাতাল প্রভেদ তখন তার দুর্ব্বল চিত্ত স্বভাবতই ভাঙিয়া পড়িতে চাহিতেছিল। বিপিন এখন নিজের ভরসায়, সংসারে দাঁড়াইতে গিয়া দেখিল সে কতবড় অসহায়, সে কতবড় অক্ষম। সে সমুদ্রবক্ষে নৌকার ললিত নৃত্য দেখিয়া ভাবিয়াছিল সেখানে বুঝি শুধু আনন্দের হিল্লোল, সে বুঝি শুধুই মধুর বায়ুর মুখে রঙ্গে ভাসিয়া যাওয়া, সে বুঝি জলখেলা; কিন্তু নৌকার বুকে পা রাখিয়াই সে দেখিল,—দূর থেকে সে বড় ভালো, কাছে গেলে চাঁদে সুধা নাই; কল্পনা ও কর্ত্তব্যে বিষম অন্তর ইহা ত শুধু বসিয়া বসিয়া দোল খাওয়া নয়, এ যে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে সচকিত সচেতন থাকা দর্‌কার, কখনো একটু অন্যমনস্ক হইবার জো নাই, একা হাতে নৌকার জলও সেচিতে হইবে এবং অনভ্যস্ত হাতে প্রাণপণে দাঁড়ও টানিতে হইবে। দক্ষিণে বামে একটু কাত হইলেই একেবারে জলে গিয়া পড়িবার আশঙ্কা অহরহ বুকের পাশে কাঁটার মতো লাগিয়াই আছে। একটু অমনোযোগ, এতটুকু ভুল, একটু নড়াচড়া হইলেই একেবারে সর্ব্বনাশ! আজ তার আশ্রয়স্থান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। সে স্থান তার কোনো কালেই খুব বিস্তীর্ণ ছিল না, কিন্তু নিরাপদ নিশ্চিন্ত নির্ঝঞ্ঝাট ত ছিল। সেই অভ্যাস ও অভিজ্ঞতার বশেই ত সে মনে করিয়াছিল মালতীকে পাইলে তার জীবনটা একটা সুকবির গানের মতো সহজ মোলায়েম সুরে বহিয়া যাইবে। কিন্তু এখন ঠেকিয়া দেখিল সে শুধু মরীচিকা, তার পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরিয়া মরাতে সুখ

থাকিতে পারে, কিন্তু স্বস্তি নাই। সুখ চেয়ে স্বস্তি ভালো। মালতীকে পাওয়ার সুখের পশ্চাতে যে বিষম উদ্বেগ রহিয়াছে, তার আওতায় সেই ভাবময় সুখ কতক্ষণ টিকিবে? প্রেমানন্দ স্বামীর আশ্রমে নিশ্চিন্ত একটু আশ্রয়, অচেষ্টালব্ধ সামান্য অন্নবস্ত্র জুটিলেই বিপিন এখন বাঁচিয়া যায়। মালতীর অদর্শনে তার বুকে তুষের আগুন জ্বলিবে। তা জ্বলুক, তাও এই দুরন্ত দারুণ জীবনসংগ্রামের চেয়ে ঢের সহজে সহনীয়; আর মালতীর বিরহদুঃখের মধ্যেও ত আনন্দ আছে, ভালোবাসিয়া অন্তরের সার্থকতা, প্রেমাস্পদের চিন্তায় তন্ময়তা। মালতীকে ত্যাগ করিয়া সে সন্ন্যাসীর আশ্রমে গেলে মালতীর প্রেম তার নিকট অখণ্ড শাশ্বত সম্পূর্ণ হইয়াই থাকিবে, সেই প্রেমকে সংসারের সংঘর্ষে জীবনের জটিলতায় পদে পদে ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ দেখিতে হইবে না।

বিপিনের সমস্ত সংঘাত হইতে সরিয়া পড়িবার একমাত্র অন্তরায় ছিল মালতী—তাকে বিপিন কোথায় ফেলিবে ঠিক করিতে পারিতেছিল না। গুরুজীর আশ্রমে লইয়া যাইতে পারিত, কিন্তু মালতী ত তাতে সম্মত ছিল না। এইখানেই বিপিনের একটু গোল বাধিয়াছিল। কিন্তু যখন নবকিশোর মালতীর ভার গ্রহণ করিল, এমন কি মালতীকে বিবাহ করিতেও স্বীকৃত হইল, তখন বিপিন মালতীর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইল বটে, কিন্তু নবকিশোরের সৌভাগ্যের ঈর্ষায় জ্বলিতে লাগিল। মালতীকে এইরূপ অবস্থায় ত্যাগ করাতে তার প্রতি বিপিন যে কিছুমাত্র অবিচার করিতেছে তা তার মনে হইল না; মালতী নবকিশোরকে ভালোবাসে, হয়ত বা বিপিনের চেয়ে তাকেই বেশী ভালোবাসে; নবকিশোরকে বিবাহ করিয়াই সে সুখী হইতে পারিবে। বিবাহসম্বন্ধ ত এক মেয়ের কত লোকের সঙ্গেই হয়—অবশেষে যার সহিত বিবাহ হয় সেই ত সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বসে। যদিই বা মালতী বিপিনকে

একটু ভালোবাসিয়া থাকে, তবে সেই ভাব সে দুঃস্বপ্নের মতো দুদিনেই ভুলিয়া যাইবে।

মানুষ যখন কোনো কাজ করিতে নিতান্ত ইচ্ছা করে, তখন তার ধর্ম্ম-বুদ্ধিকে বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করিবার মতো যুক্তির অসদ্ভাব কিছুতেই হয় না। যখন কোনো অশান্তি বা অসুখ উপস্থিত হয়, তখন লোকে নিজের দিকে না চাহিয়া সমস্ত দোষ পরের উপর, নয় অদৃষ্টের উপর চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে চায়।

বিপিন এতদিন প্রত্যেক বাধার মধ্যে ভগবানের নিষেধ দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল; এখন সমস্ত দোষ নবকিশোরের উপর চাপাইবার সুযোগ পাইয়া বিপিন নিজেকে অনেকটা নিশ্চিন্ত ও দায়িত্বমুক্ত বোধ করিতে লাগিল। সে কতকটা প্রফুল্ল ভাবেই গুরুজীর আশ্রমে যাইবার আয়োজন করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু পোঁট্লাপুঁট্লি যতই দড়িদড়া দিয়া কষা হইতে লাগিল, বিপিন অনুভব করিতে লাগিল তার মনের একধারে যেন টান পড়িতেছে, মন যেন বেদনায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিতেছে। যখন তার যাইতে স্পষ্টই কষ্ট বোধ হইতে লাগিল, তখন তার থাকিতেও লজ্জা বোধ হইতেছিল; তার মনে মনে ভারি অভিমান হইতে লাগিল যে নবকিশোর তাকে তিরস্কার করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিল না, মালতী অশ্রুভরা মিনতিতে তাকে সাধিল না। তবু বিপিন প্রস্থান করিতে বিলম্ব করিতে লাগিল, যদি বিলম্বেও কেউ তাকে ফিরাইতে আসে। মালতীকে ছাড়িয়া গেলে তার জীবনের যে কতখানি খালি হইয়া যাইবে তা বিপিন ক্রমশ বিশেষভাবেই অনুভব করিতেছিল।

কিন্তু নবকিশোর বা মালতী সেরূপ প্রকৃতিতেই গঠিত নয় যে যুক্তি যেখানে হার মানিয়াছে, হৃদয়ের যেখানে অবমাননা হইয়াছে, সেখানে গিয়া দয়া ভিক্ষা করিবে। মালতীর আত্মমর্য্যাদার ভাব এবং নবকিশোরের

লজ্জা এমন তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, যে, তারা বিপিনকে আর কোনো অনুরোধ করিতে পারিল না।

বিপিন যখন দেখিল যে কেউই তাকে সাধিতে আসিল না, তখন আহত অভিমানের প্রবল ধাক্কায় বাড়ী হইতে বাহির হইয়া ছিটকাইয়া পড়িবার উপক্রম করিল। কিন্তু তখনো আশা একেবারে ছাড়িতে পারিতেছিল না!

গাড়ীতে মোট তুলিয়া বিপিনের মনে হইল এইবার মালতী তার সম্মুখ দিয়া স্খলিত হইয়া, চিরদিনের মতো অনায়ত্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছে; এখনো ইচ্ছা করিলে সে বাহু বাড়াইয়া তাকে ধরিতে পারে। অল্পক্ষণ ইতস্তত করিয়া বিপিন একটা দীর্ঘনিশ্বাসে সেই দুরাশাকে একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া দিয়া গাড়িতে চড়িতে যাইবে, ঠিক সেই সময় মালতী আসিয়া তাকে বলিল—আমিও যাব।

আনন্দে বিপিনের মন নৃত্য করিয়া উঠিল। মালতী ইচ্ছা করিলে নবকিশোরকে বিবাহ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে; সে সুখ ত্যাগ করিয়া এই নবীন বয়সে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা বুকে পুষিয়া তার সন্ন্যাসিনী হওয়া উচিত নয়;—মালতীকে এমন-সব কথা একবার বলিবার জন্য অভিমান বিপিনকে একটু ইঙ্গিত করিল; কিন্তু বিপিনের প্রণয় তাকে সে কথা বলিতে দিল না, কি জানি অভিমানিনী মালতী যদি সে কথা শুনিয়া সত্যসত্যই থাকিয়া যায়। মালতীর সহিত একই আশ্রমে থাকিলে অন্তত দেখার আনন্দ ত সে পাইবে। তার আভাস ত এখনি সে মনের মধ্যে স্পষ্টরূপে অনুভব করিতেছে। কিন্তু পাছে সে আনন্দ ধরা পড়িয়া তার বৈরাগ্যের মাহাত্ম্য খর্ব্ব হইয়া যায় এই ভয়ে বিপিন যথাসম্ভব গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল।

মালতীর মন কোনো অবস্থাতেই সম্পূর্ণ হাল ছাড়িয়া দিতে জানে

না—তার তেজস্বী মন নৈরাশ্যকে স্বীকার করে না এবং আশাকেও আঁকড়িয়া ধরিয়া একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠে না। মালতীও ঠিক বিপিনের মতোই ভাবিয়াছিল যে বিপিনকে ত সে এখন পাইতেছে না, কিন্তু তাকে চোখে দেখার সৌভাগ্য সে ত্যাগ করে কেন। বিপিনের প্রণয় নানা প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া বেগহীন হইয়া পড়িয়াছিল; সেই নষ্ট বেগ সে ফিরিয়া পাইতে পারিবে যদি মালতী তার প্রণয় দিয়া বিপিনের মধ্যে নূতন আগ্রহ সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারে; রক্তহীন রোগী যেমন অপরের সুস্থ তাজা রক্ত পাইয়া বাঁচিয়া ওঠে, তেমনি বিপিনের অবসন্ন প্রণয় মালতীর প্রণয়ের নিকট হইতে বললাভ করিয়া নূতন হইয়া উঠা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে। মালতী বেশ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিল যে এই পথ ছাড়া তার যাইবার অন্য পথ নাই; সে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল সংগ্রাম যতই কেন বিলম্বিত ও কঠোর হোক না, তার প্রণয়ের জয় নিশ্চিত, কিন্তু অন্য আর যে-কোনো পথের অন্তে তার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে ধ্রুব সর্ব্বনাশ।

তৎক্ষণাৎ আপনার তোরঙ্গ বিছানা গুছাইয়া লইয়া মালতী গাড়ীতে গিয়া চড়িল।

মালতী যখন স্বেচ্ছায় নবকিশোরকে ত্যাগ করিয়া বিপিনের সঙ্গ গ্রহণ করিল তখন নবকিশোর হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, আবার সে নিজের স্বাভাবিক হৃদয়বল যথাসম্ভব আহরণ করিয়া শুচি তেজস্বিতার সহিত বিপিন ও মালতীর নিকট আসিয়া বলিল—তোমরা যাচ্ছ যাও, আমি এই বাড়ীতেই তোমাদের অপেক্ষা কোরে বোসে থাক্‌ব, যেদিন ইচ্ছা হবে ফিরে এসো।—ফিরে তোমাদের আস্‌তেই হবে। বিপিন, তোমার আর আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত তোমাকেই কর্‌তে হবে।

শেষের কথাটা নবকিশোর জোর দিয়া বলিল। মালতী ও বিপিন আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল, নবকিশোরের দিকে কেউই চাহিল না; তারা পরস্পরের দিকেও চাহিতে পারিতেছিল না। গাড়ীর জানালা দিয়া শূন্য দৃষ্টিতে দুজনে দুদিকে রাস্তার চঞ্চল জনপ্রবাহের পশ্চাতে ক্রমশ-অপস্রিয়মান অট্টালিকাশ্রেণীর দিকে চাহিয়া রহিল।

আর নবকিশোর দীন অপরাধীর মতো কুণ্ঠিত পরাজিত স্তব্ধ হইয়া সেই ক্রমশ-দূরগামী গাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিল, তার হৃদয়ের সমস্ত বল তেজ দর্প সাহস বিশ্বাস উৎসাহ যেন একেবারে এক ধাক্কায় ভূলুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এর প্রায়শ্চিত্ত কিসে কেমন করিয়া হইবে তা সে বুঝিতে পারিতেছিল না।

৩৮

যখন মালতী ও বিপিনকে বুকে করিয়া পান্সি উজান ভাসিল তখন মালতীর মন ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল—সংসার ছাড়িয়া এ কোন্ নিরুদ্দেশ যাত্রা! মালতী পান্সিতে বসিয়া দেখিতে লাগিল গ্রাম্যবধূরা রাত্রের মতন জলসঞ্চয় করিয়া লইবার জন্য কলসী লইয়া ঘাটে আসিয়াছে; কেউ কাপড় কাচিতে জলে নামিয়াছে; কেউ ভিজা কাপড়ে ঘড়া কাঁখে করিয়া সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে মুখ ফিরাইয়া ঘোম্‌টার আড়াল হইতে চলন্ত পান্সিখানির দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। তাদের সকলেরই ঘর আছে, কাজ আছে, আপনার বলিয়া যত্ন করিবার লোক আছে; মালতীর কিছু নাই, কেউ নাই, নাই নাই।

পান্সি যখন খড়দায় আনন্দাশ্রমের শ্বেতপাথরের ঘাটের কাছে আসিয়া ভিড়িতেছিল, তখন সূর্য্য ডুবুডুবু। নদীর জল সোনার আলোয় হাসিমাখা চোখের মতো তরল উজ্জ্বল। ওপারে নদীর কোলে-

কোলে কাজল-রেখার মতো অন্ধকার, তটের উপর তরুরাজি ভূরুর মতো একটানা কালো, তার উপর নটকনারঙা আকাশের মাঝে রাঙা রবি যেন সুন্দর নিটোল ললাটে একখানি সোনার ডাগর টিক্লির মতো বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। আশ্রমের শার্শিগুলি অস্তরবির লাল আগুনে ঝিলিক হানিতেছিল ;—শ্বেতপাথরের ঘাটের কোলে তরল জলে সোনার আলো চল্‌কিয়া উঠিতেছিল, যেন রূপসী তরুণীর পানখাওয়া ঠোঁটে হাসির ঝলক।

একখানা ষ্টিমলঞ্চ পিছনে কতকগুলা গাধাবোট বাঁধিয়া হুস হুস করিয়া তরল সোনার ঢেউ ছড়াইয়া, নৌকা নাচাইয়া চলিয়া গেল। গাধাবোটগুলা স্রোতের মুখে গা ভাসান্ দিয়া নিশ্চিন্তভাবে স্থির হইয়া ছিল, যেন কত গম্ভীর বনিয়াদি চাল, যাইবার কিছুমাত্র ত্বরা নাই ; কিন্তু যারা নিজেরা নড়ে না, তাহাদিগকে সংসার নাকে দড়ি বাঁধিয়া নড়ায়, গাধাবোটগুলাকে পশ্চাতে বাঁধিয়া ষ্টিমলঞ্চখানা এই যেন বলিয়া দিয়া গেল।

আপিস-বাবুদের পান্সিগুলি দাঁড়ের টানে, ঝিঁকের জোরে হনহন করিয়া চলিয়াছে ; বাবুদের কেউ তামাক খাইতেছে, কেউ সিগারেট ফুঁকিতেছে ; একজন সৌখীন বাবু মাথায় কোঁচানো চাদর বাঁধিয়া গলা ছাড়িয়া গান ধরিয়াছে—

"প্রাণের অধিক যারে ভালোবাসি।
আমি তারে চোখের দেখা-দেখে আসি॥"

মালতীকে পান্সিতে দেখিয়াই তার গানের সুর সপ্তমে চড়িল। আর একজন বাবু চীৎকার করিয়া বিপিনের উদ্দেশ্যে ডাকিতে লাগিল—ও তিনকড়ি, ও হরেকেষ্ট, নরেন্দ্র, পঞ্চানন, হারাধন,……কে যাচ্ছ বাবা, সাড়া দাও।—তারপর সে উঠিয়া গানের তালে বর্ব্বর ভঙ্গিতে নাচিতে আরম্ভ করিল।

মালতী পান্সির জানালায় মুখ দিয়া এইসব দেখিতেছিল; আর ভাবিতেছিল, পুরুষগুলা সব জানোয়ার নাকি? সে যে নারী, এজন্য সে মনে মনে আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে লাগিল।

বিপিনের এসব কিছুরই দিকে লক্ষ্য ছিল না। একখানা খালি পান্সি তাহারই পান্সির পিছে পিছে আসিতেছিল, তারই মাঝি বাউলের সুরে গান করিতেছিল—

ওরে ডুব্‌ছে নাও, ডুবাইয়া বাও,
ওরে রসিক নাইয়া!
ওরে ভাঙ্গা নাও যে বাইতে পারে
তারে বলি নাইয়া।
ওরে হাল ছেড়োনা ভয় কোরোনা
পারবারে যাইতে বাইয়া,
ও তোর ভাঙ্গা নাও লোণা পানি—
ছাইড়া দিছে খাইয়া।
ওরে পথের মাঝে ফাঁদ পাতেছে
বাজীকরের মাইয়া!

বিপিনের মন এই গানের মিষ্ট সুরের অন্তরালের রহস্যময় অর্থের মধ্যে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছিল। তার মনের মধ্যে সহস্র ভাবসঙ্ঘাত গঙ্গাতরঙ্গে পান্সিখানার মতো তার চিত্তকে দোলা দিতে লাগিল। তার মনে হইতে লাগিল যেন এই গান তাকেই উদ্দেশ্য করিয়া গাওয়া হইতেছে।

বিপিনের পান্সি আসিয়া শ্বেতপাথরের ঘাটের উপর জল চল্‌কাইয়া যখন ভিড়িল, তখন বিপিনের চৈতন্য হইল। বিপিন ও মালতী নৌকার ঘর হইতে বাহির হইয়াই দেখিল তারক ঘাটের রানায়

বসিয়া আছে। তারকও তাদের দেখিল। তারককে দেখিয়া বিপিন ও মালতীর মুখ লাল হইয়া উঠিল; তারকও অপ্রতিভ হইল। কিন্তু লজ্জার ভাব সাম্‌লাইয়া লইয়া তারক দাঁত বাহির করিয়া বলিল—হেঁ হেঁ হেঁ……বিপিন যে! একেবারে জোড়ে! এটা সন্ন্যাসীর আশ্রম, কেলিকুঞ্জ নয়!

তারক দাঁত বাহির করিয়া রহিল এবং তার কুকুরের দাঁতের মতো বড় বড় শাদা দাঁতের উপর সূর্য্যের আলো পড়িয়া চিক্‌চিক্ করিতে লাগিল। তার সেই ব্যঙ্গমিশ্র অসভ্য ভাব দেখিয়া মালতীর মুখ লাল হইয়া উঠিল; ঘোমটা একটু টানিয়া দিয়া মালতী মুখ নত করিল। বিপিনের ইচ্ছা হইল বাঁদরটাকে ধরিয়া গঙ্গার জলে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়; কিন্তু সে ভাব দমন করিয়া কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিল—ভয় নেই হে ধর্ম্মধ্বজ! আমরা দুজনেই সন্ন্যাস গ্রহণ করতে এসেছি!

তারক তেমনি ভাবেই দাঁত বাহির করিয়া বলিল—ও! সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ!

মালতীকে লইয়া এই ব্যঙ্গ মালতীর যে শ্রুতিসুখকর হইতেছিল না তা বিপিন বুঝিতেছিল, কিন্তু সে সন্ন্যাসী, তার ত ক্রোধ করিতে নাই, তাই সে ক্রোধ দমন করিয়া এবার একটু গম্ভীর ভাবে বলিল—না না, আমরা বিয়ে করিনি, করবও না।……তুমি বলেছিলে আমি সন্ন্যাসী হলে তুমি তার জন্যে দায়ী হবে।…এসো তবে তুমিও, তোমাকেও সন্ন্যাসী হতে হবে।

তারক মহা বিপদগ্রস্ত হইয়া গম্ভীর হইয়া বলিল—তোমার ভাগ্য ভালো, তাই এত সহজে গুরুর কৃপা লাভ কোরে সংসারের মায়া কাটিয়ে উঠতে পেরেছ। আমাদের আর এজন্মে কিছু হল না।……

আমি তোমার নৌকোতেই ফিরে যাই, আমার ছোট ছেলেটার আবার ঠাণ্ডা লেগে ব্রন্‌কাইটিস হয়েছে! উহুহু! কি শীতই পড়েছে এবার।… যাও যাও তোমরা দেরি কোরো না, গুরুজী আবার আরতিতে বস্‌বেন।…ওরে মাঝি, আমায় নিয়ে যাবি?…

বিপিন তারককে আর লক্ষ্য না করিয়া মালতীকে লইয়া আশ্রমের ভিতর চলিয়া গেল। তারক হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে ভাবিতে লাগিল—বিপিনটা সত্যিসত্যি সন্ন্যাসী হবে নাকি? ওর অদৃষ্ট ভালো দেখছি, আমি এতদিন গুরুদেবের চরণ সেবা কোরেও তাঁর করুণা পেলাম না, আর বিপ্‌নেটা দুদিনেই তাঁর কৃপায় তরে গেল……যাই, আবার রাত হয়ে যাবে, ঠাণ্ডা লাগ্‌বে। এই মাঝি……

৩৭

প্রেমানন্দ সম্মুখে দুইটা শামাদান জ্বালিয়া একাকী বসিয়া ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। বিপিন ও মালতী আসিয়া তাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। প্রেমানন্দ মুখ তুলিয়া চাহিতেই মালতীর সহিত তাঁর চোখোচোখি হইল। মালতী দেখিল—গুরুজীর চোখদুটি অন্তরের একটি উত্তাপময় জ্যোতিতে উজ্জ্বল! তাঁর দেহ দীর্ঘ কৃশ একগাছি দৃঢ় লাঠির মতো, যেন একটি সতেজ চারাগাছ সূর্য্যে মাথা ঠেকাইবার জন্য পরম উৎসাহে উর্দ্ধে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, একটি আনন্দের দীপ্তি তাঁর সর্ব্বাঙ্গে ঢলঢলায়মান। গুরুজী দেখিতে আশ্চর্য্য তরুণ ও সুকুমার! যুবা বয়সেও শৈশবের অম্লান লাবণ্য তাঁর মুখশ্রীকে ত্যাগ করে নাই। অথচ তাঁর চতুর্দ্দিকে একটি গাম্ভীর্য্য প্রদীপের পার্শ্বে রশ্মিচ্ছটার ন্যায় বিকীর্ণ হইতেছিল।…এই প্রেমানন্দ! ইনি গুরু!

আর প্রেমানন্দ দেখিলেন—জোড়া বাতির আলো মালতীর মুখের উপর পড়িয়া তাকে একখানি প্রতিমার মতো দেখাইতেছে। এ কি অপরূপ সুন্দর মূর্ত্তি! এ যে কল্পনার মতো সুন্দর, মূর্চ্ছার মতো মনোহর, দীপশিখার মতো উজ্জ্বল, বাসন্তী মঞ্জরীর মতো সুকুমার, প্রজাপতির মতো আনন্দ-চঞ্চল, সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর চন্দ্রকান্তমণির অমল মন্দির! একে কল্পনা করিয়াই বুঝি বৈষ্ণব কবি লিখিয়াছেন—

"বিজুরি বাটিয়া কেবা গা-খানি মাজিল গো
চাঁদে মাখিল মুখখানি।
লাবণি বাটিয়া কেবা রস নিঙারিল গো
অপরূপ রূপের বলনি।"

প্রেমানন্দের এই মুগ্ধ দৃষ্টিতে মালতী অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছিল; তার কেমন মনে হইতেছিল এ দৃষ্টি যেন শুধু সৌন্দর্য্যমুগ্ধের প্রশংসার দৃষ্টি নয়। মালার মধ্যে কাঁটার মতো এ দৃষ্টি মালতীকে পীড়া দিতে লাগিল।

মালতীর সঙ্কোচ-কুণ্ঠিত ভাবে চেতনা লাভ করিয়া প্রেমানন্দ বিপিনের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ইনিই মালতী?···সাক্ষাৎ রাধারাণীর মূর্ত্তি! তোমাদের শিষ্যরূপে পেয়ে আমি ধন্য হব; তোমাদের প্রেমের স্ফুলিঙ্গ যেন আমার প্রাণের বিশ্বপ্রেমকে জ্বালিয়ে দ্যায়!···এখন চলো আরতির সময় হয়েছে। আরতির পরে তোমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হবে। আজ থেকে বিপিন তোমার নাম হল স্বরূপানন্দ, আর মালতীর নাম হল রাধারাণী।···

তারপর প্রেমানন্দ উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন—শান্তি! যোগানন্দ!

একটি সন্ন্যাসিনী ও একজন সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রেমানন্দ বলিলেন—শান্তি, ইনি রাধারাণী; তোমাদের নূতন ভগিনী;

এঁকে নিয়ে যাও। লাইব্রেরীর পাশের ঘরটিতে ওঁর থাক্‌বার ব্যবস্থা কোরে দাওগে।—আর যোগানন্দ, ইনি ত তোমাদের পরিচিতই; কিন্তু আজ আর ইনি বিপিনবাবু নন; আজ থেকে ইনিও তোমাদের গুরুভাই, স্বরূপানন্দ!—যাও তোমরা হাতমুখ ধুয়ে শুচি হয়ে ঠাকুরদর্শন কর্‌বে এস।

৪০

মালতী শান্তির সহিত নির্দ্দিষ্ট ঘরে গিয়া দেখিল, ঘরটি গঙ্গার দিকে, ঘরে বসিয়াই গঙ্গা দেখা যায়। তখনও সেই ঘরে অস্তসূর্য্যের লালিমা মার্ব্বেল পাথরের স্বচ্ছ মেঝের উপর দুধে-আলতার মতো টলটল করিতেছিল। তার উপরে পা দিতেই মালতীর ভারি হাসি পাইতে লাগিল,—এই তার বিবাহ! সন্ন্যাসী প্রেমানন্দ তার পুরোহিত! বিধবা সন্ন্যাসিনী শান্তি তার এয়ো! আর মরণ-রাগিণীতে অস্তসূর্য্য গেরুয়া রঙের চাদর টাঙাইয়া তাদের শুভদৃষ্টির আয়োজন করিতেছে! যমের মহিষের মাথার চেয়েও কালো কালো কাকের দল যেন তার বাসরঘরে তোরণমাল্য রচনা করিয়া উড়িয়া যাইতেছে! বড় বড় ষ্টিমারগুলি ভারিক্কি গিন্নির ন্যায় ও ষ্টিমলঞ্চগুলি চটুল কিশোরীর মতো এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিয়া শাঁক বাজাইয়া বিয়েবাড়ী মাতাইয়া তুলিতেছে। পরক্ষণে তার মনে হইল ইহা তার সকল সাধের গঙ্গা-যাত্রার ঘর—এইখানে তাদের তীরস্থ করা হইয়াছে!

তার চিন্তায় বাধা দিয়া শান্তি দুঃখাবসন্ন ধীর কণ্ঠে বলিল—আপনি বসুন, আমি আলো এনে দি।

মালতী বলিল—আলোর কি দর্‌কার দিদি, এখনি ত ঠাকুরদর্শন করতে যেতে হবে।...আমি কি এ ঘরে এক্‌লাই থাক্‌ব?

মালতী দেখিল শান্তির বয়স পঁয়ত্রিশ, মাঝারি আকারের চেহারাটি;

তার মধ্যে কোথাও কোনো চঞ্চলতা নাই; মুখখানি কি এক গভীর বেদনায় ম্লান, কণ্ঠ বিষণ্ণ ধীর। শান্তি বলিল—এখানে একলা থাকাই নিয়ম।

—আপনি কোন্ ঘরে থাকেন?

—আমি আপনার পাশের ঘরেই থাকি।

—আর কজন সন্ন্যাসিনী আছেন?

—সম্প্রতি আমরা চারজন ছিলাম, আপনি আসাতে পাঁচজন হলাম। কথনো কথনো সংখ্যা বাড়ে কমে; যেখানে সেবার দর্কার হয় আমাদের যেতে হয়।

—আপনি এখানে কতদিন আছেন?

—প্রায় ছয় বৎসর হবে।

—কিছু মনে না করেন ত আর-একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।…আপনি এই পথ কেন গ্রহণ করেছেন?

শান্তির চোখ ছলছল করিয়া আসিল। সে বলিল—আমি বড় দুঃখিনী; ঝড়ে নৌকাডুবি হয়ে একদিনে স্বামী পুত্র সর্ব্বস্ব হারিয়েছি; অভাগিনীকে গুরুদেব জল থেকে তুলে চরণে ঠাঁই দিয়েছেন; এখন রাধাকান্তই আমার স্বামীপুত্র সব। গুরুজী বলেছেন যেদিন আমি মেথরের ছেলেকেও বুকে তুলে নিতে পারব, মনে একটুও ঘেন্না হবে না, সেদিন আমি আমার হারানো ছেলে ফিরে পাব। তা কি আমি পার্ব বোন!

মালতী চোখ মুছিয়া বলিল—দিদি, আমি আপনার ছোট বোন, না জেনে কষ্ট দিলাম। আমিও বড় দুঃখী। আমাকে ত আপনি জিজ্ঞাসা কর্লেন না, আমি কি দুঃখে এসেছি।

শান্তিও চোখ মুছিয়া বলিল—আমাদের জিজ্ঞাসা কর্তে নেই।

সন্ন্যাসিনীর আবার কৌতূহল কি? জানি তোমারও দুঃখ আছে, আর সে দুঃখ গভীর দুঃখ। দুঃখ না পেলে ত কেউ বোন ভগবানের দিকে মুখ ফেরাতে চায় না। সব দিয়ে তবে তাঁকে পেতে হয়, সে যে অমূল্য ধন, তাকে কি যে-সে মূল্যে কেনা যায়?

মালতী শান্তির কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিল—আপনি কি মনে করেন যে সন্ন্যাসী না হলে ভগবানকে পাবার জো নেই!

—না, সন্ন্যাসী না হলে তাঁকে পাওয়া যায় না। সে সন্ন্যাসী শুধু গেরুয়া কাপড় পর্‌লেই হয় না, সংসার ছাড়লেও হয় না, সংসারে নির্লিপ্ত মনকে বৈরাগ্যের গেরুয়া রঙে রঙিয়ে যে তুল্‌তে পারে সেই সন্ন্যাসী! গীতায় ভগবান সন্ন্যাসের লক্ষণ নির্দ্দেশ কোরে বলেছেন—

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥

শান্তির মুখে বিশুদ্ধ স্পষ্ট সংস্কৃত শুনিয়া সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া মালতী জিজ্ঞাসা করিল—গুরুজীর মতও কি এই?

—আমরা মূর্খ মেয়েমানুষ, আমরা স্বতন্ত্র মতামত কোথায় পাব? আমরা গুরুজীরই প্রতিধ্বনি মাত্র।

—তবে গুরুজী সংসার ছেড়ে বাইরে এসেছেন কেন?

—যেমন চোখের অতি কাছে জিনিষ রেখে দেখা যায় না, খানিক দূরে ধরে তবে দেখ্‌তে হয়, তেমনি সংসারকে বুঝতে হলে, ভালোবাস্‌তে হলে নির্লিপ্ত হয়ে বাইরে এসে দাঁড়াতে হয়। গুরুজী বলেন তিনি ঘোর সংসারী; বাস্তবিক তাঁর বিশ্বজোড়া প্রকাণ্ড সংসার। সংসারী লোক নিজের গুটিকতক ছেলেমেয়ে স্ত্রী-পরিবার নিয়ে ব্যস্ত থাকে, আর গুরুজী সমস্ত বিশ্বের জন্যে চিন্তিত। যেখানে পীড়িত ক্ষুধিত বিপন্ন—সেখানে গুরুজীর ব্যথিত চিত্ত বুক দিয়ে গিয়ে পড়ে।

—সে-সব সেবা ত আপনারা করেন, গুরুজীর তাতে বাহাদুরী কি?

—সমস্ত বাহাদুরীই তাঁর। হাতপাগুলো কাজ করে আর অদৃশ্য মস্তিষ্ক নিশ্চিন্ত থাকে একথা বলাও যা, আর গুরুজী নিশ্চেষ্ট, আমরাই কাজ করি, একথা বলাও তাই।

—আপনাদের কি কি কর্‌তে হয়?

—পালা কোরে ঠাকুরের সেবা, পশুসেবা, আশ্রমের সেবা, দুঃখীদের সেবা কর্‌তে হয়; গ্রামের ঘরে ঘরে গিয়ে অক্ষম গৃহস্থদের ছেলে-মেয়েদের, বৌঝিদের পড়াতে হয়···সকাল সন্ধ্যায় আমাদেরও লেখাপড়া কর্‌তে হয়।

—আপনারা নিজেরাই পড়েন, না কেউ পড়ান?

—নিজেরাও পড়ি, কখনো কখনো গুরুজীও পড়ান, কোনো বিদ্বান শিষ্য উপস্থিত থাক্‌লে তিনিও পড়ান।

—কি বই পড়েন?

—সব বই, কোনো বাছবিচার নেই। সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস; বাংলা ইংরেজি সংস্কৃত ফার্সী; যার যা খুসি আর যে যা পারে, সে তাই পড়তে পারে।

ইহা শুনিয়া মালতী সন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—এখানে কি অনেক বই আছে?

—অনেক। এই পাশের ঘরেই পাঠাগার।

—এখানে পুরুষ কতজন আছেন?

—এখন মাত্র তিনজন আছেন। আর সকলে প্রচার ও সেবা কর্‌তে বেরিয়েছেন।

—আর-একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ব, কিছু মনে কর্‌বেন না।···স্ত্রী-পুরুষে একত্র একবাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা, এটা······

শান্তি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তেমনি শান্তভাবে বলিল—বিপদের আশঙ্কা যে নেই তা নয়, কিন্তু কখনো কিছু অন্যায় ত ঘটেনি। সকলেই খুব গভীর একটা বেদনা নিয়েই এখানে আসে, তারপর গুরুজীর উপদেশ মেনে আর নিয়মে থেকে সকলেই বেশ সংযত হয়ে যায়।

মালতী কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—কিন্তু স্বভাব কি একেবারে অতিক্রম করা যায় ?

শান্তি বলিল—জানি না যায় কি না। কিন্তু গুরুজী বলেন যায়। যোগের দ্বারা আত্মশাসন সহজ হয়।

যোগের দোহাইএর পর আর কথা চলিল না। একটা সন্দেহকে আর-একটা না-জানা বিষয় দিয়া চাপা দেওয়া বড় সহজ। মালতী নিরুত্তর হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল। শান্তি বলিল—চলুন, আরতির সময় হয়েছে।

তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া শুচি হইয়া মালতী যখন ঠাকুরঘরে গেল তখনই আরতি সমাপ্ত হইল। গুরু তখন কীর্ত্তন গান আরম্ভ করিলেন,

"বদনচান্দ কোন্ কুন্দারে কুন্দিল গো,
কে না কুন্দিলে দুই আখি।
দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ যেমন করে
সেই সে পরাণ তার সাখি॥

* * * * *

রতন কড়িয়া কেবা যতন করিয়া গো
কে না গড়াইয়া দিল কানে।
মনের সহিত মোর এ পাঁচ পরাণ গো
যোগী হইল ওহারি ধেয়ানে॥

* * * * *

করভের কর জিনি বাহুর বলনি গো
হিঙ্গুলে মঢ়িত তার আগে।
যৌবন-বনের পাখি পিয়াসে মরয়ে গো
উহারি পরশ-রস মাগে ॥"

মালতীর এ গান গুরুজীর মুখে ভালো লাগিল না। তার মনে কেবলি প্রশ্ন উঠিতে লাগিল—এ কি ধর্ম্মসঙ্গীত?

৪১

গান সমাপ্ত করিয়া প্রেমানন্দ আপনার কক্ষে আসিয়া বসিলেন; সমস্ত শিষ্য-শিষ্যারাও আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিল। প্রেমানন্দ মালতীকে বলিলেন—কেমন রাধারাণী, তোমার এই নূতন জীবনের আরম্ভ কেমন লাগছে? সাধন কর্‌তে কর্‌তে দেখবে যে ত্যাগে নির্ম্মল শান্তি, ভোগে উল্লাস মাত্র। ব্রহ্মচর্য্যই মানুষের একমাত্র ধর্ম্ম; সেই ধর্ম্ম নিষ্ঠার সহিত পালন কর্‌তে পার্‌লে জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন হয়; সেই যে বিবাহ, তার আনন্দের সীমা নাই। জীবাত্মা পত্নী, পরমাত্মা স্বামী; তিনি শ্রীকৃষ্ণ, আমরা গোপী; এই পরমভাব অন্তরে পরিস্ফুট হলেই মানুষের সকল দুর্গতি দূর হয়। এই পথ নিতান্ত দুর্গম বা আনন্দহীনও নয়; একটু চেষ্টা কোরে একবার অন্তরকে অনন্তের সুরে মিলিয়ে যদি দিতে পারো তাহলে দেখতে পাবে যে এ জীবন তানলয়যুক্ত একটি সঙ্গীত,—তা একদিকে যেমন নিজে স্বতন্ত্র আর-একদিকে বিশ্বের একতান সঙ্গীতের সঙ্গে মিল গেঁথে চলেছে। যদি তুমি শুধু তোমার নিজের সুরটিই বাজাও তবে তাতে কোরে একটি পরিপূর্ণ সঙ্গীত হবে না; তোমাদের প্রাণের মধ্যে যে ভালোবাসার সুর বেজেছে, তাকে রাগিণীতে বাজিয়ে তুল্‌তে হলে বিশ্বের অপর সুরের সঙ্গে অনুকূলভাবে মিলিয়ে তুল্‌তে হবে। কেমন? কথাটা ঠিক বুঝতে পার্‌ছ ত?

মালতী আঘাতের পর আঘাত পাইয়া পাইয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; সবশেষে যখন তার সৌভাগ্যতরণী সাতঘাটের জল খাইয়া, ঝড় তুফান কাটাইয়া বন্দরে ভিড়িতে যাইতেছিল, ঠিক সেই সময় এই একটা কোথাকার কে সন্ন্যাসী গুপ্ত শৈলশৃঙ্গের মতো, চোরা বালির মতো, অকস্মাৎ কুহক বিস্তার করিয়া তা বানচাল করিয়া দিয়াছে, হয়ত বা ঘাটে আসিয়া ভরাডুবি হইবে; এজন্য মালতীর মন প্রেমানন্দের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিল না। সে প্রেমানন্দের প্রশ্নের উত্তরে নিতান্ত মুখরার মতো বলিল—আমি আপনার শিষ্যা হবার যোগ্যা নই, ওসব কথা আমি বুঝতে পারছি না। আমি মূর্খ মেয়েমানুষ, আমার প্রগল্ভতা মাপ করবেন। আমার মনে হয় যে বিশ্বপ্রেমের একতান সঙ্গীতে যোগ দেবার আগে নিজের হৃদয়-যন্ত্রকে ভালো করে ঠিক সুরে বেঁধে নিতে হবে; তা যদি না হয়, তবে ত বেসুরো যোগ দিয়ে সমস্ত সঙ্গীতকেই নষ্ট পণ্ড কোরে ফেলা হবে। আমরা কোনো জিনিষকে ত ভালো বোলেই ভালো বলিনে, ভালো বাসি বোলেই ভালো বলি; মানুষকে যদি আগে ভালোবাসি তবেই সে আমার চোখে সুন্দর হয়ে দেখা দেবে, তার সকল ত্রুটি মার্জ্জনা করা প্রেমেই সহজ হয়ে উঠবে।

প্রেমানন্দ মালতীর নিঃসঙ্কোচ কথা শুনিয়া খুসী হইয়া বলিলেন—তাই ত। সেই কথাই ত আমিও বলছি। সংযমসাধনার দ্বারা আপনার হৃদয়যন্ত্রকে বেঁধে তুলতে পারলেই বিশ্বসঙ্গীতে সে হৃদয় আর বেসুরো বাজবে না; তখন সকলকেই বেশ ভালো লাগবে।

মালতী বলিল—সেই ভালো লাগা কি সন্ন্যাস ছাড়া হয় না? মানুষ যখন একজনকে ভালোবাসতে শেখে তখনই যে তার কাছে সমস্ত জগৎ মধুময় হয়ে ওঠে।

প্রেমানন্দ হাসিয়া বলিলেন,—রাধারাণী, তুমি সম্ভোগ আর প্রেমকে

এক কোরে ভুল কর্‌ছ। আমি ত তোমাদের মিলনকে বাধা দিচ্ছি না, তোমাদের সম্ভোগের লালসাকে দমন কোরে আধ্যাত্মিক মিলনে যোগযুক্ত হতে বল্‌ছি।

—ভগবানকে ভালোবেসে মানুষকে ভালোবাসা সহজ, না, মানুষকে ভালোবেসে ভগবানকে ভালবাসা সহজ?

—দুইই সমান। এক অপরের নামান্তর। যত্র জীব তত্র শিব। কিন্তু তাই বোলে একটিকে বুকের কাছে আঁক্‌ড়ে বোসে থাকা মোহ মাত্র, তাতে কোরে ভগবানকে পাওয়া যায় না।

—তা হলে কি সংসারধর্ম্ম পালন করা অপকর্ম্ম? সংসারে থেকে তা হলে ভগবানকে পাওয়া যায় না?

—যায় না, এমন কথা বলা যায় না; তবে পাওয়া বড় কঠিন, যাঁরা নিস্পৃহ উদাসীন অথচ ভগবদর্পিতপ্রাণ সংসারী, তাঁরা পেতে পারেন। কিন্তু সে রকম ব্যক্তি দুর্লভ। জলে ডুব্‌ব অথচ গায়ে জল লাগবে না, এমন কৌশল সকলে অবলম্বন কর্‌তে পারে না; তেমন লোক কোটিকে গুটিক মেলে।

—তা হলে আপনি কি বল্‌তে চান যে ভগবান লোকগুলোকে ভোগাবার জন্যেই ভবসংসারে পাঠিয়ে আপনি এড়িয়ে এড়িয়ে বেড়াচ্ছেন? সংসার ত্যাগ না কর্‌লে তাঁকে পাবার জো নেই বল্‌ছেন। তাঁকে পাওয়াই যখন মানুষের জীবনের প্রধান লক্ষ্য তখন সকলেরই সংসার ত্যাগ কোরে বনে যাওয়া উচিত। সংসার নষ্ট কর্‌বার জন্যেই কি তবে ভগবানের সংসার সৃষ্টি।

প্রেমানন্দ হাসিয়া বলিলেন—"সংসার" যদি জীবের পরিণতির অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির Stage of Development হয়, তা হলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হলে সংসার ত নষ্ট হবেই। সে হিসাবে সংসার নষ্ট করার জন্যই

সংসারের স্থষ্টি বল্‌তে পারো। তা ছাড়া জীবনের উন্নততম আদর্শ মাত্রেই সংসার নষ্ট করার অনুকূল। বুদ্ধ খৃষ্ট প্রভৃতির আদর্শ ত অনুকরণীয়, কিন্তু সকলেই যদি সে আদর্শে চলে তবে সংসার নষ্ট হতে একটি দিনও লাগে না। কিন্তু সে ভয় তোমার কর্‌তে হবে না, সবাই বনে গেলে বনই আবার সংসার হয়ে উঠবে। সংসার ঠিক চল্‌বে, সংসার যে মানুষের কর্ম্মফলভোগের ক্ষেত্র! আমরা সংসার ছেড়ে এসেছি বোলেই যে সংসারকে এড়িয়ে যাব তার ত জো নেই, কর্ম্ম ত আমাদের কর্‌তে হবে, এবং সেই কর্ম্মই আমাদের অনেককে সংসারে টেনে নিয়ে যাবে। সংসারে বৈরাগ্য ত আর পূর্ণ সৌভাগ্য নয়, আংশিক; ভগবানকে যতক্ষণ না পাব ততক্ষণ ত আর পূর্ণ নিষ্কৃতি নেই। সেই অংশকেই পূর্ণ কোরে তোল্‌বার চেষ্টা কর্‌তে হবে। ভগবান যখন তোমাদের ডেকে নিতে চাচ্ছেন, তখন কি তোমাদের উচিত হবে বিমুখ হয়ে বেঁকে বোসে থাকা।

মালতী তর্ক হইতে নিরস্ত হইল। তখন প্রেমানন্দ সাংখ্য মীমাংসা বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনের মত আলোচনা করিয়া এমন একটা প্রচণ্ড পাণ্ডিত্যের খিচুড়ি তৈরি করিলেন যে তাহা মালতীর পক্ষে অত্যন্ত গুরুপাক। বিপিনও চিরকাল কাব্যের সেবা করিয়া আসিয়াছে, দর্শনের দর্শন তার ভাগ্যে ঘটে নাই, এবং দর্শন তার কাছে সুদর্শন চক্রের ন্যায় নামে চমৎকার হইলেও বাস্তবিক বড় ভীষণ বোধ হইত। সে গুরুজীকে পাণ্ডিত্যের ভেল্কি খেলাইয়া মালতীর বাক্‌ রোধ করিতে সক্ষম দেখিয়া মনে মনে ভারি সন্তুষ্ট হইল! গুরুজীর প্রতি ভক্তি তার বিস্ফারিত চোখ দিয়া ঠিকরিয়া পড়িতে লাগিল।

গুরুজীর বাক্য তার নিকট যতই দুর্ব্বোধ ঠেকিতেছিল, তার ততই মনে হইতেছিল এসব যুক্তি একেবারে অকাট্য। মালতী

নিশ্চয় গুরুজীর পাণ্ডিত্যের কাছে পরাজিত হইয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

গুরুজী বক্তৃতা করিয়া মালতীর মুখ বন্ধ করিলেন বটে, কিন্তু তার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে তার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁর সহিত এমন করিয়া কেউ কখনো তর্ক করে নাই; যে কেউ তাঁর নিকটস্থ হইয়াছে সেই তাঁর প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া বিনীত শিষ্যের দলে ভিড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু মালতী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের লোক। এজন্য প্রেমানন্দের মনের কাছে মালতী খুব বড় স্পষ্ট হইয়া রহিল।

পরদিন বিপিন ও মালতীকে প্রেমানন্দ স্বামী সন্ন্যাসে দীক্ষিত করিয়া তাহাদিগকে প্রেমযোগ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বাক্যমনের সংযমের জন্য তাদের প্রতি প্রত্যহ লক্ষ কৃষ্ণনাম জপ করিবার আদেশ হইল; সে জপ একদিন মালাতে এবং একদিন কাগজে লিখিয়া করিতে হইবে।

গুরুজী প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে শিষ্যদের কাছে শাস্ত্রপাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করেন; ব্যাখ্যার পর কীর্ত্তন করেন। এই অবসরে প্রত্যহ তিনি দেখিতে লাগিলেন যে বিপিন ও মালতীর ব্যাকুল দৃষ্টি ঘন ঘন অভিসার করে এবং চকিতে মধ্যপথে মিলিত হইয়া লজ্জাভরে ফিরিয়া আসে। তারা কৃষ্ণনাম লিখিতে লিখিতে অনেক সময় ভুলিয়া নিজেদের প্রেমাস্পদের নাম লিখিয়া ফেলে এবং গুরুজীর কাছে ধরা পড়িয়া এমন একটি সলজ্জ আনন্দের ভাবে পরস্পরের দিকে চুরি করিয়া তাকায় যে তাহা অনির্ব্বচনীয়।

এই দুটি ব্যাকুল প্রাণের শান্ত নীরব প্রণয়লীলা গুরুজীর মনে প্রথম প্রথম একটি অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দরসের সঞ্চার করিতে লাগিল

এবং সেই জন্যই তিনি বিপিন ও মালতীর প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিতে লাগিলেন।

তাহাদিগকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে গিয়া গুরুজী দেখিলেন যে এই দুটি লোকের কাছে তাঁর আসন অন্তত একজনের নীচে। এমন ঘটনা গুরুর অভিজ্ঞতায় এই নূতন; তাঁর আশ্রমে আসিয়াছে, অথচ তাঁর চেয়ে অন্য লোকের প্রতি বেশী আকর্ষণ, এমন লোক তিনি এই প্রথম দেখিলেন। তাঁর সকল ভক্ত শিষ্য তাঁকেই ঈশ্বরের আসনে বসাইয়া পূজা করিয়া আসিতেছিল; আজ বিপিন ও মালতীর কাছে তিনি সর্ব্বপ্রথম ব্যক্তি নহেন; এতে তাঁর অহঙ্কার আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া দেখিতে দেখিতে ক্রূর হইয়া উঠিল। সংযমসাধনের জন্য বিপিন ও মালতীর মধ্যে দৃষ্টি-বিনিময় না হয় গুরুজী এমন ব্যবস্থা করিলেন।

গুরুজী নিজের অজ্ঞাতসারে মনের সমস্ত অহঙ্কার ও লালসা চুয়াইয়া নিজের প্রাণপ্রদীপ ভরিয়া রাখিয়াছিলেন, অপেক্ষা ছিল একটি জোরালো প্রতপ্ত স্ফুলিঙ্গের। তাঁর দুর্ভাগ্যক্রমে বিপিন ও মালতী চকমকি ও ইস্পাতের মতো নিজেদের প্রণয়সংঘর্ষণে যে দীপ্ত অগ্নিকণা বিকীর্ণ করিতেছিল তাহা গুরুজীর প্রাণপ্রদীপখানি জ্বালাইয়া দিল। গুরুজী এই নূতন আলোকে ছন্নদৃষ্টি হইয়া বিপিন ও মালতীর দৃষ্টি আবরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

গুরুজী বিপিনকে বুঝাইয়া দিলেন যে সাধনের প্রথম অবস্থায় মালতীর সহিত সাক্ষাৎ তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে বিঘ্ন জন্মাইতেছে। অতএব তাদের এক্ষণে পরস্পরকে দেখা দেওয়া উচিত নয়। মন স্থির হইয়া গেলে তারা স্বচ্ছন্দেই পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবে। বিপিন গুরুজীর আদেশ শিরোধার্য্য

করিয়া মালতীকে এড়াইয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু মালতী বিপিনকে এড়াইবার জন্য বিশেষ কিছু ব্যস্ত হইল না; তার যে আধ্যাত্মিক পথে দ্রুত অগ্রসর হইবার কিছুমাত্র ত্বরা আছে এমন লক্ষণ সে একেবারেই দেখাইল না।

কিন্তু চেষ্টা করিয়াও মালতী আর এখন বিপিনকে দেখিতে পায় না। গুরুজী এখন স্ত্রী ও পুরুষ শিষ্যদিগকে পৃথক ভাবে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন; এবং স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা যে আধ্যাত্মিক বিঘ্নকর ইহা এখন তিনি মুক্তকণ্ঠে যখন-তখন প্রকাশ করেন।

মালতী বিপিনকে অন্তত দেখিতে পাইবার লোভেই এই সন্ন্যাসীর আশ্রমে আসিয়াছিল; সে আধ্যাত্মিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষায় লুব্ধ হইয়া আসে নাই। এখন সেই একমাত্র অবশিষ্ট সুখটুকু হইতেও বঞ্চিত হইয়া এই আশ্রমবাস তার নিকট কষ্টকর কারাবাস হইয়া উঠিল। সে সুযোগ খুঁজিয়া যদি বা কখনো বিপিনের কাছাকাছি হইত, গুরুজীর ও আধ্যাত্মিক বিঘ্ন হইবার ভয়ে বিপিন তাকে দেখা দিত না। সে অকস্মাৎ কখনো বিপিনের গৈরিক উত্তরীয়ের চঞ্চল আভাস দেখিয়া চমকিয়া উঠিত, বিপিনের দূরাগত কথা আসিয়া ক্ষণে ক্ষণে তার বুকে বাজিত। বিপিন তার কত কাছে অথচ কী সুদূর! তার সেই আর্ত্ত জীবনের সহিত কী নিদারুণভাবে বিচ্ছিন্ন! মালতীর দিনগুলি একটার পর একটা বোঝার মতো নামিয়া যাইতে লাগিল। তার মনে হইতে লাগিল সময় যেন প্রকাণ্ড একটা অরূপ সূতার গুলি এবং দিনগুলি যেন লম্বা ধূসর বর্ণের সুতা, সেই গুলি হইতে সূতা ক্রমাগতই খুলিয়া খুলিয়া আসিতেছে, তার অন্ত নাই, অবসান নাই, জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এই ধূসর ক্লান্ত দিনগুলি

এমনি উদাস-বিষন্ন ভাবেই আসিবে ও যাইবে এবং আমরণ তাকে এই আশ্রমে গুরুজীর শুষ্ক কঠোর উপদেশামৃত হজম করিবার দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

মালতীর মনে তার পূর্ব্ব অবস্থার যে-সব আনন্দমধুর ভাবরস সঞ্চিত হইয়া ছিল সেই-সব ভাবস্মৃতি আজ তাকে একাকিনী পাইয়া তার মস্তিষ্কের মধ্যে গুঞ্জন করিতে লাগিল; তার কেউ সঙ্গিনী ছিল না যে দুদণ্ড তার সঙ্গে কথা কহিবে বা তার কাছে নিজের বেদনা উজাড় করিয়া হৃদয় লঘু করিবে; তার যত কিছু সুখদুঃখ চিন্তাভাবনা সবখানিই তার নিজের একলার; সেই-সব অতীত ও অনাগত ভাব ও আশা আলো-আঁধারের জাল বুনিয়া তার চারিদিক ঘিরিয়া দিতে লাগিল। সে জালের ত অন্ত নাই, ঘিরিয়া ঘিরিয়া তার দৃষ্টি ঝাপ্সা করিয়া তুলিল, আলোয় আঁধারে গলাগলি হইয়া তার যেন শ্বাসরোধ করিবার উপক্রম করিল। কখনো কখনো তার চিন্তা যেন অকূল অপার সাগরের মতো দিক্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িত; ভীষণ গর্জ্জনে কালো কালো ঢেউ যেন তাকে গ্রাস করিতে আসিত; তখন সে চোখ বুজিয়া মনে করিত নিজেকে ছিন্ন করিয়া লইয়া এখান হইতে কোথাও পলায়ন করিবে,—দূরে—দূরে—সে বহুদূরে,—তার মাসিমা যেমন সংসার অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন তাহা অপেক্ষাও অনেক দূরে—সে পলায়ন করিবে, সে পলায়ন চিরজন্মের পলায়ন, তার পশ্চাতে প্রত্যাবর্ত্তন থাকিবে না, এই ধূসর দিনের মধ্যে এই দুঃসহ দুর্ব্বোধ অবস্থায় আর সে কখনো ফিরিয়া ধরা দিবে না।

যখন মালতীর নিজের এই নিঃসঙ্গ দারুণ অবস্থা দুঃসহ বোধ হইত তখন সে মাঝে মাঝে পড়িতে চেষ্টা করিত। পড়িতে পড়িতে মনে হইত

সে যেন আর এই সন্ন্যাসীর আশ্রমের লোক নয়, সে যেন কোন্ আনন্দ-লোকের অধিবাসী, কিন্তু বই বন্ধ করিলেই মনে হইত সে যেন আনন্দের মন্দিরচূড়া হইতে একেবারে দুঃখের তিমির গহ্বরে পতিত হইয়াছে। তখন সে প্রায়ই ভগবানের উপাসানা করিতে বসিত এবং উপাসনান্তে মনে হইত যেন তুষারশীতল চন্দনবাসিত তাঁর চরণামৃতে হৃদয়ের সমস্ত জ্বালা ধুইয়া মুছিয়া জুড়াইয়া গেছে।

ওদিকে বিপিনের গুরুজীর প্রতি অচলা ভক্তি এবং সংযম অভ্যাসের প্রতি অসাধারণ আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তারও অবস্থা ক্রমশ অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিতেছিল। বিপিন সংসারের অবস্থা-পরম্পরার আঘাতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া কোথাও একটু নিশ্চিন্ত আশ্রয় পাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল; এখানে আসিয়া বিপিন নিশ্চিন্ত আশ্রয় পাইয়াছে, এবং সেইজন্যই এখন তার মন মালতীর অভাব বিশেষ করিয়াই অনুভব করিতে পারিতেছে। আধ্যাত্মিক মিলন প্রভৃতি বড় বড় কথা শুনিতে যেমন চমৎকার, জীবনক্ষেত্রে বিপিনের তাহা তেমন লোভনীয় বোধ হইতে ছিল না। জীবনের বিরুদ্ধ ঘাত-প্রতিঘাতে চঞ্চল হইয়া বিপিন নিজের প্রণয়ের প্রতি তাকাইয়া দেখিবার অবসর পায় নাই; এখন তাকে নিশ্চিন্ত দেখিয়া মালতীর প্রতি তার প্রেম আকার ধারণ করিয়া, জীবন গ্রহণ করিয়া, জাগ্রত হইয়া, মোহন রূপে একেবারে চোখের সামনে উপস্থিত হইল। বিপিন কাব্যসাহিত্যে প্রেমের কথা যত-কিছু পড়িয়াছিল সমস্তই সে দেখিল তারই হৃদয়ের তুচ্ছ প্রতিধ্বনি। মালতী যখন আশ্রমে আসিতে চাহিয়াছিল, তখন বিপিনের অন্তর পুলকিত হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু এখন সে দেখিতেছে মালতীর এখানে আসা না-আসা সমান। মালতী উপরের ঘরে থাকে, সে থাকে ঠিক তারই নীচের ঘরে—একখানি ছাদ মাত্র ব্যবধান, কিন্তু সে-ই কত দূর! মালতী উত্তর-

মেরুতে থাকাও যা, এখানে অদর্শনীয় হইয়া থাকাও তাই। মাথার উপর ঘরের মেঝের কার পদশব্দ, জিনিষ রাখার খুটখাট শব্দ হয়,—হয়ত সে-সব মালতীরই অস্তিত্বের পরিচয়, কিন্তু সে-সব যেন হৃদয়ের মাঝে স্মৃতির স্পন্দন, দেখিবার নয়, শুধু অনুভবে বুঝিবার। মালতীকে তার যতই দুর্লভ মনে হইতে লাগিল, ততই তার আবেগময় চিত্ত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবার উপক্রম করিতে লাগিল। থাকিয়া থাকিয়া তার মনে হইত সম্মুখে সমস্ত জীবনই ত পড়িয়া আছে—তার অতৃপ্ত উপবাসী জীবন; তাহা কি সে এমনই দুশ্ছেদ্য সঙ্কটজালে জড়াইয়াই রাখিবে, না, একদিন সবলে দুই হাত দিয়া সকল জাল-জঞ্জাল দূর করিয়া দিয়া নিজের ক্ষুধা মিটাইবে। এখন মালতীকে একেবারে হারাইতে বসিয়া কৃপণের মতো মালতীর পায়ের ধ্বনিটুকু, কাশির শব্দটুকু, চাবি বা চুড়ির টুনটুনিটি, আবছায়া মূর্ত্তির চকিত দৃষ্টিটি কুড়াইয়া বেড়ানোই বিপিনের কাজ হইয়া উঠিল। মালতীর অস্তিত্বের পরিচয় পাইবার জন্য বিপিনের সর্ব্বেন্দ্রিয় সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া থাকিত, আর যখনই সে মালতীর অস্তিত্বের এতটুকু চিহ্ন ধরিতে পারিত তখনই সে আনন্দে গদ্‌গদ হইয়া উঠিত। এই নিভৃত গঙ্গাতীরে মনোরম উদ্যানে বিশ্বসঙ্গীতের মাঝখানে সে আপনার আরাধ্যা দেবীর ধ্যানমূর্ত্তির নিকটে আপনার হৃদয়কে ধূপের মতো দগ্ধ করিতে লাগিল। একদিকে পাহারা দিতে দিতে গিয়া বিপিন আর-সব দিকে অমনোযোগী ও অন্যমনস্ক হইয়া উঠিতেছিল; সে নাম জপ করিতে করিতে উদাসভাবে বসিয়া থাকিত, একটু শব্দ শুনিলেই চমকিয়া উঠিত।

মালতীরও অবস্থা বিপিনেরই অনুরূপ হইয়া উঠিয়াছে। মালতী নিশ্চিন্ত হইয়া শয্যায় অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না; রাত্রে সকলের সুপ্তির স্তব্ধতার মাঝখানে সে একা বারান্দায় উঠিয়া দিয়া গঙ্গার দিকে

চাহিয়া চাহিয়া ভাবে—জীবনটা ত এমনি একটানা মধুস্রোতের মতো ভাসিয়া যাইতে পারিত! বিপিনকে সে কত ভালোবাসিয়াছিল; কিন্তু আজ এমন অবস্থা আসিয়াছে যে বিপিনের জন্য বেদনা বোধ করা তার পক্ষে লজ্জাকর। অথচ সে বিপিনকে বিচার করিয়া অপরাধী করিতেও চায় না। কেন সে দুর্দিনের জন্য একটা দৈব দুর্বিপাকের মতো চৌধুরী-পরিবারে গিয়া পড়িয়াছিল, সে ঘূর্ণী উড়াইয়া তার আজন্মের স্নেহনীড় হইতে বিপিনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিয়াছে, কিন্তু নিজের সঙ্গেও ত মিলাইতে সে পারিল না; এর চেয়ে তার বাপের ভিটায় পড়িয়া থাকিয়া মরা যে শতগুণে ছিল ভালো। যার স্বাদ সে জীবনে কখনো জানে নাই, জানা যাহা উচিত ছিল না, সেই প্রণয়ের স্বাদ জানিল যদি তবে জানিয়াই সন্তুষ্ট থাকিল না কেন? সে যে বিপিনের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এর লজ্জা সে কিছুতেই ঢাকিতে পারিতেছিল না। এ লজ্জা ঢাকে বিপিন যদি তাকে এখনও গ্রহণ করে। সুতরাং সে নিজের কাছে স্পষ্ট স্বীকার না করিলেও তার অন্তরের অন্তরালে একটি মিলনচেষ্টা আকুলি-বিকুলি করিতেছিল। এইরূপে তাদের প্রণয় বাধাপ্রাপ্ত হইয়া বাঁধরুদ্ধ নদীস্রোতের মতো ফাঁপিয়া ফুলিয়া গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল। এক-একবার সকল বাঁধ ভাঙিয়া মিলিত হইবার বিদ্রোহভাবও তাদের মনে আসিতে আরম্ভ করে নাই এমন নয়।

কিন্তু নূতন শিষ্যদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য অতিমাত্র সতর্ক ও উৎকণ্ঠিত গুরু সর্ব্বদাই তাহাদিগকে পাহারা দিয়া ফিরিতেন বলিয়া শিষ্যদের এতটুকু চাঞ্চল্য ঈষৎ মিলন-চেষ্টা গুরুর দৃষ্টি এড়াইত না। গুরু তখন বিপিন ও মালতীকে নূতন নূতন নিয়ম সংযম অনুষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ করিতে চাহিতেন। তাহাদিগকে বুঝাইতেন ও এই-সং

চাঞ্চল্য ধর্ম্মপথে চিরকালই অন্তরায়-রূপে উপস্থিত হয়; ইহাকেই খৃষ্টানে ও মুসলমানে বলে শয়তান, বুদ্ধ বলিয়াছেন মার। মহাদেবের মতো মদনভস্ম না করিলে গৌরীকে পাওয়া যাইবে না; শঙ্করকে পাইতে হইলে গৌরীরও তপস্যা করিতে হইবে।

বিপিন গুরুজীর উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আবার আপনাকে দমন করিতে চেষ্টা করিত। মালতী কিন্তু তেমন আগ্রহ সহকারে গুরুজীর উপদেশ ও বিবিধ অনুষ্ঠান পালন করিত না। এই বিদ্রোহী নারীটিকে লইয়া গুরুদেব বিব্রত হইয়া উঠিলেন; তাকে শাসন করিতে গেলে সে তর্ক করে, শাস্ত্রের দোহাই সে মানে না, ব্যবস্থিত অনুষ্ঠান সে পালন করে না। এই-সব কারণে গুরুর বাধ্য হইয়া এই অবশ্যা শিষ্যাটিকে অত্যন্ত অধিক মনোযোগের সহিত আগ্‌লাইবার দর্‌কার হইতে লাগিল।

গুরু যতই নিবিষ্ট মনে মালতীর আচরণ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন ততই তিনি সেই তেজস্বিনী বুদ্ধিপ্রখরা সুন্দরী তরুণীর বিপিনের প্রতি অনুরাগ ও প্রণয়ব্যাকুলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে প্রেমানন্দের মনে ঈষৎ ঈর্ষা দেখা দিল,—

> "কুশের অঙ্কুর সম
> ক্ষুদ্র দৃষ্টি-অগোচর তবু তীক্ষ্ণতম!"

গুরুর কেবলি মনে হইতে লাগিল তাঁর জন্য কারো হৃদয় ত এমন করিয়া ব্যাকুল বেদনায় স্পন্দিত হয় না। এতকাল নিরবচ্ছিন্ন সম্মান সম্ভ্রম পাইয়া পাইয়া তাঁর অহঙ্কার পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল; আজ মালতী সেই চিরাভ্যস্ত জীবনপ্রবাহের মধ্যে ব্যতিক্রম ঘটাইয়া প্রেমানন্দের মনে এমন একটি নূতন ভাবের সঞ্চার করিয়া দিল যাতে তিনি কিছুতেই নিজকে ভুলিয়া থাকিতে পারিতেছিলেন না। তাঁর মনে হইতে

লাগিল মালতীর অখণ্ড মনোযোগ তাঁরই প্রাপ্য, বিপিন তাহা ফাঁকি দিয়া নিজে আত্মসাৎ করিতেছে।

তখন, মালতীর মন বিপিনের দিক হইতে একেবারে বিমুখ করিয়া দিয়া নিজের দিকেই নিতান্তই নিবিষ্ট করাইবার জন্য গুরু বিপিনের প্রতি কঠিনতর নিয়মের ব্যবস্থা করিলেন এবং আপনি মালতীকে পাহারা দিয়া ফিরিতে লাগিলেন। কিন্তু এইরূপ গোয়েন্দাগিরি করিতে গিয়া নিজের কাছেই নিজেকে তাঁর ছোট বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তখন তিনি নানা যুক্তির অবতারণা করিয়া নিজেকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন যে তিনি কিছুমাত্র অন্যায় করিতেছেন না, কর্ত্তব্যই তিনি করিতেছেন, শিষ্যের ইহপারত্রিক কল্যাণের জন্য গুরুর ত এমনি সতর্ক প্রহরী হওয়াই চাই,—গুরু হওয়া কি অমনি মুখের কথা, শিষ্যের পাপের অংশীদার যে গুরু!

নিজের কাছে যখন কাজটা বেশ সঙ্গত বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়া গেল তখন গুরু বেশ হৃষ্টভাবেই মালতীর পাহারায় উৎসাহিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

৪২

গুরু যখন মালতীকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, মালতীও তখন নিজেকে লইয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। প্রথম-প্রথম এই আশ্রমে আসিয়া তার বেশ ভালোই বোধ হইতেছিল; গঙ্গার ধারে এমন একটি চমৎকার উদ্যানে বিচিত্র রকমের ফুল, অপূর্ব্ব ধরণের কেয়ারি, কত জানা অজানা গাছের আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য, রকম রকম পাখীর গান, ময়ূর-হরিণের নাচ, গঙ্গার বুকে প্রতিদিন জোয়ার-ভাঁটার আসা-যাওয়া, বিচিত্র রকমের নৌকা-ষ্টিমারের গতিভঙ্গী, সকালে সন্ধ্যায় গঙ্গার বুকে আলো ছায়ার খেলা, মাঝির গান, বাতাস চিরিয়া ষ্টিমারের বাঁশির চীৎকার

দেখিয়া ও শুনিয়া তার দিন ওরই মধ্যে বেশ একরকম আনন্দেই কাটিতেছিল। মালতী মথুরাপুরে বিপিনের বাড়ীতে সকলের ছুতের ভয়ে আড়ষ্ট নিষ্কর্মা হইয়া থাকিতে থাকিতে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; এখানে আসিয়া রান্না করিয়া সকলকে খাওয়াইয়া যত্ন করিয়া ঠাকুরের সেবা করিয়া সে অনেকটা নিজেকে লঘু মনে করিতেছিল। কিন্তু এখন গুরুর কৃপায় তার সেই-সব কাজ হইতে অব্যাহতি মিলিয়াছে, তাকে নড়িয়া বসিতে হয় না, একগাছি কুটা ভাঙিয়া দুটুক্‌রা করিতে হয় না, উপর হইতে নীচে নামিবারও তার হুকুম নাই। কিন্তু মালতী এমন অদ্ভুত রকমের লোক যে ভূতের মতন খাটুনি হইতে অব্যাহতি পাওয়ার এতবড় সৌভাগ্য সে গুরুর প্রতি প্রসন্নকৃতজ্ঞতায় হাসিমুখে গ্রহণ করিতে পারিল না। সে নিজের ঘরটিতে বসিয়া বসিয়া সমস্ত দিন গঙ্গার দিকে চাহিয়া থাকে; ওপারের গাছের ঝাপসা ঝোপের মাঝে মাঝে আবছায়া বাড়ীগুলি ছবির মতন চিরদিনই নিশ্চল, কোনো বাড়ীতে একটু প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায় না, যেন সবাই মালতীর মতোই নিষ্কর্মা আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া আছে। অকস্মাৎ যদি কোনো দিন মালতী দেখে কোনো বাড়ীর ছাদে কোন বধূ কাপড় শুকাইতে দিতেছে, কি কোনো চিলের ছাদের উপরে একখানা রঙ্‌চঙা ঘুড়ি কোনো অদৃশ্য বালকের মোহনস্পর্শের পুলকে স্পন্দিত হইতেছে, অমনি তার সমস্ত শরীর যেন সজীব জাগ্রত হইয়া উঠে। সেই প্রাণের পরিচয় শীঘ্রই মিলাইয়া যায়; তখন মালতী দেখে নদীর বুকে জলের স্রোত চলিয়াছে, অফুরন্ত সূতার মতন, দ্রৌপদীর শাড়ীর মতন, অন্ত নাই, বিরাম নাই, কারো দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, যেন বিশ্বের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই, কারো ধার সে ধারে না, কারো সুখদুঃখে তার কিছু আসিয়া যায় না। স্রোতের উপর নৌকাগুলি কালো কালো পাখীর মত শাদা পালের ডানা মেলিয়া নীরবে

ভাসিয়া যায়, ষ্টিমারগুলি প্রকাণ্ড রাজহাঁসের মতো তীক্ষ্ণ চীৎকার করিয়া জল কাঁপাইয়া পাখা ঝট্‌পট্‌ করিয়া ছুটিয়া চলে, ব্যস্তসমস্ত পান্সির বুকে বসিয়া আপিসের বাবুরা তামাক খায়, গান গাহে,—কিন্তু সবই যেন নিত্যকর্ম্মের আবৃত্তি মাত্র, কোথাও যেন একটি সচেতন চেষ্টা জাগ্রত হইয়া নাই, সমস্তই যেন যন্ত্রবদ্ধ একঘেয়ে বোধ হয়। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসে। পাখীর দল ম্লানায়মান সূর্য্যাস্তদীপ্তির স্বর্ণশোণিত-প্লাবনের মধ্য দিয়া নদীর উপর দিয়া তোরণদ্বারে পুষ্পপল্লবের মঙ্গলমাল্যের মতো উড়িয়া যায়, মালতী দেখিয়া দেখিয়া কত কি ভাবে। লম্বা লম্বা তাল-জাতীয় গাছগুলির ছায়া তার চোখের সাম্‌নেই পশ্চিম হইতে আসিয়া পূর্ব্ব দিকে ক্রমশ দীর্ঘ হইয়া পড়ে, ওপারের কালো কালো গাছগুলির উপর কালো অন্ধকার ঘন হইয়া উঠে, সমস্ত ক্রমশ একাকার সঙ্কুচিত হইয়া যায়, দূরে আর দৃষ্টি চলে না, তখন মালতীকে ঘরের কোণে একলা আপনাকে লইয়া চুপটি করিয়া কাটাইতে হয়। পরিণামবিরস শীতের দিনগুলি যেন কিছুতেই কাটিতে চাহে না।

যখন তার আর কিছু ভালো লাগে না তখন মালতী বই খুলিয়া বসে; অনেক সময় বই তার কোলের উপর চোখের সাম্‌নে খোলাই পড়িয়া থাকে, মন তার ঘুরিয়া বেড়ায় বিপিনের স্মৃতিটির চারিদিকে—রুদ্ধকমল বেষ্টন করিয়া ভ্রমরের মতো, ফানুসঢাকা দীপের পাশে পতঙ্গের ন্যায়। কখনো কখনো বা সে নিজের মনোবেদনাকে কবিতার আকার দিতে চেষ্টা করে, কখনো নিজের অজ্ঞাতসারে বিপিনের নাম লিখিতে থাকে। সেই নামের শব্দটি ও রূপটিও যেন তার হৃদয়ের উপর সুমধুর স্পর্শ বুলাইয়া ছায়, যেন অপরিমেয় করুণা-রসার্দ্র দুইটি তরল চোখের দৃষ্টি তার গভীর বেদনার উপর সান্ত্বনা বিকীর্ণ করিয়া ছায়। তেশিরা কাচের ভিতর দিয়া দেখিলে বাহিরটা যেমন বিচিত্র বর্ণের রঞ্জিত বলিয়া

মনে হয়, অতীতের স্মৃতির ভিতর দিয়া দেখিয়া মালতী তেমনি নিজের এই দুর্বহ জীবনকে রঙিন করিয়া দেখিতে চাহিত।

মালতী যাহা করে গুরু তাহা দরজা ঈষৎ ফাঁক করিয়া লুকাইয়া লুকাইয়া দেখেন। শিকারী বিড়ালের মতো গুরু নিঃশব্দে পা টিপিয়া আসিয়া খিলশূন্য কপাট ফাঁক করিয়া মালতীর প্রত্যেক কার্য্য লক্ষ্য করেন। মালতী অনেক সময় প্রেমানন্দের এই চুরি টের পায়, কিন্তু সে তাহা গ্রাহ্যই করে না। প্রেমানন্দ যখন বেশ বুঝিতে পারিলেন যে মালতী তাঁর গোয়েন্দাগিরি টের পাইয়াও অগ্রাহ্য করিতেছে, তখন তাঁরও সাহস ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া উঠিল।

একদিন মালতী বুকে বালিশ দিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া কবিতা রচনা করিতেছে, গঙ্গার খোলা হাওয়া ঘরে ঢুকিয়া খোলা বইয়ের পাতাগুলি লইয়া ফরফর করিয়া নাচাইতেছে, মালতীর অলকগুচ্ছ চোখের উপর আনিয়া দুলাইতেছে—এমন সময় প্রেমানন্দ নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া একেবারে মালতীর পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন, এবং নিজের হাত দুখানা পশ্চাতে শৃঙ্খলিত করিয়া শরীরের উপরার্দ্ধ ঝুঁকাইয়া মালতীর কাঁধের ফাঁক দিয়া দেখিতে লাগিলেন মালতী কবিতা লিখিতেছে। তারপর আস্তে আস্তে নত হইয়া হাত বাড়াইয়া ছোঁ মারিয়া কবিতার কাগজখানা টানিয়া লইলেন।

মালতী কবিতা রচনায় তন্ময় হইয়া গিয়াছিল বলিয়া কিছুই টের পায় নাই, চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিল প্রেমানন্দ! সে সর্পভীত বা তড়িৎ-স্পৃষ্ট ব্যক্তির ন্যায় ত্রস্তে উঠিয়া আপনার কেশবাস সংযত করিয়া যখন প্রেমানন্দের দিকে চাহিল তখন তার চোখ দিয়া আগুন বাহির হইতেছে।

প্রেমানন্দ তাহা লক্ষ্য না করিয়াই হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

সন্ন্যাসিনীর ব্রতপালন চমৎকার হচ্ছে, রাধারাণী! সন্ন্যাসিনী লেখেন প্রণয়-কবিতা! নাম জপ করেন পরপুরুষের!

মালতী গুরুর এই শ্লেষবাক্যে মর্ম্মাহত হইয়া নিজের ক্রোধে নিজেকে পুড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলিতে পারিলে বাঁচিত।

মালতী চোখ পাকাইয়া বলিল—আপনি গুরু, না চোর?

প্রেমানন্দ হাসিয়া বলিলেন—আমি গুরু! শিষ্য যখন চুরি কোরে চুরি কর্‌তে আরম্ভ করে, তখন গুরুকেও বাধ্য হয়ে চুরি কোরে চুরি ধর্‌তে হয়। তুমি কি সন্ন্যাসিনীর ধর্ম্ম পালন কর্‌ছ?

মালতী আর থাকিতে পারিল না। চীৎকার করিয়া বলিল—আমি সন্ন্যাসিনী নই! আমি চীৎকার কোরে বল্‌ছি, হাজার বার বল্‌ছি, আমি সন্ন্যাসিনী নই! আপনি আমাকে দূর কোরে দিন আপনার আশ্রম থেকে। আমাকে এমন কোরে অপমান কর্‌বেন না।

মালতী দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া প্রেমানন্দ একটু লজ্জিত ঈষৎ দুঃখিত হইয়া বলিলেন—কাঁদ, রাধারাণী, কাঁদ! অশ্রুজলে সমস্ত গ্লানি ধুয়ে ফেল। ধর্ম্মের পথ বড় দুর্গম, মনের সকল ভার পশ্চাতে ফেলে দিয়ে লঘু হয়েই যেতে হবে, নইলে লক্ষ্য স্থানে পৌছানো দুর্ঘট হবে। প্রাণ যখন ব্যাকুল হবে ভাগবত পোড়ো, ধর্ম্মগ্রন্থ পোড়ো কবিতা লিখ্‌তে ইচ্ছা হয় ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন কোরো—নিজেকে স্রোতের মুখে এমন কোরে ছেড়ে দিয়ো না।

মালতী মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া এই মাঘ মাসের দরুণ শীতে দরদর করিয়া ঘামিতেছিল। গুরু অধঃপাতের পূতিগহ্বরে কতখানি নামিয়া গিয়াছেন ইহা মনে করিতেও মালতীর দুঃসহ লজ্জা বোধ হইতেছিল।

মালতী যখন মুখ ফিরাইল তখন তার মুখ সিঁদুরে আমের মতে

হইয়া উঠিয়াছে। সে দৃপ্তস্বরে বলিল—আপনি আমার ঘর থেকে এক্ষণি বেরিয়ে যান, নইলে আমি চেঁচিয়ে হাট বাধিয়ে দেবো।

প্রেমানন্দ কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন—আচ্ছা, তোমার মন এখন চড়া-বাঁধা সেতারের মতো বাতাসের স্পর্শে ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ছে, তুমি ঠাণ্ডা হও। আমি অন্য সময় এসে তোমায় বুঝিয়ে দেবো, এটা তোমার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হচ্ছে।

প্রেমানন্দ এক পা দু পা করিয়া হটিতে হটিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

মালতী বিছানার উপর ঝাঁপাইয়া উপুড় হইয়া পড়িল, এবং বালিশে মুখ গুঁজিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

এই ঘটনার পর মালতীর মন অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিল, না জানি কখন প্রেমানন্দ আসিয়া তার নিভৃত বাসে উপদ্রব ঘটাইয়া তুলিবে। ঘরে এমন একটি খিল নাই যাহা রুদ্ধ করিয়া মালতী একটু আপনাকে অন্তরাল করিতে পারে। মালতী মনে করিল কপাট ভেজাইয়া তোরঙ্গ প্রভৃতি ভারি জিনিষ চাপাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিবে; কিন্তু দেখিল দরজাগুলি সমস্তই বাহিরের দিকে খোলে। এতে তার মন এমনি ভয়চকিত হইয়া উঠিল যে তার কেবলি মনে হইতে লাগিল সকল দরজার ফাঁকে লুব্ধ দৃষ্টি পাতিয়া প্রেমানন্দ বুঝি তাকেই দেখিতেছে; কোথাও একটু খুট করিয়া শব্দ হইলে, কারও পদশব্দ শুনিলেই সন্ত্রস্ত হইয়া সে চমকিয়া উঠে! মালতীর বিশ্রাম নিদ্রা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল; সে আপনাকে লইয়া একটু নিরালা বসিয়া ভাবিবারও সময় পায় না।

কিন্তু চার পাঁচ দিন মালতী গুরুর দর্শন পর্য্যন্ত পাইল না; তিনি সর্ব্বদা নিজের ঘরটিতে বসিয়া পূজা পাঠে অত্যন্ত ব্যাপৃত হইয়া উঠিয়াছেন।

হঠাৎ একদিন প্রভাতে প্রেমানন্দ বিপিন ও মালতীকে ডাকাইয়া আনিলেন। গুরুর আহ্বান শুনিয়া মালতীর মন ভয়ে অভিভূত হইয়া উঠিয়াছিল; সে শান্তিকে জিজ্ঞাসা করিল—দিদি, সেখানে আর কে আছেন?

শান্তি বলিল—যোগানন্দ আর আমি ছিলাম; যোগানন্দ স্বরূপানন্দকে ডাক্‌তে গেলেন, আমি তোমায় ডাক্‌তে এসেছি।

মালতী যখন দেখিল যে বিপিনেরও ডাক পড়িয়াছে, তখন সে নির্ভয়ে গুরুর গৃহের অভিমুখে শান্তির সঙ্গে যাত্রা করিল।

প্রেমানন্দ বলিতেছেন—দেখ বিপিন বাবু, আমি ভেবে দেখ্‌লুম এ আশ্রমে তোমাদের থাকা কল্যাণের হবে না। তুমি মালতীকে নিয়ে সংসারাশ্রমেই ফিরে যাও…

ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে প্রেমানন্দের এইটুকু কথা মালতীর কানে গেল। মালতী আসিয়া কৃতজ্ঞতায় অবনত হইয়া প্রেমানন্দকে প্রণাম করিয়া এক পাশে উৎসুক হইয়া বসিল।

বিপিন একবার অপাঙ্গে মালতীর দিকে চাহিয়া গুরুকে বলিল—আমাকে এমন কঠোর আদেশ কর্‌ছেন কোন্ অপরাধে? সংসারে কোথাও ঠাঁই নেই দেখে আমি আপনার চরণে আশ্রয় নিয়েছি—আমার কি কোথাও আশ্রয় নেই?

নিরুপায় ভাবপ্রবণ বিপিনের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

প্রেমানন্দ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন; আর একটি কথাও তিনি বলিলেন না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া মালতী হঠাৎ উঠিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল। তখন বিপিনও গুরুকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রেমানন্দ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—দেখ বিপিন, তোমার মনে বৈরাগ্য এসে থাক্‌লেও মালতীর মন বড় তরল

আছে; এ আশ্রমে তার থাকা কল্যাণের হচ্ছে না! তুমি তাকে অন্যত্র রাখ্‌বার ব্যবস্থা কর্‌লে ভালো হয়।

বিপিন মালতীর উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল। সে নিশ্চয় আশ্রম-প্রতিকূল এমন আচরণ কিছু করিয়াছে যার জন্য গুরু তাকে আশ্রমে রাখিতে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। বিপিন হনহন করিয়া গিয়া মালতীর ঘরের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধস্বরে ডাকিল—মালতী!

আশ্রমে আসিয়া অবধি বিপিন একটিবারও মালতীর নিকটে আসে নাই, কথা বলে নাই। আজ তাকে বিপিন ডাকিতেছে শুনিয়া মালতীর আনন্দসাগর উদ্বেল হইয়া উঠিল, হৃদয়-শতদল বিকশিত হইয়া উঠিল,—তবে বুঝিবা গুরুদেবের অনুরোধে সংসারে ফিরিয়া যাইবার জন্য বিপিন তাকে ডাকিতে আসিয়াছে! মালতী তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া আসিয়া লজ্জিত স্মিতমুখে বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইল।

মালতীর সুন্দর স্মিতমুখের দিকে চাহিতেই বিপিনের মনের সমস্ত উগ্রতা নিমেষে মিলাইয়া গেল। তারও অন্তরে সুখের প্রলোভন উঁকি মারিতে লাগিল। বিপিন আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না; সে মালতীকে কিছুই না বলিয়া ফিরিয়া চলিল।

মালতী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—আপনি আমাকে কি বল্‌ছিলেন?

কুণ্ঠিত বিপিন একবার মালতীর দিকে ফিরিয়া তাকাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—তুমি কি আশ্রমের নিয়ম পালন করো না?

মালতীর অত্যন্ত রাগ হইল—প্রেমানন্দ নিশ্চয় বিপিনের কাছে তার নামে নালিশ করিয়াছে। মালতী উগ্রস্বরে বলিল—না।

—কেন?

—কেন? জানিনে কেন।—বলিয়াই মালতী ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

বিপিন দেখিল মালতী মেঝেতে বসিয়া-পড়িয়া খাটের বিছানায় মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। বিপিন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল।

৪৩

বিপিন নীচে নামিয়াই দেখিল দুর্গ্রহের মতো তারক দাঁড়াইয়া আছে। বিপিনকে দেখিয়াই তারক তার বড় বড় দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল—কি হে সৌখীন সন্ন্যাসী, অপি তপো বর্দ্ধতে? কিংবা—

অপি প্রসন্নেন মহর্ষিণা ত্বং সম্যগ্-বিনীয়ানুমতো গৃহায় ?
কালোহয়ং সংক্রমিতুং দ্বিতীয়ং সর্ব্বোপকারক্ষমমাশ্রমং তে।

দ্বিতীয় আশ্রমে প্রবেশের জোগাড় ত গাঁটছড়া বেঁধে ভায়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরছে। কেমন নয় ?

বিপিন তাকে গ্রাহ্য মাত্র না করিয়া নিজের ঘরে গিয়া যোগবাশিষ্ঠ খুলিয়া পড়িতে বসিল—

"এই যে চরাচর-চেষ্টা-সম্ভূত ভোগ্য বিষয়,—এ সমস্তই অস্থির, ইহা আপদের মূল ও পাপের হেতু। বিষয়-সমূহের যে পরস্পর সম্বন্ধ তাহা স্বীয় মানসিক কল্পনামাত্র।

"শিরা-কঙ্কাল-গ্রন্থি-শালিনী মাংসপুত্তলী রমণীর যন্ত্রবৎ চঞ্চল অঙ্গসমূহে প্রকৃতপক্ষে শোভার সামগ্রী কি আছে? পুরুষ সংসার-পল্বলের মৎস্য, চিত্তকর্দ্দম তাহার বিহারক্ষেত্র, দুষ্টবাসনা সেই মৎস্য ধরিবার বঁড়িশ-সূত্র এবং রমণী সেই বঁড়িশস্থিত পিষ্টকপিণ্ড।

"হে রাম! পণ্ডিতেরা বাসনা-ক্ষয়কেই মুক্তি এবং বিষয়বাসনার আতিশয্যকেই বন্ধন বলিয়া থাকেন।

"যদ্দ্বারা পরমপুরুষার্থ প্রাপ্তি হয় এবং পুনর্জন্মযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, আর যাহা পরম শান্তির আস্পদ, তাহাই জীবনপদবাচ্য।"

কিন্তু শাস্ত্র যাই বলুক, রমণীকে যতই কদর্য্য করিয়া চিত্রিত করুক, বিপিনের মনের মধ্যে মালতী কিছুতেই অসুন্দর হইতেছিল না, মালতীহীন জীবন তার নিকট জীবনপদবাচ্য বোধ হইতেছিল না। সদ্য সে মালতীকে কাঁদিতে দেখিয়া আসিয়াছে—সেই তার তপ্ত অশ্রুবিন্দুগুলি একে একে গলিয়া গলিয়া বিপিনেরই হৃদয়পাত্রে পড়িয়া মুক্তাময় বরমাল্যের আকারে সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল।

ছাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সে ভাবিতেছিল ঐ উপরের ঘরেই মালতী আছে, ইচ্ছা করিলে সে তাকে পাইতে পারিত, এখনো পারে, কিন্তু এই সুখ সে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়াছে; এই জন্য সে বেদনার মধ্যেও ত্যাগের একটা গর্ব্ব অনুভব করিতে লাগিল।

তথাপি শাস্ত্রের উপদেশ ও অনুশাসন এবং বৈরাগ্যের গর্ব্ব অগ্রাহ্য করিয়া তার চিত্ত কেবলই মালতীর দিকেই অভিসার করিতেছিল। তার এক-একবার মনে হইতেছিল, এর চেয়ে মালতীকে বিবাহ করিয়া কেরানীগিরি করাও ভালো ছিল। নিঃসঙ্গ একাকী বসিয়া যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ পড়িবার মতো মনের গঠন বিপিনের নহে।

বিপিন ভাবিতে লাগিল—মালতী আমার একটি প্রশ্নেই অমন করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল কেন? তবে কি মালতী এখনো আমায় ভালোবাসে? এখনো কি তার মন আমার প্রতি তেমনি অনুরক্ত আছে? আমি তার প্রতি যে অন্যায় করিয়াছি তাহা কি সে ক্ষমা করিতে পারিয়াছে? আমি যেমন তার অভাবে দগ্ধ হইতেছি, ওর প্রাণেও কি তেমনিতর প্রণয়বহ্নি জ্বলিতেছে? হায় অভাগিনী! কেন তুমি নবকিশোরকে বিবাহ করিয়া তার কাছে থাকিলে না? তাহা হইলে আমার সাধনার বিঘ্ন

ঘটাইয়া তোমার চিন্তা সর্ব্বদা আমায় ঘিরিয়া থাকিত না। আগে মনে করিয়াছিলাম মালতী কাছে থাকিলে নিশ্চিন্ত মনে ধর্ম্মসাধন করিতে পারিব, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া দেখিতেছি তাহা ভ্রম; পরম প্রলোভনের সামগ্রী পার্শ্বে রাখিয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করিতে পারিবার মতো দৃঢ় চিত্ত আমার নয়, এ কথা স্বীকার করিতে লজ্জা নাই। তার চেয়ে বরং মালতী নবকিশোরকে বিবাহ করিলে তাকে একেবারে আয়ত্তাতীত মনে করিয়া হয়ত ভুলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম। কিন্তু সত্যই তাহা পারিতাম কি? সে হয়ত আরো অসহ্য হইত। দূর হোক ছাই, এ সন্ন্যাসের পথে ধর্ম্মসাধন আমার কর্ম্ম নয়; আমি আজই গুরুজীকে বলি মালতীকে না পাইলে আমার ইহ-পরকাল দুই-ই নষ্ট হইয়া যাইবে।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বিপিনের অন্তর মালতীর প্রতি অনুরাগে প্রতপ্ত হইয়া উঠিল। সে তখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গুরুজীর সন্ধানে বহির্গত হইল।

সে গুরুর ঘরে গিয়া দেখিল গুরু একখানি আসনে স্তব্ধ হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া আছেন।

বিপিন এতক্ষণ যে সঙ্কল্প দৃঢ় করিয়া আসিয়াছিল তাহা এখন গুরুর সম্মুখে আসিয়া শিথিল হইয়া পড়িল। সে এই মূর্ত্তিমান ব্রহ্মচর্য্যকে কেমন করিয়া বলিবে যে সে আর পারিতেছে না, মালতীকে তার পত্নীরূপেই চাই। বিপিনের মুখ লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল, সে অপ্রতিভ ভাবে ধীরে ধীরে আবার ফিরিয়া আপনার ঘরে গিয়া গীতা খুলিয়া পাঠ করিতে বসিল—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥

যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদ্ আত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥

বিপিন অবশ চিত্তকে দমন করিবার জন্য আগামী মাঘীপূর্ণিমা হইতে নির্জ্জন-বাস আরম্ভ করিবে স্থির করিল। যে সন্ন্যাসী নির্জ্জনে জপ আরাধনা করিতে চায় তার জন্য আশ্রম-উদ্যানের চার কোণে চারটি গুহাগৃহ আছে; সে সেই গৃহে সংরুদ্ধ থাকে—আশ্রমের একজন নির্দ্দিষ্ট কেউ দিনান্তে তাকে কিছু পানীয় ও আহার্য্য দিয়া আসে। শীঘ্রই আশ্রমে রটিয়া গেল বিপিন নির্জ্জনে তপস্যার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। বিপিন নির্জ্জনবাস করিবে শুনিয়া মালতী ভীত ও ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

৪৪

আশ্রমের সকল শিষ্য ও শিষ্যারা লক্ষ করিতেছিল কয়েকদিন ধরিয়া গুরুর মন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ চঞ্চল হইয়া আছে; তিনি সর্ব্বদাই চিন্তাকুল, দিনে ও রাত্রে অধিক সময়েই তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া কাটাইতেছেন; থাকিয়া থাকিয়া উঠিয়া গিয়া ঠাকুরঘরে পূজায় বসেন। পূর্ব্বের ন্যায় তাঁর মুখে স্নিগ্ধ হাসি লাগিয়াই থাকে না; সমবেত শিষ্যদের মিষ্ট কথায় উপদেশ দ্যান না; শিষ্যশিষ্যারা অভ্যাস ও নিয়মমত প্রাতে ও সন্ধ্যায় আসিয়া তাঁর ঘরে সমবেত হইলে গুরু কেমন ব্যস্ত হইয়া পড়েন; কেউ কোনো প্রশ্ন করিলে নীরস বিরস ভাবে তার উত্তর দিতে দিতে হাঠাৎ হয়ত মাঝখানে থামিয়া অন্যমনস্ক হইয়া যান অথবা সেখান হইতে চঞ্চল হইয়া চলিয়া যান।

ইহা দেখিয়া ও বুঝিয়া শিষ্যশিষ্যারা আর তাঁর কাছে কেউ আসে না; সকলেই ভয়ে ভয়ে দূরে দূরে থাকে। দু-চার-দিন পরে হঠাৎ এক-সময় প্রেমানন্দ নিজেই সকল শিষ্য-শিষ্যাকে ডাকিয়া তাহাদিগকে শাস্ত্র

পড়িয়া শুনাইতে বসেন, কোনো দিন বা বৈষ্ণব পদাবলী কীর্ত্তন করেন ; কিন্তু কোনো দিন তিনি মালতীকে ডাকিতেন না, মালতীও গুরুর মুখে বৈরাগ্যের উপদেশ শুনিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র ছিল না।

মালতী বুঝিতে পারিতেছিল গুরু তাকে এড়াইয়া চলিতেই চাহিতেছেন। প্রেমানন্দের ঘর হইতে ঠাকুরঘরে বা নীচে যাইতে হইলে, বা ঠাকুরঘর বা নীচে হইতে প্রেমানন্দের ঘরে আসিতে হইলে মালতীর ঘরের সম্মুখ দিয়া যাইতে হয় ; মালতী দেখিতেছিল প্রেমানন্দ অভ্যাসের বশে সেই পথ ধরিয়া যাইতে বা আসিতে গিয়া হঠাৎ ফিরিয়া অন্য দিকের বারান্দা দিয়া ঘুরিয়া যান। মালতী বুঝিতেছিল যে গুরু হইয়া তিনি যে মালতীর গোপনতার মধ্যে একদিন উঁকি মারিতে গিয়াছিলেন এইজন্য তিনি লজ্জিত হইয়া মালতীর সম্মুখীন হইতেও পারিতেছিলেন না। মালতী ক্ষমা করিয়া নিজে তাঁর সম্মুখে গিয়া যতদিন না তাঁর মনের গ্লানি মার্জ্জনা করিয়া দিবে ততদিন তিনি আর মালতীর নিকটে সহজভাবে উপস্থিত হইতে পারিবেন না। মালতীর কিন্তু প্রেমানন্দের এই লজ্জার দীনতা দূর করিবার বিশেষ কোনো আগ্রহ হইতেছিল না। প্রেমানন্দের ঘরের মজ্‌লিসে যোগ দিলে মাঝে মাঝে বিপিনকে দেখিতে পাইবে বলিয়া যাইবার প্রলোভন হইত, কিন্তু প্রেমানন্দের দৃষ্টির সম্মুখে বিপিনের সহিত মিলনও তার একটু বাঞ্ছনীয় মনে হইত না।

বিপিনও এই সুযোগটি খুঁজিয়া গুরুর মজ্‌লিসে সর্ব্বাগ্রে আসিয়া হাজির হইত এবং মালতীকে দেখিতে না পাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সকলের শেষে চলিয়া যাইত। তার দিন এক-একটা করিয়া বড় শীঘ্র চলিয়া যাইতেছে, তাকে মাঘী পূর্ণিমা হইতে ফাল্গুনী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত নির্জ্জনবাস করিতে হইবে—কি পাথেয় কি সঞ্চয় লইয়া সে ঐ সুদীর্ঘ সময়

রুদ্ধ থাকিবে? তার আগে মালতীকে যদি সে একটিবারও ভালো করিয়া দেখিয়া লইতে পারিত!

আজ মাঘী পূর্ণিমা। আজ চন্দ্রোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিপিনকে গুহায় রুদ্ধ হইতে হইবে। যুদ্ধযাত্রী ভীরু সৈনিকের ন্যায় যাইতে তার কিছুতেই মন চাহিতেছিল না, থাকিবারও তার আর জো নাই। বিপিন আজ ছটফট করিয়া বেড়াইতেছিল।

মালতীরও আজ দুঃখ যেন চরমে উঠিয়াছে। এতও তার অদৃষ্টে ছিল! বিপিনের কাছে থাকিতে পাইবে বলিয়া সে সন্ন্যাসীর আশ্রমে আসিয়াছে, সেই বিপিন তাকে অসহায় কোথায় কার কাছে রাখিয়া নির্জ্জন গুহায় তপস্যা করিতে চলিল! এত বড় ধার্ম্মিক সে! এত বড় নিষ্ঠুর নির্ম্মম নির্দ্দয় পাষাণ সে! মালতী আপনার ঘরের চারিদিকের দরজা ভেজাইয়া দিয়া আপনার তোরঙ্গের গোপন তল হইতে বিপিনের একখানি ফটোগ্রাফ বাহির করিল; এই ছবিখানি সে মথুরাপুর হইতে আসিবার সময় বিপিনের ঘর হইতে চুরি করিয়া আনিয়াছিল; এখানি তার বড় লজ্জার বড় গোপনের বড় আদরের ধন! এর দিকে চাহিতেই তার অশ্রুধারা পাগল হইয়া ছুটিল। মালতী ফটোগ্রাফখানি বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া অশ্রুতে অন্ধ হইয়া ব্যথিত অন্তরে নীরবে আর্ত্তনাদ করিয়া লুণ্ঠিত হইতে লাগিল—ওগো তুমি এত নিষ্ঠুর! এত নিষ্ঠুর!

মালতী ছবিখানিকে খাটের বিছানার উপর রাখিয়া তার সাম্‌নে মাথা কুটিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিতেছিল—ওগো তুমি কি এমনি কাগজে তৈরি—প্রাণহীন ভাবহীন দয়াহীন!

কখন্ গঙ্গার হাওয়া আসিয়া নিঃশব্দে মালতীর ঘরের বারান্দার দিককার কপাটটি আস্তে আস্তে খুলিয়া দিয়াছিল। মালতী মাথা নীচু করিয়া চোখ মুদিয়া অশ্রুতে অন্ধ হইয়া আপনার গভীর বেদনার

অন্ধকারে ডুবিয়া ছিল, সে তাহা টের পায় নাই। ঠিক সেই সময় প্রেমানন্দ সেই পথ দিয়া ঠাকুরঘরে যাইতেছিলেন; মালতীর ঘরের সাম্‌নে আসিয়া থমকিয়া ফিরিয়া যাইবেন, দেখিলেন মালতী বিপিনের ছবির পায়ে মাথা রাখিয়া ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতেছে।

প্রেমানন্দ ক্ষণেক দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিলেন; একবার ফিরিয়া গেলেন; আবার আসিয়া দাঁড়াইলেন; তারপর সন্তর্পণে ঘরে ঢুকিয়া ছবিখানি হঠাৎ হাতে উঠাইয়া লইয়া রূঢ় স্বরে বলিলেন—রাধারাণী, এ উত্তম!

শাবক চুরি করিতে গেলে বাঘিনী যেমন করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে মালতী তেমনি করিয়া ধনুক-ছাড়া বাণের মতো প্রেমানন্দের উপর লাফাইয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—চোর!

প্রেমানন্দ মালতীর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ও আবেগমত্ত আক্রমণে ভীত হইয়া তাড়াতাড়ি একহাতে মালতীকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া একহাতে ছবিখানিকে পিছনে সরাইয়া ধরিয়া ঘর হইতে বারান্দায় বাহির হইয়া পড়িলেন।

মালতী চীৎকার করিয়া উঠিল—আমার জিনিষ আপনি দিয়ে যান বল্‌ছি।

মালতীর চোখ হইতে আগুন ঠিকরিয়া পড়িতেছিল।

গোলমাল শুনিয়া কয়েকজন সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী সেখানে ছুটিয়া আসিয়া জড়ো হইল—জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে একবার গুরুর দিকে একবার মালতীর দিকে চাহিল।

মালতী গর্জ্জন করিয়া প্রেমানন্দের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিয়া উঠিল—এই চোরটাকে আপনারা গুরু বোলে পূজা করেন!

সকলে অবাক হইয়া গুরুর দিকে চাহিল।

গুরু মালতীর দৃপ্ত মূর্ত্তির সম্মুখে একেবারে অপ্রতিভ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি আজ যেন অপরাধী—বিচারকদের সম্মুখে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বিপিনের ছবিখানি সকলকে দেখাইয়া বলিলেন—সন্ন্যাসিনী এইখানি বুকে কোরে বোসে ছিলেন! চোর কে?

কি লজ্জা! কি লজ্জা! এত লোকের সাম্‌নে এমন করিয়া একজন স্ত্রীলোককে অপমান করিতে পারে—এমন কাপুরুষ বলিয়া মালতী ত একবারও প্রেমানন্দকে ভাবে নাই! কি লজ্জা! একজন সন্ন্যাসিনী একজন সন্ন্যাসীর ছবি বুকে করিয়া রাখিতে পারে এমন অঘটন ত এ আশ্রমে কখনো ঘটিতে সমবেত সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীরা দেখে নাই! তারা সকলে মালতীর দিকে ঘৃণার দৃষ্টি হানিয়া অবাক হইয়া চলিয়া গেল। মালতী রৌদ্রদগ্ধ লতার মতন বিবর্ণ হইয়া সেইখানে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল। প্রেমানন্দ বিপিনের ছবিখানি লইয়া নিজের ঘরে গিয়া লুকাইলেন।

বিপিন তখন গঙ্গায় স্নান করিয়া নূতন গৈরিক বস্ত্র পরিয়া এক হাতে কমণ্ডলু ও একহাতে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ লইয়া গুহায় অবরুদ্ধ হইতে যাইতেছিল। এমন সময় সন্ধ্যার বাতাস বিদীর্ণ করিয়া মালতীর আর্ত্তকণ্ঠ চীৎকার করিয়া উঠিল—চোর!

বিপিনের রক্ত প্রতপ্ত হইয়া উঠিল, চরণ চঞ্চল হইয়া উঠিল, ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া মালতীকে দুই বাহু দিয়া আগলাইয়া বলে—ভয় নাই তোমার, আমি আছি!

যোগানন্দ বলিল—গুরুভাই, এখন তোমার চিত্তবিক্ষেপ হওয়া উচিত নয়, তুমি গুহায় চলো।

বিপিন একবার পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

হঠাৎ মালতী ছুটিয়া আসিয়া তার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—আমাকে অসহায় ফেলে আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আপনি যাকে গুরু মনে কোরে পূজো কর্‌ছেন সে একটা চোর!

বিপিনের মুখ শুকাইয়া ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে; সে শূন্য ভীত দৃষ্টিতে মালতীর দিকে চাহিয়া কম্পিত অস্ফুট কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—হয়েছে কি!

কোথা হইতে প্রেমানন্দ অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিলেন—সন্ন্যাসিনী একজন পুরুষের ছবি বুকে কেরে কাঁদ্‌ছিলেন; আমি কেড়ে নিয়েছি।

বিপিন যেন কতদিন আগে মরিয়া গিয়াছে, যা আছে তা তার শব।

মালতী তীব্রস্বরে বিপিনকে বলিল—বলুন আপনি আপনার গুরুকে আমার জিনিষ আমায় ফিরিয়ে দিতে।

বিপিনের রসশূন্য জিহ্বা কষ্টে জিজ্ঞাসা করিল—কার ছবি?

মালতীর মুখ রাগে লাল হইয়া উঠিয়াছিল; এখন লজ্জার আভা সেই লালিমা গাঢ়তর করিয়া তুলিল; তার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল অস্তসূর্য্যের আলো আর উদীয়মান চন্দ্রের জ্যোৎস্না! মালতী মাথা নত করিয়া কুণ্ঠিত স্বরে বলিল—সে আমি জানিনে, আপনি দিতে বলুন।

বিপিন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া গিয়া গুহার মধ্যে প্রবেশ করিল।

মালতী সেই পথের ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া ধূলির চেয়েও ধিক্‌কৃত উপেক্ষিত তার অস্তিত্ব বিলীন করিয়া দিতে চাহিল। এমনি লজ্জায় জানকী মাটিতে মিশাইয়াছিলেন; যে অপমানে স্ত্রীলোকের চরমতম আবরণটুকু হরণ করিয়া তাকে সমস্ত সংসারের নিষ্ঠুর কৌতূহল-দৃষ্টির

মাঝখানে দাঁড় করাইয়া ছ্যায়, এ সেই অপমান; সেই দারুণ অপমানের লজ্জায় মালতী মাটির ধূলা চোখের জলে ভিজাইতে লাগিল।

কে দুখানি স্নেহকোমল হস্তে তাকে আকর্ষণ করিয়া করুণাস্নিগ্ধ স্বরে ডাকিল—দিদি, তুমি উঠে এস।

মালতী তাড়াতাড়ি উঠিয়া শান্তির বুকে মুখ লুকাইয়া লজ্জা ঢাকিয়া যেন বাঁচিল। পরুষ পুরুষদের দৃষ্টি হইতে শান্তি তাকে সরাইয়া লইয়া গেল। মাঘী পূর্ণিমার চন্দ্র তখন সমস্ত আশ্রম ভরিয়া হাসিতেছিল।

৪৫

বিপিন মালতীকে উপেক্ষা করিয়া গুহায় গিয়া রুদ্ধ হইল বটে, কিন্তু হৃদয়ের জ্বালা গুহার বাহিরে রুদ্ধ করিয়া আসিতে পারিল না। গুহার মধ্যেকার নিরেট অন্ধকার একখানা প্রকাণ্ড কালো পাথরের মতো তার বুকের উপর চাপিয়া বসিতে লাগিল; গুহায় সে একা, তাই সহস্র চিন্তা তার মন ছেঁকিয়া ধরিতে লাগিল। মালতী কার ছবি বুকে করিয়া কাঁদিতেছিল? মালতীর জন্য সে পিতামাতার স্নেহ-স্বর্গচ্যুত; নিরাশ্রয় সন্ন্যাসী হইয়াও সে ত মালতীর চিন্তা ত্যাগ করিতে পারে নাই; সে যে নির্জ্জন গুহায় তপস্যা করিতে আসিয়া শুধু মালতীরই ধ্যান করিতেছে। আর মালতী?—সে কার অনুরক্ত, কার বিরহে তার এত আকুলতা, অশ্রুজলে সে কার স্মৃতির তর্পণ করে? বিপিনের মন নানা সন্দেহে নানা আশঙ্কায় পীড়িত হইতে লাগিল—কেন সে জানিয়া আসিল না সে ছবিখানি কার! বিপিন বৃশ্চিকদষ্ট বন্দীর মতো ছটফট করিতে লাগিল—এত কষ্ট, এমন কষ্ট, জীবনে সে কখনো ত পায় নাই। বিপিন গীতা পাঠে মন দিল—

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারো স শান্তিম্ অধিগচ্ছতি॥

মালতীরও বুকে বড় ব্যথা বাজিয়াছিল। তাকে অপমানের মুখে অসহায় ফেলিয়া বিপিন অক্লেশে চলিয়া যাইতে পারিল! পুরুষ মাত্রেই কি এমনি নির্ম্মম, এমনি নিষ্ঠুর, এমনি হৃদয়হীন! কোনো পুরুষ ত তাকে কখনো এতটুকু করুণা করে নাই। শান্তি যদি না থাকিত তবে তার লজ্জা ঢাকিত কে? সে বড় বিশ্বাস করিয়া বিপিনের সঙ্গে আসিয়াছিল—নবকিশোর থাকিলে তার প্রতি এই অপমান কখনো সে নীরবে সহ্য করিত না। মালতীর নবকিশোরের উপর দারুণ রাগ হইতে লাগিল—কেন সে বিপিনকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিল না, কেন সে বিপিনকে এমন করিয়া বহিয়া যাইতে দিল!

গুরু প্রেমানন্দের অবস্থা আরো শোচনীয় হইয়া উঠিল। তিনি আপনার কাছে আপনি শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, আপনার প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া দুর্ব্বল সঙ্কুচিত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। গুরু সঙ্কল্প করিলেন তিনি তীর্থপর্য্যটনে যাইবেন। বিলম্ব করা নয়, শীঘ্রই।

গুরু দীর্ঘকালের জন্য তীর্থপর্য্যটনে যাইবেন, শিষ্যশিষ্যারা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ বিমর্ষ হইয়া উঠিয়াছে। শান্তি সর্ব্বক্ষণ গুরুর কাছে-কাছেই তাঁর সেবা করিয়া ফিরিতেছে। মালতী আবার একাকী হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তার প্রাণে কেমন একটা মুক্তির আনন্দ উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল; আশ্রমে কিছুদিন অন্তত গুরু থাকিবেন না, বিপিন কিছুদিনের জন্যও প্রেমানন্দের প্রভাব হইতে বিযুক্ত হইবে, এই সম্ভাবনাতেই মালতীর মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল।

কাল প্রত্যূষে প্রেমানন্দ তীর্থপর্য্যটনে যাত্রা করিবেন। সমস্ত দিন তিনি ঠাকুরঘরে বসিয়া ধ্যান পূজা করিয়া তীর্থযাত্রার আয়োজন করিয়া

লইতেছিলেন। সমস্ত দিন অনাহারে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যাকালে সমস্ত শিষ্যশিষ্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিয়া গুরু আপনার ঘরে আসিয়া বসিলেন। কেবল মালতী আশীর্ব্বাদ লইতে বা গুরুকে প্রণাম করিয়া বিদায় দিতে আসিল না। বিপিন ত গুহায় বদ্ধ। কিসের একটা উত্তেজনা গুরুর চিত্ত আলোড়িত করিতেছিল—তার সংঘাতে তাঁর মুখ প্রদীপ্ত ও অবস্থা বিচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। প্রেমানন্দ বুকের উপর দুই হাত শৃঙ্খলিত করিয়া দীর্ঘ ঋজুভাবে ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিলেন।

রাত্রি গভীর নিশীথ হইয়া গেল তবু তাঁর পায়চারির বিরাম নাই; একবার ঘর হইতে লাইব্রেরী-ঘরে, আবার লাইব্রেরী-ঘর হইতে ঘরে, বারবার ধীরে ধীরে গতায়াত চলিতে লাগিল; মুখ গম্ভীর, দৃষ্টি উদাস লক্ষ্যহীন।

স্তব্ধ গভীর নিশা। ঘরের মধ্যে একটা ঘড়ী মুহূর্ত্ত গণিতেছে, পাশের ঘরে মালতীর নিশ্বাস-পতনের শব্দ শোনা যাইতেছে; মর্ম্মরসোপানে গঙ্গাজলের মর্ম্মর শব্দ প্রেয়সীর কানে প্রণয়গুঞ্জনের মতো হিমভরা বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। গঙ্গার পরপারে একটা কুকুরের চীৎকার-শব্দ জলের উপর দিয়া গড়াইয়া এপারে আসিতেছিল। আর কোথাও কোনো প্রাণের সাড়া নাই। প্রেমানন্দ বেড়াইতে বেড়াইতে একএকবার স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া তাই শুনিতেছেন।

হঠাৎ মালতীর ঘরের অর্গলহীন কপাট উন্মুক্ত হইয়া গেল। কপাটের ফাঁক দিয়া লাইব্রেরী-ঘরের প্রদীপের স্বর্ণকিরণ সোনালি সূতার জালের মতন বাতাসে ভাসিয়া গিয়া মালতীর মুখে পড়িয়া কাঁপিতে লাগিল।

প্রেমানন্দ থমকিয়া দাঁড়াইয়া মুগ্ধনেত্রে দেখিলেন মালতী ঘুমাইতেছে।

নরম বালিশে তার মাথাটি ডুবিয়া গেছে; খোঁপাতে চাপ লাগিয়া মুখের চারিধারে চুলগুলি ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে, তার উপর প্রদীপের সোনালি আলো আসিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে,—যেন জলের উপর বড় একটী পদ্মফুল অরুণালোকে পূর্ণবিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। বুকের উপর শ্লথবাস নিশ্বাসে প্রশ্বাসে ঢেউয়ের মতো দুলিতেছিল, যেন উষারাণী ফুলের বনে নিদ্রামগ্ন।

প্রেমানন্দ সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে সেই অপরূপ রূপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যতই ঐ মুখ তাঁর অন্তরের মধ্যে মুদ্রিত ও পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই তাঁর সমস্ত শরীর মন যেন ক্রমশ অবশ হইয়া চারিদিকের হাল্কা হাওয়ার সহিত মিশাইয়া যাইতে লাগিল;—বিশ্বজগতের মধ্যে কিছুই আর রহিল না, রহিল শুধু তাঁর অপচল দৃষ্টি আর ঐ নিদ্রামগ্ন মুখখানি। তার দিকে চাহিতে চাহিতে প্রেমানন্দের মন হইতে বিপিন, গুরুগিরি, আশ্রম, শিষ্য, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তিরোহিত হইয়া গেল, তাঁর মনে হইতে লাগিল, অনন্ত দেশকালের অসীম সৌন্দর্য্যের শতদলের মাঝখানে তিনিই শুধু ভক্ত উপাসক মধুলুব্ধ ভ্রমরের মতো একাকী দাঁড়াইয়া আছেন। বিশ্বসৌন্দর্য্যের সুরাসার, চুনির পেয়ালার ন্যায় মালতীর অধরপুটে, তাঁরই জন্য সঞ্চিত হইয়া আছে; প্রেমানন্দের ইচ্ছা হইতে লাগিল তাঁর আজন্মের উন্মাদ পিপাসা এক চুমুকে মিটাইয়া মাতাল হইয়া উঠেন। কে বলিতে পারে এই প্রদীপ্ত সৌন্দর্য্যের অন্তরালবর্ত্তী প্রণয়-পাগল প্রাণ এই গভীর নিশীথে চুম্বনস্ফুলিঙ্গ লাভ করিয়া চকমকির আগুনে সোলার মতো জ্বলিয়া না উঠিবে? প্রেমানন্দের হৃদয় গুরু স্পন্দিত হইতে লাগিল, আগ্রহ ও অপেক্ষার মধ্যে মন আন্দোলিত হইতে লাগিল ইচ্ছা হইতে লাগিল সেই মোমের মতো নরম নমনীয় সুন্দর নারীটিকে দুই বাহুর নিবিড় চাপে একেবারে

নিঙাড়িয়া ফেলেন, এই নীরব নিস্তব্ধ নিশীথে সৌন্দর্য্যের পদতলে আপনাকে নিঃশেষে নিবেদন করিয়া যান।

এমন সময় নিদ্রাঘোরেই প্রেমানন্দের প্রতপ্ত বাসনার উদ্যত আক্রমণ অনুভব করিয়া মালতী মুখ অপ্রসন্ন করিয়া একবার পাশ ফিরিল—চোখে আলো লাগিতেই পরক্ষণেই ধড়মড় করিয়া উঠিয়া লাফাইয়া বিছানা হইতে নামিয়া ঘরের একপ্রান্তে গিয়া দাঁড়াইল। চোখে আলো লাগাতে এবং হঠাৎ ঘুম হইতে উঠিয়া সম্মুখে প্রেমানন্দকে স্তব্ধ লুব্ধ দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া মালতীর মাথা ঝিমঝিম করিতে লাগিল, সে মূর্চ্ছিতপ্রায় দাঁড়াইয়া থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

তার মনে হইতেছিল, অন্ধের গৃহে আগুন লাগিলে সে যেমন প্রজ্বলিত গৃহ হইতে নিরাশ্রয় হওয়ার দুঃখে ও মুক্তির আনন্দে নূতন বিপদের আশঙ্কা না করিয়া পাগলের মতো দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করে, সেও তেমনি করিয়া এই আশ্রম ছাড়িয়া পলায়ন করিতে পারিলে বাঁচে।

প্রেমানন্দ মালতীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন, মালতীর চোখ দুটি দুখানি ধারালো ছুরীর মতো তাঁর বুকের রক্ত চুষিয়া খাইবার জন্য যেন উদ্যত হইয়াছে। প্রেমানন্দ সেখানে আর থাকিতে না পারিয়া আপনার ঘরে পলায়ন করিলেন।

ঘরে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বারান্দায় গিয়া প্রেমানন্দ ডাকিলেন—যোগানন্দ, শান্তি, আমার তীর্থযাত্রার উদ্যোগ কর।

বাহিরে তখন উষার গোলাপী ওড়্‌নায় সোনার পাড় বোনা হইতেছিল। দীঘির জলে গাছের সবুজ ছায়া পড়িয়া তরল পান্নার মতো টলমল করিতেছিল। ছোট ছোট শাদা শাদা মেঘ আকাশময় ছড়াইয়া আছে; তাদের উপর যখন প্রভাতারুণের চুম্বনরাগ ফুটিয়া উঠিতেছিল,

মনে হইতেছিল যেন বিস্ময়-আনন্দে আকাশ রোমাঞ্চিত হইতেছে। প্রভাতের আগমন-সংবাদ ক্রমশ বিশ্বের বুকের মধ্যে গিয়া পৌঁছিতে লাগিল, গাছপালা যেন হাতপা মেলিতে লাগিল, পত্রে পত্রে শিহরণ খেলিয়া যাইতে লাগিল; কত নামগোত্রহীন ফুল সূর্য্যার্ঘ্য সাজাইয়া ফুটিয়া উঠিল, কত বিচিত্র মিশ্র গন্ধ বাতাস ভরিয়া তুলিল। বড় বড় নীল প্রজাপতি এক এক টুক্‌রো আকাশভাঙা আনন্দের মতো ফুলে ফুলে নাচিয়া বেড়াইতেছিল, টিয়াপাখীগুলি ঝাঁক বাঁধিয়া উড়িয়া যাইতেছিল, যেন সবুজ ঘাসের এক-একখানি ক্ষেত আকাশের গায়ে ভাসিয়া যাইতেছে। পল্লবের মর্‌মর, বাতাসের ঝরঝর, গঙ্গার কলকল, কাকের কলরব যেন একতান সঙ্গীতে প্রভাতী নহবত বাজাইয়া তুলিতেছিল।

এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের দিকে প্রেমানন্দের দৃষ্টি ছিল না। তিনি তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়া মালতীর নিকট হইতে দূরে পালাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

৪৬

প্রেমানন্দ ঘর হইতে চলিয়া গেলেও মালতী অপমানের লজ্জায় স্তম্ভিত নিস্পন্দ হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর দাবানলদগ্ধ বন হইতে হরিণীর ন্যায় ত্রাসচঞ্চল হৃদয়ে ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল। লঘু ক্ষিপ্র গতিতে নীচে নামিয়া একবার বিপিনের ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইল, কিন্তু তখনই তার মনে হইল বিপিন গুহায় বদ্ধ, ঘরে নাই; আর ঘরে থাকিলেই বা কি? সে এই দুদিন আগে তার যাচিয়া-বলা দুঃখ-নিবেদন শোনে নাই, অবহেলা করিয়া চলিয়া গিয়াছিল; আজই কি শুনিত? যে উপেক্ষা করে তার কাছে ভিক্ষার দীনতা স্বীকার করা আর নয়, আর নয়! কিন্তু

জগতে তার আশ্রয়ও ত দ্বিতীয় আর কেউ নাই! না থাকে, গঙ্গার গভীর ক্রোড় আছে, তবু বিপিনের কাছে দয়া ভিক্ষা করা আর নয়! তখন সে দ্রুতপদে বাগানে নামিল; অন্ধকার শীতের রাত্রি—আকাশ কোয়াসায় আচ্ছন্ন, বরফের মতো কনকনে ঠাণ্ডা, তার তলে বাগানের ঝোপঝাড় অন্ধকার বাড়াইয়া কালো কালো দৈত্যের মতো দাঁড়াইয়া আছে। মালতী একবার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল একটা তারা পূর্ব্ব গগনে আগুনের ফুলের মতো দপদপ করিতেছে, আর সমস্ত বিশ্বচরাচর শীতের ভয়ে কোয়াসার চাদর মুড়ি দিয়া আকাশের অসংখ্য দেউটি নিবাইয়া নিশ্চিন্ত নীরবে ঘুমাইতেছে। কোথাও জীবনের এতটুকু সাড়া নাই—গঙ্গার জল নক্ষত্রের ক্ষীণালোকে অজগর সর্পের চিক্কণ কৃষ্ণচর্ম্মের মতো স্থানে স্থানে ঝিকমিক করিয়া উঠিতেছে। দীঘির কালো জল প্রকাণ্ড দৈত্যের বড় একটা চোখের মতো সজল দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া আছে যেন তাকে চোখের ইসারায় ডাকিতেছে। মালতীর মনে হইল এমন জীবন্ত গঙ্গা থাকিতে পুকুরে ডুবিয়া মরিব কেন, জীবন দিব যদি ত জীবনস্রোতেই ঢালিয়া দিব। সে দ্রুতপদে গঙ্গার দিকে চলিতে লাগিল। হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া সে ফিরিয়া পলায়ন করিল—অত ভোরে কে একজন গঙ্গাস্নান করিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া আসিতেছে মালতী এক দৌড়ে একেবারে বাগান পার হইয়া বাহিরের রাস্তায় গিয়া পড়িল।

পল্লীপথ নির্জ্জন নিঃশব্দ। মধ্যে মধ্যে পথকুক্কুর চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। একাকিনী এই পথে চলিতে মালতীর গা ছমছম করিতে লাগিল, প্রতি পদবিক্ষেপে বিপদের আশঙ্কা তাকে সচকিত করিয়া তুলিতেছিল, কিন্তু সে যে প্রেমানন্দের আশ্রম হইতে মুক্তি পাইয়াছে এই সুখে তার নূতন বিপদের ভয়ও তুচ্ছ বোধ হইতেছিল। সে জানে

না কোথায় সে যাইতেছে, কোথায় সে যাইতে চাহে। তবু সে যে সকলের অজ্ঞাতসারে আশ্রম হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে, এতেই সে যেন মুক্তির আনন্দ বোধ করিতেছিল, বাহিরের বাতাস হাল্কা বোধ হইতে লাগিল, মাঘ মাসের ভোরের হিমতীব্র বায়ুর নিষ্ঠুর স্পর্শও তার নিকট আশ্রমের আরাম-শয্যা অপেক্ষা সুখকর বোধ হইতে লাগিল। সে যেন লঘুচরণে উড়িয়া চলিতেছিল, পথের বুকে শিশিরের দানা ভাঙিয়া তাহার পায়ের দাগ যেন মাটিতে পড়িতে-ছিল না।

সে জানে না ষ্টেসনে কোন্ দিকে যাইতে হয়—কোন্ পথ কোন্ অজানা বিপদের দিকে না জানি তাকে লইয়া যাইবে। তবু সে শুকতারাটিকে সম্মুখে রাখিয়া বরাবর ছুটিয়া চলিয়াছিল,—শুকতারাটি সম্মুখে রাখিয়া চলিলে সে ঘুরিয়া ফিরিয়া যেখানেই গিয়া পড়ুক আশ্রম হইতে দূরেই চলিয়া যাইবে। মালতী ঊর্দ্ধশ্বাসে চলিতে চলিতে এক-একবার ফিরিয়া দেখিতেছিল কেউ তাকে ধরিতে আসিতেছে কি না, কেউ তার অনুসরণ করিতেছে কি না। তার মনে হইতেছিল এতক্ষণ হয়ত আশ্রমে হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছে, হয়ত সকলে দলে দলে লণ্ঠন লইয়া তাকে খুঁজিতে ছুটিয়াছে, তারা আসিয়া পড়িল বলিয়া, ধরিল বলিয়া। প্রত্যেক ঝোপঝাড় তাকে চমকিত করিয়া তুলিতেছিল, পথের ধারে সামান্য একটু শব্দ তাকে আতঙ্কিত করিতেছিল। যতই বিলম্ব হইতে লাগিল ততই তার মনে হইতে লাগিল যে অন্বেষণ-কারীরা এতক্ষণে হয়ত তার খুব নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এখনি আসিয়া তারা তাকে ধরিবে, লাঞ্ছনা করিয়া টানিতে টানিতে তাকে আশ্রমে লইয়া গিয়া অবরুদ্ধ করিবে, আবার প্রেমানন্দের গঞ্জনা ও জঘন্য ব্যবহার সহ্য করিতে হইবে। এই কথা যতই তার মনে হয়,

ততই সে দ্বিগুণ বেগে ছুটিতে থাকে; তার অনভ্যস্ত চরণ ক্লান্ত হইয়া বেদনায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, রাস্তার কাঁকরে কোমল চরণতল ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল, তবু তার গমনে বিরতি ছিল না।

ক্রমে ফর্সা হইয়া আসিল। ক্রমে ক্রমে অন্ধকারের যবনিকা পশ্চিমদিগন্তে গুটাইয়া যাইতে লাগিল, কোকিল জাগ্রত হইয়া আম্রকুঞ্জে তন্দ্রাজড়িম কণ্ঠে কুহরিয়া উঠিল, দোয়েল শ্যামা বুলবুল শিশের একতান ঝঙ্কারে প্রভাতী বন্দনা গাহিতে লাগিল। পথপার্শ্বে ঘাসের শীষে শিশিরকণাগুলি অরুণচুম্বনে হাসিয়া উঠিল। কিন্তু তখনো রাস্তার ধারের গাছগুলা শীতের জড়িমায় নিজেদের পল্লবাবরণের মধ্যে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া ভোরের বাতাসে হি হি করিতেছে; পাড়ার চালে চালে তখনো কুয়াসা কুণ্ডলী পাকাইয়া স্থির হইয়া ছিল, যেন বড় বড় হাঁসগুলি বসিয়া বসিয়া ডিমে তা দিতেছে। তখনো কোনো গৃহে জাগরণের লক্ষণ পরিস্ফুট হয় নাই। ক্রমে পথে দু একজন লোক দেখা যাইতে লাগিল। তারা একজন অপরূপ রূপসীকে একাকিনী যাইতে দেখিয়া কৌতূহলী দৃষ্টিতে মালতীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। মালতী আপনাকে যথাসম্ভব সমাবৃত করিয়া কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চলিতে লাগিল, কিন্তু বুকের মধ্যে তার ভয় তোলপাড় করিতেছিল। ক্রমে ক্রমে রৌদ্র উঠিল; পথের ধারে ধারে নরনারী রৌদ্রে পিঠ দিয়া জড়সড় হইয়া বসিয়া সেবারকার কনকনে শীত আর প্রচুর আমের ফসলের সম্ভাবনা প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু মালতীর আবির্ভাবে তাদের আরব্ধ আলাপ থামিয়া যাইতেছিল, সকলেই অবাক দৃষ্টিতে মালতীকেই দেখিতেছিল এবং মালতী তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে-না-হইতে তার সম্বন্ধে কল্পনা জল্পনা অনুমান আলোচনা আরম্ভ

করিতেছিল। মালতী এ-সমস্তই অনুভব করিতেছিল বলিয়া আপনাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকাইবার জন্ম ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল।

অল্পদূর অগ্রসর হইয়া মালতী দেখিল সম্মুখেই রেল-লাইন। তখন সে রাস্তা ছাড়িয়া রেল-লাইনে গিয়া উঠিল এবং রেল-লাইন ধরিয়া ষ্টেসনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। হাতে তার পয়সা নাই, ষ্টেসনে গিয়া কি হইবে, এ ভাবনা তখনো তার মনে উঠে নাই—সে শুধু ভাবিতেছিল, রেলে উঠিতে পারিলে অতি সত্বর সে প্রেমানন্দের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইয়া বাঁচিবে। সম্মুখে সুদূরপ্রসারিত রেল-লাইনগুলি যেন তাকে অজানার উদ্দেশ্যে আহ্বান করিয়া ইঙ্গিত করিতেছে, হিমসিক্ত রেলের উপর প্রভাত-রৌদ্র পড়িয়া চকচক করিতেছে, সঙ্কেতস্তম্ভের মাথায় লণ্ঠনের লাল সবুজ কাচে রৌদ্র লাগিয়া লোহিত হরিৎ সূর্যামূর্ত্তি চোখে ঝিলিক হানিতেছে।

এই সব দেখিতে দেখিতে মালীতে ষ্টেসনের প্লাটফর্ম্মে গিয়া উঠিল। অমনি তার চোখে পড়িল শিষ্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন প্রেমানন্দ। মালতী তাঁকে দেখিয়াই ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল—সে ব্যাধবেষ্টিত হরিণীর ন্যায় কোন্ পথে যে কোথায় পলাইবে তা খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

প্রেমানন্দ তাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিলেন—রাধারাণী, আমি তীর্থে চলেছি; কবে ফির্‌ব, ফির্‌ব কি না, ঠিক নেই। তুমি কোথায় যাবে বলো, যোগানন্দ টিকিট কোরে তোমায় সেই গাড়ীতে তুলে দেবে!

মালতী ক্ষণেক অবাক হইয়া প্রেমানন্দের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—আমি—কাশী—না—কল্‌কাতা যাব।

প্রেমানন্দ বলিলেন—বেশ, তাই হবে।

মালতীর আবির্ভাবে প্লাটফর্ম্মে উপস্থিত বাবু যাত্রীর দলে সাড়া পড়িয়া গেল। যেমন গঙ্গার মাঝখান দিয়া ষ্টিমার চলিয়া গেলে তার আন্দোলন দুই তটকে স্পর্শ করে, তেমনি মালতী বাবুদের জনতা ভেদ করিয়া যাইবার সময় দুধারের হৃদয়ে আন্দোলন নাচিয়া উঠিল। মালতী দৃপ্ত অটল গতিতে গিয়া মেয়েদের অপেক্ষা-কক্ষে প্রবেশ করিল। কলিকাতা যাইবার ট্রেণ আসিলে যোগানন্দ মালতীকে মেয়ে-কামরায় তুলিয়া টিকিট দিয়া গেল। মালতী জানালার ধারে বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিল—রেল-লাইনের ধারে ধারে রেল-কর্ম্মচারীদের কুলিদের ও স্থানীয় বাসিন্দাদের বাসা ও বাড়ী; কোনো বাড়ীর জানালায় একটি বধূ দাঁড়াইয়া আছে, কোথাও ছেলেরা দাণ্ডাগুলি খেলিতেছে, কোথাও খর্জ্জুর তাল নারিকেল শজিনাবৃক্ষে বেষ্টিত ডোবায় রমণীরা স্নান করিতেছে, বাসন মাজিতেছে, জল্পনা করিতেছে, কলহ করিতেছে; রেলের ধারে কুলিরা কাজ করিতেছে। গাড়ী হুসহুস করিয়া প্রকাণ্ড অজগরের মতো এত বড় প্রাণের বোঝা উদরে বহন করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কিন্তু নিত্যকার ব্যাপার বলিয়া অভ্যাসবশত কেউ তার দিকে ভ্রূক্ষেপ করিতেছিল না। দিগন্তবিস্তৃত মাঠে মাঠে বেগুন, কপি, মটর, আর রবি শস্যের ক্ষেত; গোরু ছাগল চরিতেছে, রাখাল গান গাহিতে গাহিতে থামিয়া চলিষ্ণু গাড়ীর আরোহীদিগকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে এবং এই অর্থহীন আচরণেই অপর্য্যাপ্ত কৌতুক তার মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে। মালতী দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছিল, সকলেরই আশ্রয় আছে, কাজ আছে, আনন্দ আছে; সেই কেবল নিরাশ্রয়, জগতের জঞ্জাল।

গাড়ীর দুপাশে কত বাড়ী, বাগান, ক্ষেত খামার, কলকারখানা বায়োস্কোপের ছবির মতো ক্ষণিকের জন্য দর্শন দিয়া সোঁ সোঁ করিয়া

সরিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে গাড়ী আসিয়া শিয়ালদহে পৌছিল। একদণ্ডে সমস্ত প্লাটফর্ম্ম জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল। আবার দেখিতে দেখিতে জনতা পাতলা হইয়া গেল। তখন মালতী নামিয়া একখানা ঠিকা গাড়ীতে, যে প্রথমে তাকে ডাকিল তার গাড়ীতেই ভাড়া ঠিক না করিয়াই চড়িয়া বসিল। গাড়োয়ান দরজা বন্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যেতে হবে ?

মালতী বলিল—চোরবাগান।

গাড়োয়ান দুই হাতে ঘোড়ার রাশ আছড়াইয়া হেই হেই টকাস টকাস শব্দ করিতে করিতে ও পাদানিতে পা ঘসিতে ঘসিতে অশ্বিনীকুমারযুগলকে গমনে উৎসাহিত করিতে করিতে রওনা হইল।

গাড়ী নবকিশোরের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। মালতী গাড়োয়ানকে দরজার কড়া নাড়িতে বলিল। গাড়োয়ান গাড়ী হইতে নামিয়া দরজার কড়া নাড়িতে লাগিল। নবকিশোর দরজা খুলিয়াই মালতীকে গাড়ীতে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—মালতী ! তুমি একলা ?

মালতী নবকিশোরের মুখের দিকে করুণ উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—হ্যাঁ, আমি চোলে এসেছি।

—কেন ? হয়েছে কি ?

মালতী অঞ্চলে চক্ষু আবৃত করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

নবকিশোর অবাক হইয়া মালতীর ক্রন্দন দেখিতে লাগিল ; কি হইয়াছে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া একটিও সান্ত্বনার কথা বলিতে পারিতেছিল না।

বাহির হইতে গাড়োয়ান চীৎকার করিল—ওগো বাবু, সোয়ারি নামিয়ে লও না গো ! হামি কি সারা রোজ খাড়া থাক্‌ব ?

নবকিশোর তাড়াতাড়ি গাড়ীর দরজা খুলিয়া মালতীকে বলিল—তুমি বাড়ীর ভিতর যাও।

মালতী নামিয়া গেল। নবকিশোর গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল—কত ভাড়া ?

গাড়োয়ান বলিল—কেতো ভাড়া আবার? আপনে কি রুপেয়া দো রুপেয়া দেবে না হামি ভি মাঙ্‌ব? শিয়ালদা সে চোরবাগান ত বারে আনা হিসাব ধরা আছে।

নবকিশোর দ্বিরুক্তি না করিয়া বারো আনা পয়সা দিয়া গাড়োয়ানকে বিদায় দিল।

ইত্যবসরে মালতী আত্মসংবরণ করিয়া মুখ মুছিয়া বসিয়া ছিল। নবকিশোর ফিরিয়া আসিয়া দেখিল মালতী সন্তসমাপ্তবর্ষণ সন্ধ্যাশ্রীর মতো দীপ্ত বিষণ্ণতার প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় বসিয়া আছে। সে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল—মালতী, বিপিন ভালো আছে ত?

মালতী ঘাড় নাড়িল। তখন নবকিশোর অধিকতর বিস্মিত হইয়া ধাঁধায় পড়িয়া গেল। কি জিজ্ঞাসা করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তবে তুমি একলা এলে যে?

মালতী গম্ভীভাবে বলিল—আমি কাউকে বোলে আসিনি।

এ উত্তরে নবকিশোরের নিকট সমস্যার সমাধান না হইয়া বরং সমস্যা অধিকতর জটিল হইয়া উঠিল। সে কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কাউকে না বোলে একলা চোলে এলে, ব্যাপার কি?

—গুরুজীর অত্যাচারে আমার সেখানে বাস করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল!

মালতী একে একে সমস্ত কথা সংক্ষেপে নবকিশোরকে বলিল। নবকিশোর শুনিয়া ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিল—বিপিনকে এ কথা জানাওনি কেন?

—জানাতে চেষ্টা করেছিলুম, তিনি শোনেননি।······তারপর

গুরুর অত্যাচার অসহ্য হয়ে উঠতে কাল রাত্রে গঙ্গায় ডুবে মরতে গিয়েছিলুম, তাতেও বাধা পড়্ল। মাসিমার কাছেই যেতুম, কিন্তু ঐদিকে প্রেমানন্দ যাচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে যেতে সাহস বা প্রবৃত্তি হল না। তাই আপনার কাছে পালিয়ে এসেছি। আপনি আমাকে মাসিমার কাছে দিয়ে আসুন।

গম্ভীরভাবে নবকিশোর বলিল—পালিয়ে এসে কাজটা ভালো করোনি, মালতী।...তোমায় ফের আশ্রমে ফিরে যেতে হবে। মানুষের মনের মধ্যে স্বাভাবিক একটা আরাম-স্পৃহা আছে, যাতে কোরে সে সহজে শান্তিকে ঘাঁটিয়ে গণ্ডগোল বাধাতে চায় না; সেইজন্যে সে জেনে-শুনেও মিথ্যাকেও সহজে অবিশ্বাস কর্তে চায় না। বিপিনের এই বিশ্বাস তোমাকেই ভাঙ্তে হবে।

মালতী রুদ্দমুখী হইয়া বলিল—আপনিও আমায় ত্যাগ কর্বেন? তবে কি আমার মৃত্যু ভিন্ন আর গতি নেই?

নবকিশোরের হৃদয়বীণার প্রণয়তন্ত্রীর কোমল পর্দ্দায় আঘাত করিয়া মালতীর এই কথা কটি একটি করুণ রাগিণী ধ্বনিত করিয়া তুলিল। নবকিশোর বলিল—বিপিনকে ছেড়ে গেলে বিপিনের সঙ্গে মিলনে তোমার ব্যাঘাত ঘট্বে।

হতাশার করুণ রাগিণী বাজাইয়া মালতী বলিল—সে আশা সে আকাঙ্ক্ষা আমার আর নেই। কোথাও একটু নিরুপদ্রবে থাক্তে পেলে বেঁচে যাই। আপনি আমায় মাসিমার কাছে রেখে আসুন।

—আশা আকাঙ্ক্ষা নেই, সে মিথ্যে কথা। আশা আকাঙ্ক্ষা আছে বোলেই অভিমান অমন ছলনা কর্ছে। এই উপদ্রবের ভিতর দিয়েই নিরুপদ্রব হবার সূচনা হয়েছে। একদিন না একদিন বিপিনের মোহ কাট্বে,......সেদিন পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরে তোমায় বিপিনের কাছে থাক্তে

হবে।······তুমি মর্‌তে পাবে না, পালাতে পাবে না, সকল অত্যাচার থেকে আপনাকে রক্ষা কোরে বিপিনকে সেই-সব অত্যাচারের আঘাত দিয়েই সচেতন কোরে তোলা তোমার এখনকার কর্ত্তব্য হবে।······এই যে তুমি আমার কাছে এসেছ, এতে তোমার কাজ অনেকখানি পিছিয়ে গেল। ভারি ভুল করেছ, তুমি চোলে না এসে যদি বিপিনকে আর-একবার একটা নাড়া দিয়ে দিতে তাহলে এতক্ষণে তার সকল মোহ ঝোরে পড়্‌ত; তোমরা দুজনে একসঙ্গে আমার কাছে এসে হেসে বল্‌তে পার্‌তে, বন্ধু, অনেক তুফান কাটিয়ে আমরা আজ মিল্‌তে পেরেছি।······আস্‌বে সেদিন শীগগির আস্‌বে, তুমি কিছু ভেবো না। এখন চলো আর বিলম্ব নয়।······তোমার খাওয়া হয়নি, না? চট কোরে স্নান কোরে খেয়ে নাও, আমি গাড়ী ডেকে আনি।

৪৭

মালতী গঙ্গায় ডুবিতে গিয়া যাকে দেখিয়া ফিরিয়া পলাইয়া গিয়াছিল, সে বিপিন। বিপিন আর আপনার দ্বন্দ্ব লইয়া গুহার মধ্যে বদ্ধ থাকিতে না পারিয়া সেইদিন প্রত্যূষে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল; গঙ্গায় প্রাতঃস্নান করিয়া আশ্রমে ফিরিতেছিল। দেখিল মালতী সেই প্রত্যূষে গঙ্গার ঘাটে যাইতে যাইতে তাকে দেখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। এত ভোরে মালতী গঙ্গায় যাইতেছিল কেন? তাকে দেখিয়া মালতী অমন করিয়া পলায়ন করিল কেন?

আশ্রমে ফিরিয়াই বিপিন শুনিল গুরু তীর্থ-পর্য্যটনে যাত্রা করিতে-ছেন। বিপিন যে তপস্যা ভঙ্গ করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে, এই লজ্জায় সে আর গুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিল না। গুরু তীর্থযাত্রা করিলেন—ওয়েলার ঘোড়ার জুড়ি ফীটন-গাড়ী টানিয়া আশ্রমের উদ্যানের ফটক পার হইয়া গেল।

সূর্য্য উঠিল; বেলা চড়িল। বিপিন স্তব্ধ হইয়া তখনও আপনার ঘরে বসিয়া আছে। এমন সময় শান্তি ছুটিয়া আসিয়া বলিল—রাধারাণীকে আশ্রমে পাওয়া যাচ্ছে না! আপনি চট কোরে ষ্টেশনে গিয়ে গুরুদেবকে খবর দিন!

বিপিনের মাথার মধ্যে রক্তধারা নাগরদোলায় চড়িয়া আকাশ পাতাল একাকার করিয়া ঘুরিতে লাগিল, চোখের সাম্‌নে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মহাতাণ্ডবে প্রমত্ত হইয়া উঠিল; কানের মধ্যে হাজার ঝিঁঝিঁর ঝঙ্কার বাজিতে লাগিল; সকল গণ্ডগোলের মধ্যে একটি ধ্বনি শুধু সুস্পষ্ট ছিল—মালতী আশ্রমে নাই! নাই, নাই, সে আশ্রমে নাই! বিপিনের দৃষ্টি যেখানে তাকে ধরিতে পারে হয় ত সে তেমন জায়গায় কোথাও নাই! পৃথিবীতেই আছে কি না কে জানে!

বিপিনের মনের মধ্যে আত্মগ্লানি ধিক্কার দিয়া তাকে বলিতেছিল—কেন সে সেদিন মালতীর যাহা বলিবার ছিল তাহা শোনে নাই। কেন সে তাকে পদে পদে শুধু আঘাত করিয়াই আসিয়াছে। মালতী কোথায় গেল, কেন গেল, এ সমস্যার মীমাংসা কে করিয়া দিবে। জীবনে আর কখনো তার সহিত সাক্ষাৎ হইবে কি না কে বলিবে। মালতী বাঁচিয়া আছে কিনা তারই বা ঠিক কি? অমন কূলে কূলে ভরাজল দীঘি, অমন উচ্ছল-তরঙ্গ জাহ্নবী…এদের লোলুপ গ্রাসের কাছে মালতীর সুন্দর কোমল জীবনটি কতটুকু? এক নিমেষে হয় ত সব শেষ হইয়া গেছে! সে যেন শতবর্ষ মালতীকে দেখে নাই। তার যুগযুগান্তরের সঞ্চিত বিরহব্যথা আজ অকস্মাৎ তার অন্তরের মধ্যে ঠেলিয়া উঠিয়া তার হৃদয় ফাটাইয়া অশ্রুজলে বাহির হইবার জন্য আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিল।

আজকার এই দুঃখদারুণ দুর্দ্দিনে তার আবাল্যের বন্ধু, পরম নির্ভর

নবকিশোরকে মনে পড়িল, আর মনে পড়িল তার সেই স্নেহময়ী মাকে। আজ তার নিরাশ্রয় প্রাণ সেই দুটি স্নেহের বন্দরে আশ্রয় লইয়া নিশ্চিন্ত হইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। যে-সমস্ত আচরণে তাঁদের স্নেহকোমল প্রাণে সে আঘাত দিয়াছে, আজ তারা সূচীর মতো তীক্ষ্ণ স্মৃতি দিয়া তার মনকে বার বার বিদ্ধ করিতে লাগিল। আজ সে বুঝিতে লাগিল তার জন্য যে সান্ত্বনা তা গুরুর চরণে নহে, শাস্ত্রের দুর্ব্বোধ্য পুঁথির মধ্যেও নহে, তা আছে কেবল তার বন্ধুর স্নেহ-উদার বক্ষে আর দাতার স্নেহশীল ক্রোড়ে! যে কৃত্রিম গুরুভক্তির উত্তেজনা ভিতরকার মানুষটাকে বন্দী করিয়া তার সম্মুখে ধর্ম্মের সঙ্গীন চড়াইয়া পাহারা দিতেছিল, তাহা সরিয়া পড়িবামাত্র ভিতরকার মানুষটা বিপিনকে দণ্ড দিবার জন্য উদ্ধত হইয়া উঠিল; রাশি রাশি বচন-চাপা হৃদয় আষ্টেপৃষ্ঠে বদ্ধ ছিল, আজ চরম দুঃখের আঘাতে তাহা অপসৃত হইবামাত্র মুক্ত হৃদয় আপনার চিরকালের সকলসন্তাপহরণ স্নেহ-আশ্রয়ের দিকে ধাবিত হইল, তার আর তখন গুরুর রক্তচক্ষু বা আশ্রমবাসীদের কৌতূহলী দৃষ্টির প্রতি ভ্রূক্ষেপ রহিল না, সে তখন দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল।

এমন সময় তারক তার দাঁতগুলি বাহির করিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিপিন তাকে লক্ষ্যও করিল না। কিন্তু তারক খুব টেঁকসই মানুষ, সে উপেক্ষা অবহেলায় দমিবার পাত্রই নয়। সে হ্যাঁই হ্যাঁই করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে বলিতে লাগিল—কিহে ভায়া? আমরা মনে করেছিলাম তোমার বাপ মা তোমাকে বনবাস দিলে, বাস, ঐখানেই দাঁড়ি। তা নয়, মহাকাব্যের কোনো অংশ বাদ পড়্‌বে না;···লক্ষ্মণ-বর্জ্জনটা ত আগেই হয়ে গেছে, এবার সীতা-হরণও হল! তারপর আর বাকী কি?

বিপিন একলম্ফে গিয়া তারকের টিকি ধরিয়া নাড়িতে নাড়িতে দাঁতের উপর দাঁত রাখিয়া বলিল—তারপর তাড়কা রাক্ষসী বধ আর হনুমানের মুখ পোড়ানো বাকী আছে।···বেরো বাঁদর, নইলে তোকে দিয়েই বাকী অনুষ্ঠান সাঙ্গ হয়ে যাবে।

বিপিন এক ধাক্কায় তারককে ঘর হইতে বাহিরের দালানে ফেলিয়া দিল। বিপিনের কথা ও কাজের বায়না-স্বরূপ তারক যা পাইল তাই যথেষ্ট মনে করিয়া ফাউএর প্রত্যাশা না রাখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পলায়নের উপক্রম করিল।

বিপিন দেখিল তারকের হাত হইতে বারান্দার মার্ব্বল মেঝের উপর তারই একখানি ফটোগ্রাফ পড়িয়া গেল। এই ফটোগ্রাফ তার মথুরাপুরের ঘরে ছিল, ইহা এখানে কেমন করিয়া আসিল ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বিপিন তাড়াতাড়ি উহা কুড়াইয়া লইয়া তারককে জিজ্ঞাসা করিল,—এ তুমি কোথায় পেলে?

তারক কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিল—ঐটেই ত তোমায় দিতে এসেছিলুম। গুরুদেব তীর্থে যাচ্ছেন শুনে সকাল-সকাল তাঁকে প্রণাম করতে এসেছিলুম। এসে দেখ্‌লুম গুরুদেব চোলে গেছেন তাঁর ঘরে এইটে পোড়ে আছে। শুন্‌লুম এই ছবিখানি বুকে কোরে নাকি মালতী কাঁদ্‌ছিল, তাই গুরুদেব তিরস্কার করেছেন, আর সেই রাগে মালতী আজ বেরিয়ে গেছে!

বিপিনের চোখের সম্মুখ হইতে বিশ্বচরাচর লুপ্ত হইয়া গেল, চোখের সম্মুখে কালো অন্ধকারের মধ্যে সবুজ নীল হল্‌দে লাল আলোর কণা বিচিত্র ভঙ্গীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গোল-গোল ডোরা কাটিয়া ফিরিতে লাগিল। তার মনের ভিতর এমন একটা বিরুদ্ধ বিপ্লব জমিয়া উঠিল যে সে শূন্যদৃষ্টিতে তারকের দিকে চাহিয়া মর্ম্মর-খোদিত পাগলমূর্ত্তির মতো নিস্পন্দ নির্ব্বাক দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্ষণেক পরে চেতনা পাইয়া বিপিন ছুটিয়া ষ্টেশনে গেল। গিয়া দেখিল ষ্টেশনে প্রেমানন্দ বা মালতী কেউ নাই—শুধু আছে আফিসযাত্রী ডেলী-প্যাসেঞ্জার বাবুদের ভিড়।

বিপিন নবকিশোরের কাছে যাইবার জন্য টিকিট কিনিয়া গাড়ীর আগমনের প্রতীক্ষায় অধীর পদক্ষেপে প্ল্যাটফরমের এমুড়া হইতে ওমুড়া পর্য্যন্ত পায়চারি করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে গাড়ী আসিল। বিপিন গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছে, পাশের কামরা হইতে যোগানন্দ নামিয়া আসিয়া বিপিনের কাঁধে হাত দিল। বিপিন পিছন ফিরিয়া যোগানন্দকে দেখিয়া স্তম্ভিত কুণ্ঠিত হইয়া গেল—সে যে অসময়ে তপস্যার গুহা ছাড়িয়া আশ্রম হইতে অন্যত্র শান্তির সন্ধানে চলিয়াছে। যোগানন্দ তাকে সে বিষয়ে কিছুমাত্র প্রশ্ন না করিয়া বলিল—গুরুদেব তীর্থে গেলেন, আমি তাঁকে আগিয়ে দিয়ে এলাম। রাধারাণী কল্‌কাতা চোলে গেছেন……তুমি যাও, তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে এসগে।

মালতী কলিকাতায় গিয়াছে নবকিশোরের কাছে! বিপিন গাড়ীর পা-দান হইতে পা নামাইয়া লইল, গাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

যোগানন্দ আর কিছু বলিল না। বিপিনের হাত ধরিয়া লইয়া আশ্রমে ফিরিল। বিপিন গম্ভীর নির্ব্বাক; সে আপনার ঘরে গিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিল।

অনেকক্ষণ পরে যখন সে মাথা তুলিল, দেখিল তার ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে নবকিশোর ও তার পশ্চাতে কুণ্ঠিতা মালতী। বিপিনের হৃদয় আনন্দে অভিমানে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তার বন্ধু ও মালতীকে

এমন অপ্রত্যাশিত রকমে নিকটে পাইয়া তাদের বাহুবেষ্টনে বুকে চাপিয়া ধরিতে ইচ্ছা হইলেও দারুণ অভিমানে সে স্থির হইয়া বসিয়াই রহিল। মালতী তাকে না বলিয়া নবকিশোরের কাছে গয়াছিল !

নবকিশোর প্রথম কথা কহিল—মালতীর এ আশ্রমে থাকা বিপদ-সঙ্কুল হয়ে উঠেছে বিপিন ; তাই খুড়িমার কাছে নিয়ে যাবার জন্যে সে আমায় বল্‌তে গিয়েছিল—তুমি তখন গুহায় বোসে তপস্যা কর্‌ছিলে। কিন্তু ওকে আশ্রমে এনেছ তুমি, তোমাকে না বোলে যাওয়া ওর উচিত নয়, তাই আমি ওকে রাখ্‌তে এসেছি। তুমি ত গুহা থেকে বেরিয়েছ—তোমার গুরুর অত্যাচার থেকে মালতীকে রক্ষা করতে না পারো, ওকে খুড়িমার কাছে রেখে এসো।

নবকিশোর বিপিনের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। মালতী নতমুখে অসহায় দাঁড়াইয়া রহিল—সে না পারে সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে, আর না পারে কোথাও সে যাইতে, সে যে এ আশ্রম হইতে পলাইয়া গিয়া ইহা হইতে ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বিপিন মুগ্ধ দৃষ্টিতে মালতীর মুখের পানে দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছিল এই অনুপমা সুন্দরী তারই প্রতি অনুরক্ত বলিয়া সে গুরুর শাসনে লাঞ্ছিতা ! সে আনন্দ-গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল—মালতী, তুমি দাঁড়াও, আমি শান্তিকে ডেকে দিচ্ছি।

মালতী আসিয়াছে খবর পাইয়াই শান্তি তাড়াতাড়ি আসিতেছিল। বিপিন ঘর হইতে বাহির হইয়াই দেখিল শান্তি তাড়াতাড়ি আসিয়া মালতীর দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—এস দিদি এস। আমি আর কখনো তোমায় চোখের আড়াল করব না। তুমি এস।

মালতী নত হইয়া শান্তিকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা লইল—এমন

স্নেহ সে ত মা ছাড়া আর কারো কাছে পায় নাই। মালতীর চোখে জল পড়িল।

শান্তি মালতীর চোখ মুছাইয়া তাকে লইয়া উপরে চলিয়া গেল; মুগ্ধ বিপিন প্রসন্ন দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মালতীর মনের মধ্যে জলতরঙ্গের সুরে বিপিনের কথার স্নেহ করুণা বাজিতে আরম্ভ করিয়াছিল; যার জন্য সে এত সহিতেছে সে তার প্রতি একেবারে উদাসীন নয়, এই আশ্বাসে মালতীর অন্তরে প্রণয়প্লাবন দ্বিগুণ বেগে বহিতে লাগিল। গুরুদেব আশ্রমে নাই; পরম নিশ্চিন্ত প্রফুল্ল মনে মালতী শান্তির সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর ও আশ্রমবাসীর সেবা যত্নে আপনাকে একেবারে নিযুক্ত করিয়া দিল; এতকাল নিশ্চেষ্টতার পরে অকস্মাৎ তার নারীপ্রকৃতি ছাড়া পাইয়া নিপুণ সেবা-যত্নে সকলকে পরমাত্মীয় মুগ্ধ করিয়া তুলিল।

বিপিনও বাদ পড়িল না। মালতী নানান কাজের মধ্যে কতবার বিপিনের কাছাকাছি হইত; মালতীর চঞ্চল গতি, কর্ম্মে ব্যস্ততা, কর্ম্মে নিবিষ্ট তার সুকুমার কপোলের একটি অংশ, তার বসিবার বিশেষ ভঙ্গী, তার কপালের উপরকার কুঞ্চিত স্ফুরিত চুলগুলি—যা বিপিন দেখে তাতেই তার ব্যাকুল চিত্তের মধ্যে তুফান উঠে। কিন্তু বিপিন নিজের হাতে তার ও মালতীর মাঝখানে একটা এমন অদৃশ্য অথচ শক্তিশালী প্রাচীর গাঁথিয়া তুলিয়াছিল যে তারা কিছুতেই পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিতেছিল না। যেমন একখানা বড় ষ্টিমার যাত্রী লইয়া ঘাটের কাছে আসিয়াও ডাঙায় ভিড়িতে না পারিয়া একবুক আগ্রহ লইয়া ডাঙার দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে, বিপিনও তেমনি করিয়া মালতীর দিকে তাকাইয়া থাকিত।—কে সে সেতু, কে সে খেয়া-নৌকা যে স্রোতের মধ্যগতকে ডাঙার সহিত মিলন করাইয়া দিবে!

বিপিন ও মালতীর এখন বহুবার সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু দৃষ্টি একবার সম্মিলি হইয়াই নত হইয়া পড়ে, দুইজনেরই চক্ষু কি জানি কিসের অভিমানে ছলছল করিয়া উঠে।

মালতী আশ্রমের পরিচর্য্যার ভার নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছিল। কিন্তু সমস্ত আশ্রমের গৃহিণীপনা সম্পন্ন করিয়াও তার সময় কাটিতে চাহিত না। আর এই আশ্রমে তার থাকিবার হেতুই বা কি? যাদের সেবা সে করিতেছে তারা তার সেবার কাঙাল নহে; দেবতা বলিয়া যে বিগ্রহের সেবা হয় তার প্রতি তার ঈশ্বরপ্রত্যয় নাই; সুতরাং এখানে থাকার সার্থকতাই বা কি? মালতীর মনে হইতেছিল এর চেয়ে কোনো দীন আতুরের আশ্রমের সেবিকা হইলে জগতেরও উপকার হইত, তারও জীবনের একটা অর্থ মিলিত। এই-সব কথা ভাবিতে ভাবিতে তার কল্পনায় গার্হস্থ্যের একটি মোহিনী ছবি ফুটিয়া উঠিত—যেখানে সে বিপিনকে আর তার সন্তানগুলিকে প্রাণ মন দেহ দিয়া সেবা করিতে পারে এমন একখানি প্রণয়পবিত্র স্নেহসরস গৃহে স্থান পাইবার প্রলোভন তার বুকের ভিতর হইতে দীর্ঘনিশ্বাস টানিয়া বাহির করিত।

৪৯

এমনই সুখদুঃখ কল্পনা নিরাশাতেই তাদের আরো কত দিন কাটিতে পারিত।

হঠাৎ উৎসব আসিয়া সকলের নিজের ভাবনা ভুলাইয়া দিল। আজ দোলপূর্ণিমা। তার উপর অকস্মাৎ গুরু তীর্থ হইতে আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাই আজ সমস্ত দিন আশ্রমে উৎসব চলিয়াছে আবিরের ধূলায় পথ ঘাট ঘর দুয়ার আজ লাগে লাল; শ্বেত পাথরের স্বচ্ছ মেঝের আবিরের ছোপ লাগিয়া যেন উষার আকাশের মতো সুন্দর

এ কি স্বপ্ন, না মোহ, না মতিভ্রম! এ যে বিশ্বাসেরও অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়! এত সৌভাগ্য কি তার! স্রোতের ফুল কি এতদিনে কূল পাইল!

মালতীর মনে হইতে লাগিল যেন চন্দ্রালোক হইতে সুরগায়কেরা অমৃতধারা ঢালিয়া গাহিতেছে তার বিবাহরাত্রির অভিনন্দন!—তার মনে হইতে লাগিল—আজ জল স্থল আকাশ মধুময়! অন্তরীক্ষ বায়ু মধুময়! পত্রপুষ্প মধুময়! পৃথিবীর ধূলি পর্য্যন্ত আজ মধুময়! ভগবান কি দুঃখকে চরমে তোলেন সুখকে এমনি পরিপূর্ণভাবে সম্ভোগ করাইবার জন্য? মালতী মনে মনে সকল ভয়ের ভয় ও সকল প্রাণীর গতি যিনি, যিনি অন্তরদেবতা, তাঁকে একইকালে দুঃখবিধাতা ও সুখবিধাতা জানিয়া মনে মনে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিল। সে আনন্দবাহুল্যে বিপিনের দিকে চাহিতেও পারিল না। তার সমস্ত হৃদয় আনন্দের অশ্রুজলে আর্দ্র হইয়া গেল।

প্রেমানন্দ এতক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন—বিপিনবাবু, মালতী, আমি তোমাদের কাছে এই শিক্ষা পেলাম যে গুরু হওয়া মানুষের সাজে না। আমার গুরুগিরির আজ এই শেষ! আমি এখনই আমরণ তীর্থপর্য্যটনে চল্‌লাম। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।

শেষ